প্রতিচিন্তা



সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

চতুর্থ বর্ষ ● দ্বিতীয় সংখ্যা ● ঢাকা ● এপ্রিল-জুন ২০১৪

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার
ঢাকা-১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১

প্রতি চিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

এপ্রিল-জুন সংখ্যা ২০১৪

সম্পাদক

মতিউর রহমান, সম্পাদক, প্রথম আলো

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; ফেলো, পিপিআরসি

উপদেষ্টা পর্ষদ

নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মাহবুব হোসেন, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; উপদেষ্টা, ব্র্যাক

সম্পাদনা পর্ষদ

নজরুল ইসলাম, ঊর্ধ্বতন অর্থনীতিবিদ, জাতিসংঘ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
হাসান ফেরদৌস, জাতিসংঘে কর্মরত
আলী রীয়াজ, গণনীতি বিষয়ক গবেষক, উড্রো উইলসন সেন্টার, ওয়াশিংটন
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, প্রথম আলো

প্রচ্ছদ

কাইয়ুম চৌধুরী, চিত্রশিল্পী

শিল্প নির্দেশক

অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

সহকারী সম্পাদক

খলিলউল্লাহ্, প্রতিচিন্তা

দাম : ৫০ টাকা

ISSN 2310-2403

ওয়েবসাইট : www.protichinta.com, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
April-June Issue, 2014; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 50 Taka
100 Kazi Nazrul Islam Avenue (CA Bhaban), Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81

সূ চি প ত্র

স ম্পা দ কী য় ৬

স মা জ

বাংলাদেশ : একটি ইসলামি প্যারাডাইমের সন্ধানে
বদরুল আলম খান ৯

নবধারার নাগরিক আন্দোলন : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ
মহিউদ্দিন আহমদ ৪৬

অ র্থ নী তি

গণমুখী জাতীয় আর্থরাজনৈতিক কৌশলপত্রের সন্ধানে একটি দলনিরপেক্ষ অনুসন্ধান
হায়দার আলী খান ৬৬

বাংলাদেশের পোশাক খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা এবং সামাজিক অগ্রগতির একটি বিশ্লেষণ
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম ও ফারজানা সেহরীন ৯৩

শা ন্তি র ক্ষা

আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের দুই দশক : একটি মূল্যায়ন
রাশেদ উজ জামান ও নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস ১১৯

ব ই আ লো চ না

মুজিব হত্যায় মার্কিন সংশ্লিষ্টতা : একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান
এ এস এম আলী আশরাফ ১৪৪

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : ভূ-রাজনীতি ও বিস্মৃত গণহত্যা
খলিলউল্লাহ্ ১৫১

লেখক পরিচিতি ১৬৯



শুরুতেই আমরা *প্রতিচিন্তা*র উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মভূষণ পুরস্কার লাভের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁর এ প্রাপ্তিতে *প্রতিচিন্তা* পরিবার গভীরভাবে আনন্দিত ও গর্বিত। আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য কামনা করি। প্রতিবারের মতো এই সংখ্যাটিতে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজসহ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়টি আলোকপাত করা হয়েছে।

জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে বাংলাদেশ যে সংকটকাল পার করছে, সেটার একটি মূল্যায়ন করেছেন বদরুল আলম খান। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম, কোন ধারায় তাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-দর্শন, সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে এগোবে; এটি কি ইসলামবহির্ভূত বাঙালি জাতীয়তাবাদ, না ইসলামি জাতীয়তাবাদ? আত্মপরিচয় নির্ধারণের কি একটি মাত্র পথই খোলা আছে? এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিশ্লেষণ করেছেন লেখক।

মহিউদ্দিন আহমেদ নবধারার নাগরিক আন্দোলনের উদ্ভব, বিকাশ এবং বর্তমান অবস্থা তুলে ধরতে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নাগরিক সমাজের ভূমিকা আলোচনার পাশাপাশি আমাদের দেশে এর অবস্থা ব্যাখ্যা করেছেন। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সিভিল সোসাইটি বা নাগরিক সমাজের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে এর সম্পর্কের ধরন বিশ্লেষণে এই ধরনের আলোচনা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি।

হায়দার আলী খানের লেখাটি বর্তমান বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই লেখায় অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে কোন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কার দরকার, সেটি বুঝতে সাহায্য করবে। রাজনৈতিক সমস্যাগুলো কোথায় সে বিষয়ে লেখক গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এ ছাড়া, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সক্ষমতা বা শক্তির জায়গাগুলো আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ আঁকার চেষ্টা করেছেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে লেখক পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর উদাহরণ দিয়ে বাংলাদেশে কোন কৌশলগুলো কেন প্রয়োগ করা যাবে এবং কোনগুলো যাবে না তার বিশ্লেষণ দাঁড় করিয়েছেন।

বাংলাদেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় খাতগুলোর মধ্যে পোশাক খাত অন্যতম। সাম্প্রতিক সময়ে পোশাক কারখানাগুলোতে দুর্ঘটনা এবং হতাহতের ঘটনা বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দেয়। এই খাতের মূল সমস্যা হলো সামাজিক কমপ্লায়েন্স বিষয়টি। শ্রমিকদের শারীরিক সক্ষমতা ও কর্মপরিবেশগত উন্নয়নের জন্য এই বিষয়টি অত্যাবশ্যকীয়। খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম ও ফারজানা সেহরীনের লেখাটি সে বিষয়ে আলোকপাত করেছে। আন্তর্জাতিক উৎপাদন চেইনে বাংলাদেশের পোশাক খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই খাতে শ্রমিক ইস্যু সম্পর্কিত সামাজিক অগ্রগতির অবস্থা কী, তা-ই এই আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য।

গণতান্ত্রিক ধারায় উত্তরোত্তর উন্নয়নের জন্য একটি দেশের সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কটি বেশ গুরুত্ববহ। এই সম্পর্ক সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর পেশাদারি বৃদ্ধি অত্যধিক তাৎপর্য বহন করে। জাতিসংঘের মতো একটি বহুজাতিক সংস্থার অধীনে শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে সেনাবাহিনীর পেশাদারি বৃদ্ধিতে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। এ বিষয়ে রাশেদ উজ জামান ও নিলয় রঞ্জন বিশ্বাসের লেখাটি বাংলাদেশের শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা, এর সামনে চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বই আলোচনা অধ্যায়ে এবার মিজানুর রহমান খানের *মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড* এবং গ্যারি জে বাসের *ব্লাড টেলিগ্রাম : নিক্সন, কিসিঞ্জার অ্যান্ড ফরগটেন জেনোসাইড* গ্রন্থদ্বয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমটি আলোচনা করেছেন আ স ম আলী আশরাফ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পেছনে সম্ভাব্য মার্কিন সম্পৃক্ততা খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে এই বইটিতে। মার্কিন দলিলপত্রে সে বিষয়ে কী প্রমাণাদি রয়েছে, তারও একটি ভালো বিশ্লেষণ রয়েছে। লেখক তাঁর লেখায় সমালোচকের দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রেখেছেন, যা মুজিব হত্যাকাণ্ড নিয়ে পরবর্তী গবেষকদের সহায়তা করবে বলে মনে করি।

দ্বিতীয় বইটি নিয়ে আলোচনা করেছেন খলিলউল্লাহ্। এই বইয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য বৃহৎ শক্তির ভূমিকা কী ছিল এবং ইন্দো-মার্কিন সম্পর্ক কীভাবে মুক্তিযুদ্ধকে স্নায়ুযুদ্ধের অংশে পরিণত করে, তার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ, হোয়াইট হাউসে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এবং তাঁর নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারের মধ্যকার কথোপকথনের অডিও টেপ সাম্প্রতিক সময়ে এসে অবমুক্ত হয়েছে। এই বইটির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে সেসব অডিও টেপ। লেখক এই বইয়ের আলোকে ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বিশ্লেষণ করেছেন।

খাতি সমাজ চিন্তা

বাংলাদেশ : একটি ইসলামি প্যারাডাইমের সন্ধানে

বদরুল আলম খান

Your paradigm is so intrinsic to your mental process that you are hardly aware of its existence, until you try to communicate with someone with a different paradigm.[3] — Donella Meadows

সারসংক্ষেপ

জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান এক সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু বিষয় এসব প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। সেটি হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভবিষ্যৎ। নতুন প্রজন্ম কোন ধারায় তাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাবে সেই বিষয়টিও ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে আলোচিত হচ্ছে। বিশেষ করে নতুন এক ইসলামি ধারার উত্থান, যেটি বাঙালি জাতীয়তাবাদকে চ্যালেঞ্জ করছে, সেটিই সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্বের জায়গাটি করে দিয়েছে। শুধু একটি মাত্র বৈশিষ্ট্য দিয়ে জাতিপরিচয় নির্ধারণ করার মাধ্যমে কেউ কেউ ধর্ম ও বাঙালি জাতীয়তাবাদকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। এদের মধ্যে ফরহাদ মজহার অন্যতম। তাঁর নিজের যুক্তি-তর্কের মধ্যে এমন অনেক অসংগতি পরিলক্ষিত হয় যার মাধ্যমে জনমনে জাতীয়তাবাদ এবং ধর্ম—উভয় সম্পর্কেই বিভ্রান্তির জন্ম হয়।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : জাতীয়তাবাদ, ধর্ম, রাজনীতি, সংস্কৃতি, সাম্রাজ্যবাদ, আধুনিকতা, আত্মপরিচয়, ভূকৌশলগত রাজনীতি, ফরহাদ মজহার।

প্রারম্ভিক কথা

বাংলাদেশ আজ এক আদর্শিক সংকটকাল পাড়ি দিচ্ছে। সেই সংকট মূলত রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক। তার ওপর একটি মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এ প্রবন্ধটি লেখা হলো। যে সংকটের কথা বলা হচ্ছে, তা থেকে উত্তরণে বিশেষ

কোনো উৎকণ্ঠা রাজনৈতিক মহলে নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি বিকল্প চিন্তা আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। যদিও সেটি সুগঠিত নয় এবং যদিও বিকল্প হিসেবে তার প্রণেতা তাকে কতটুকু দেখবেন, জানা কঠিন, তবু সেই বীক্ষণ নানাভাবে আমাদের ব্যক্তিচিন্তাকে এবং রাজনীতিকে প্রভাবিত করছে। ইসলাম ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার কারও কাছে আজ আর কোনো নতুন খবর নয় বটে, কিন্তু তার ভিত্তিতে নতুন আদর্শিক বিকল্প গড়ে তোলার সবিনয় এই বিশেষ আকাঙ্ক্ষাটি কেন মনোযোগ দাবি করে, তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, রাজনৈতিক ইসলামের যেসব ধারা ইতিমধ্যে বাংলাদেশে তৎপর এবং যাদের অনেকগুলোই কোনো না কোনোভাবে ইসলামি মৌলবাদের বৈশ্বিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তারা কী কারণে বাংলাদেশকে একটি ইসলামি রাষ্ট্র হতে হবে, তার যৌক্তিকতাকে কোনো স্থানিক তত্ত্ব দিয়ে তুলে ধরতে সক্ষম হয়নি। আদর্শের স্থানীয়করণের সেই কাজটি এতকাল অসম্পূর্ণ থাকলেও এই বিকল্প আদর্শিক কাঠামো সেই অভাবটি পূরণ করেছে মূলত ফরহাদ মজহারের কল্যাণে। তবে ওই চিন্তায় নিহিত ব্যতিক্রমধর্মিতাই কিন্তু এই লেখার একমাত্র কারণ নয়। তার চেয়েও বড় কারণ হচ্ছে, পুঞ্জীভূত আকারে সেখানে বাংলাদেশের আদর্শিক উত্থান-পতনের একটি সার্বিক চিত্র মেলে, নির্যাস আকারে সংকটের মূর্ত রূপ তো বটেই, সেই সঙ্গে আরও ধরা পড়ে ওই দীনতার একটি নয়, একাধিক প্রবণতা।

এই ভাবপ্রবাহটি সম্পর্কে কেন অবগত হওয়া জরুরি, তার দ্বিতীয় কারণ রয়েছে। সেটি হলো সেখানে বাম রাজনীতির এ দেশীয় সংস্করণের একটি প্যাটার্ন আঁচ করা যায়। সেই প্যাটার্নে আজ সংকটে নিমজ্জিত জাতীয়তাবাদী আদর্শের সঙ্গে তার নৈকট্যের প্রকৃতিগত দিকটি কম গুরুত্বের নয়। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে এ দেশে যাঁরা দীর্ঘকাল সম্পৃক্ত ছিলেন বা আছেন, তাঁদের মনোজগতের পরিবর্তনটি অনেকেই লক্ষ করবেন। ঠিক মজহারের মতো গভীর বৈপরীত্যে ভরপুর। উত্তাল বিবর্তনের অপঘাতে বিধ্বস্ত হওয়ার পর ওই আদর্শ আজ নতুন আঙ্গিকে ঘর গোছানোর শান্ত, নিদ্রালু প্রচেষ্টায় রত হলেও যে আদর্শিক ভগ্নাংশের ওপর দাঁড়িয়ে ওই নব্য ভাবনা বাসা বাঁধছে, সেখানে দুটি একে অপরের বিরোধী প্রবণতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার একটি হলো পুঁজিবাদ-সমাজবাদ দ্বন্দ্ব থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়ে মধ্যবর্তী অবস্থান থেকে নতুন আদর্শ গড়ার প্রচেষ্টা। অথবা পুঁজিবাদী বিকাশ যেসব পরিত্যক্ত বিষাক্ত উপাদান মানুষের জৈবিক অস্তিত্বকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিয়েছে (পরিবেশ, গ্রিনহাউস গ্যাস), সেসব ইস্যুকে নিয়ে অথবা সমাজের শ্রেণী নয় বরং অধস্তন নাগরিক সংকটকে মূলধন করে ভিন্ন আদর্শিক ধারার জন্ম দেওয়া। বাম রাজনীতির ভিন্ন আরও একটি ধারা নতুন রাজনীতির ক্ষেত্র হিসেবে নাস্তিক-আস্তিক বিভক্তির দেয়ালকে কাজে লাগাতে চায়। নাস্তিক সমাজতান্ত্রিক

আদর্শ এবং ধর্মীয় আস্তিকতার দ্বন্দ্বে সংকটপীড়িত এই আদর্শ আকস্মিকভাবে আন্তর্জাতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে স্থানীয় জ্ঞানপ্রীতি দেখাতে উদগ্রীব, অনেকটা ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুঁকোর ঢঙে[১]। ইরানের আয়াতুল্লাহদের বিপ্লব (১৯৭৯ সালের) মিশেল ফুঁকোর মনে যে বিকল্প আবেগ সৃষ্টি করেছিল এবং আধুনিকতার বিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে নতুন শিয়া আধ্যাত্মিকত্বকে আবিষ্কার করেছিল, সাবেক মার্ক্সবাদীদের অনেকেই ঠিক একই পথে পবিত্র ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার ঘটিয়ে বাঙালি আধ্যাত্মিকতার নিজস্ব ঢং গড়ে তুলতে সচেষ্ট আছেন। প্রবণতাটি কেবল যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, এ কথা ভাবলে ভুল হবে। আন্তর্জাতিকভাবে সোভিয়েত কমিউনিস্টরা ইতিমধ্যে পুঁজিবাদ ও ধর্মীয় ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন। এককালে আফগানিস্তানে যাঁরা কমিউনিস্ট ছিলেন, তাঁদের অনেকেই তালেবানের কৌশলগত নেতৃত্বে নিজেদের নতুন সত্তা আবিষ্কার করেছেন। বাংলাদেশি বামের চরিত্র সেদিক দিয়ে ভাবলে বিশেষ কোনো চমক সৃষ্টি করে না বটে, কিন্তু তারই এককালীন প্রতিনিধি ফরহাদ মজহারের নিজস্ব ডিগবাজির চারিত্রিক দুর্ধর্ষতা এবং দানবীয়তা নিঃসন্দেহে অবাক করে।

বাম ধারা ও জাতীয়তাবাদ

সাম্প্রদায়িকতা এবং আস্তিক-নাস্তিক বিভেদের দেয়াল সৃষ্টি করে বাংলাদেশি বামের একাংশ যে আদর্শিক বিকল্পের জন্ম দিচ্ছে, সেটি কিন্তু মৌলবাদী ইসলামের এক অভিন্ন মহাস্রোতেই মিশে যায়। আর সেই মহাস্রোতের আদর্শিক উৎসকে আংশিকভাবে হলেও খুঁজে পাওয়া যায় বাঙালি জাতীয়তাবাদে। নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এ দেশের প্রধান সেই আদর্শ আমাদের মনোজাগতিক ক্ষুধার আংশিক সমাধান করে গেছে, সন্দেহ নেই। এবং এ কথাও তো সত্য যে ৪২ বছরের রাজনৈতিক উত্থান-পতন, ১৯৭৫-এর পটপরিবর্তন, জাতিপরিচয়ের পরিবর্তে ধর্মীয় মুসলিম পরিচয়ের প্রাধান্য এই আদর্শের দেহে রক্তের ছাপও রেখে গেছে। তা ছাড়া নিঃশেষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদ নিজেকেই কেবল নিঃশেষিত করেনি, প্রকৃতিগতভাবে ভয়ংকর এক সংকটও সে রেখে গেছে আমাদের জন্য। বাঙালি জাতীয়তাবাদ যখন ধর্মনিরপেক্ষতাকে বুঝে কিংবা না বুঝে এ দেশের সংবিধানে স্থান করে দিয়েছিল ধর্মভীরু বাঙালিকে গোলকধাঁধায় ফেলে দিয়ে, তখন তাকে ধর্মহীনতা হিসেবে বিবেচনা করে ওই ধর্মহীনতার আদর্শিক মোকাবিলার অন্যতম পথ হিসেবে দেশের বাম ও ডান বুদ্ধিজীবী মহল বেছে নিয়েছিল সাম্প্রদায়িকতা আর ভারত-বিরোধিতাকে। ধর্মহীনতার অভিশাপ থেকে মুক্তির এই আদর্শিক প্যারাডাইম পুরোনো, পাকিস্তানি সময়কালের অবশিষ্টাংশ হলেও সেটি জাতিসচেতন বাংলাদেশের জন্য কার্যকর একটি আদর্শে কেন পরিণত হয়ে গেল, তার জুতসই

কোনো ব্যাখ্যা আজও আমাদের হাতে নেই। ২০১৩ সালের নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতার ধরন থেকে যে চিত্র আমরা পাই, তাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ, তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে ওই সাম্প্রদায়িকতার প্রতীকী উপস্থিতি পুনরায় দৃশ্যমান। এই সহিংসতা বিশেষ উৎসাহ নিয়ে ঘটানো হয়েছিল ভারতীয় সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে। ফলে বুঝে নিতে হবে, আগুন জ্বালিয়ে আদর্শিক সীমানা নির্ধারণের এই প্রয়াসকে কেবল আদর্শিকই নয়, তাকে আক্ষরিক অর্থে বুঝে বিরোধটিকে সংখ্যালঘু বনাম সংখ্যাগুরু, কল্পিত ইসলামি বাংলাদেশ বনাম হিন্দু ভারত হিসেবেও দেখতে হবে বৈকি[২]।

এই সাম্প্রদায়িকতার আরও বড় প্রাপ্তি হলো, সে কোনোভাবেই আজ আর একটি বিশেষ রাজনৈতিক মহলের সম্পত্তি নেই। সেখানে দল হিসেবে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী যেন গঙ্গা, যমুনা, ধলেশ্বরীর স্রোতোধারার মতো এক বিন্দুতে মিলিত হয়ে সাম্প্রদায়িকতার নোনাজলে অবগাহন করতে নৈতিক দিক দিয়ে অপরাধ বোধ করে না। গোত্রপরিচয়, পারিবারিক সম্পর্ক, বৈবাহিক সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের বিস্তীর্ণ জালে আটকা পড়া ইদানীংকালীন বাঙালি মধ্যবিত্ত মনন বৈধব্যের জলে বাস করে; দ্বিধাহীনভাবে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর নাগরিক অধিকারকে অবজ্ঞা করে, জাতিপরিচয় সেখানে নিতান্তই মামুলি ব্যাপার। হয়তোবা এই জাতীয়তাবাদ সংখ্যালঘু জাতির প্রতি (পাহাড়ি নামে পরিচিত) যে ব্রাহ্মণ্যবাদী আচরণ করে এসেছে, সে সম্পর্কে আমাদের সচেতনহীনতার মাশুল গুনতে হচ্ছে আজ, এভাবে। তবে এই অভিন্ন সাম্প্রদায়িকতা এবং এককালের অসাম্প্রদায়িক দলের সাম্প্রদায়িক হওয়ায় বাম বুদ্ধিজীবী মহলের কেউ কেউ আজ যে রাজনৈতিক আত্মতৃপ্তি অনুভব করছে (দেখুন ফরহাদ মজহার, খালেদার জয় পরাজয়, ২১ জানুয়ারি ২০১৪) সেটিও আদর্শিক সংকটের প্রলম্বিত গভীরতাকে তুলে ধরে বৈকি। নিশ্চিত যে রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক গর্ভে আশ্রয় নিয়ে জাতীয়তাবাদী আদর্শ জাতির এই চরম দুর্যোগ মুহূর্তকে অবলোকন করছে বিদ্রূপের হাসি হেসে।

বাম আদর্শ এবং জাতীয়তাবাদী ডান আদর্শের এই বিরল মিলন কীভাবে সম্ভব হলো, তার ব্যাখ্যা যে নেই তা নয়। উভয় আদর্শ মানুষের আত্মপরিচয়কে একটিমাত্র পরিচয় দিয়ে চিহ্নিত করে এসেছে। বাম আদর্শ শ্রেণী অবস্থানকে মানুষের একমাত্র পরিচয় হিসেবে মেনে নিয়ে সবার জন্য যে গোষ্ঠীপরিচয় নির্ধারণ করে দেয়, তাতে করে মানুষের বাকি সব পরিচয় নগণ্য অথবা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। জাতীয়তাবাদ জাতিপরিচয়কে আত্মপরিচয়ের একমাত্র মানদণ্ডের মর্যাদা দিয়ে মানুষের বাকি পরিচয়গুলোকে তার কাছে অধস্তন রাখে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ওই একই কথা। অমর্ত্য সেন তাঁর *আইডেনটিটি অ্যান্ড ভায়োলেন্স* নামক

গ্রন্থে এই সমস্যা তুলে ধরেছেন রুয়ান্ডার হুতু ও তুতসিদের[৩] বিরোধের প্রেক্ষাপটে। হুতু এবং তুতসি দুই গোত্র তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ চালায়। মানুষের বহু পরিচয়ের মধ্যে ওই একটি পরিচয়কে আত্মপরিচয়ের একমাত্র উৎস হিসেবে বেছে নিয়ে এবং সেই পরিচয়কে গোষ্ঠীপরিচয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ সন্ত্রাস ব্যতীত যে সম্ভব নয়, সেটি অমর্ত্য সেন ভালোভাবেই দেখিয়েছেন। বিশেষ একটি পরিচয়কে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাম রাজনীতি অথবা ধর্মীয় রাজনীতি অভিন্ন। এই আদর্শের ধারক যখন একটি পরিচয়ের ব্যর্থতায় হতাশ হয় এবং আদর্শিক স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, তখন এক পরিচয় থেকে অন্য পরিচয়ে যাওয়াটা ঠিক মজহারের মতো, যেভাবে তিনি বাম থেকে জাতীয়তাবাদ এবং তা থেকে ধর্মীয় ভাবাদর্শের প্রণেতা হয়েছেন, বড় কঠিন কোনো কাজ থাকে না।

আদর্শিক ফ্রেমওয়ার্ক হিসেবে সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী ইসলাম কিন্তু জাতীয়তাবাদের মতোই ঝুঁকিপূর্ণ ও অকার্যকর। সে কারণে বাম বা জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মতো তার দেহও জর্জরিত এবং ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। পাকিস্তানে জেনারেল জিয়াউল হক ১৯৭৯ সালে যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন এবং রাজনৈতিক ইসলামকে ধীরে ধীরে জঙ্গি রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, তার ফলে আমেরিকা-সমর্থিত মুজাহিদিন এবং আল-কায়েদার ওসামা বিন লাদেনের নেতৃত্বাধীন সোভিয়েতবিরোধী মহাজোট আফগানিস্তানের মাটিতে এক বিশেষ সুন্নি ইসলামি ধারার জন্ম দিয়েছিল। সেই ধারায় স্থান পাওয়া হানাফি, সালাফি, ওয়াহাবি, আল-কায়েদা, হেফাজতি, তালেবানি আদর্শ একে অপরের বিরোধী হয়ে রক্তের বন্যা বইয়েছে। শিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে সুন্নি ইসলামের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম অভ্যন্তরীণ অসহিষ্ণুতাকে জাগিয়ে তুলতে ব্যস্ত রয়েছে ('ইরাকে জঙ্গি নির্মমতা' শিরোনামে দৈনিক *প্রথম আলোয়* ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সালে প্রকাশিত খবর হলো নামাজ পড়তে বাধ্য করে শিয়া নিশ্চিত হওয়ার পর হত্যা)। ওই অসহিষ্ণুতা জাতিবিভেদের কর্কশ এবং মারাত্মক বাস্তবতায় ইরানি, ইরাকি, দ্রুজ, আলায়ি, লেবাননি হিজবুল্লা, আশুরা ইত্যাদি বিপরীতমুখী এবং একে অপরের ধ্বংসকারী ধারা-উপধারায় বিভক্ত হয়ে ইসলাম ধর্মের একতাকেই বিনষ্ট করে দিচ্ছে। অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো বাংলাদেশেও চলছে রাজনৈতিক ইসলামের দেহে নীরব রক্তক্ষরণ, বিভক্তির অনন্ত প্রবাহ। এই আন্দোলন এ দেশে একটি নীরব সংগ্রাম হিসেবে স্বাধীনতা-উত্তরকালে টিকে ছিল। কোনো রকমে নাকটা পানির ওপর উঁচু রেখে ওই সংগ্রামে তার কলঙ্কময় ও সর্বজননিন্দিত ইতিহাসকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে সৈয়দ কুতুব এবং ভারতবর্ষে মাওলানা মওদুদির আদর্শের ওপর ভর করে গণভিত্তিক রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে দাঁড়ানোর চেষ্টাও

নিয়েছিল। কিন্তু আকস্মিকভাবে তার সেই গণমুখী চেহারা পাল্টে গিয়েছে। ফুটে উঠেছে মৌলবাদী রাজনৈতিক ইসলামের চরম সংকট।

ফলে বাংলাদেশকে আজ পুরোনো আদর্শের এক বিশেষ ধ্বংসস্তূপ হিসেবে ভাবতে দোষ নেই। সে ধ্বংসস্তূপে স্থান করে নিয়েছে রাজনৈতিক ইসলাম, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, বামপন্থী রাজনীতি। এ যেন ঠিক সেই চিত্র, যেখানে পোস্টমডার্নিস্টরা আধুনিকতাবাদের তত্ত্বীয় কাঠামোকে ধ্বংস করে ইউরোপে নতুন পোস্টমডার্ন ধারা সৃষ্টিতে ব্রত হয়েছিল দার্শনিক নিৎসের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে[৪]। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সমাজ প্রগতি, ধর্মীয় বিশ্বাস জগৎ, সমতার আদর্শিক কাঠামো, ভ্রাতৃত্ববোধের মতো সব প্রত্যয়; যা আধুনিক প্রজেক্টের মূল ভিতে স্থান করে নিয়েছিল, তাকে ভেঙেচুরে ফেলা। সে প্রজেক্ট ইউরোপে সফল হয়নি। কিন্তু আদর্শের বাংলাদেশীয় এই ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে মনে হতে পারে আর কেউ না হলেও আমরা সেই ইউরোপীয় পোস্টমডার্ন প্রজেক্টের সফল বাস্তবায়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছি। সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে গড়ে তোলা মজহারীয় প্রজেক্ট অর্থাৎ বাংলাদেশের জন্য বিকল্প আদর্শ কতটুকু কার্যকর, সেটিই বিচার্য।

মজহারীয় আদর্শ : প্রাক্‌কথন

ফরহাদ মজহারের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন অভিজ্ঞতায় একটি দিকই চিরন্তন হিসেবে ধরে নিতে হবে, সেটি হলো পরিবর্তন। সেই পরিবর্তনপ্রবাহে দুটি প্রবণতা সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া জরুরি। কারণ তাতে করে পাঠকের পক্ষে আগেভাগেই তাঁর আদর্শিক গতিপথের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে অব্যর্থভাবে সুবিধাবাদের সুস্পষ্ট ছাপ প্রত্যক্ষ করবেন যেকোনো বিজ্ঞজন। রাজনীতির ঘোড়দৌড়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করা তাঁর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। যেভাবেই হোক, নিজেকে রাজনীতির উজ্জ্বল আলোর সামনে দাঁড় করানো, সেখানে প্রতিবাদী অথচ গতানুগতিক নয় এমন কোনো অবস্থানে নিজেকে হাজির করা, যেন, সে অবস্থান যতই সারশূন্য বা অন্তর্বিরোধী হোক না কেন, সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি হয়েছিল কট্টর বাম ধারার সংস্পর্শে এসে, ঠিক যখন চীন-সোভিয়েত বিভেদ তুঙ্গে। বাংলাদেশি বামেরা তখন বড় সংখ্যায় চীন পন্থার দিকে ঝুঁকছে। সর্বহারা পার্টির নেতা হয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পদ্ধতির চুলচেরা বিশ্লেষণে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা এবং আদর্শিক সততা দেখিয়ে প্রতিবিপ্লবীদের সংখ্যা কানায় কানায় পূর্ণ করেছিলেন। বিভেদপীড়িত বাম আন্দোলনের ধূম্রজালে তাঁর প্রয়াস যখন ধূসর হতে চলেছে, তখন আদর্শিক যাত্রার মোড় জাতীয়তাবাদী ধারার দিকে ঘুরিয়ে নিতে তিনি কালবিলম্ব করেননি। শেখ

হাসিনাকে রাজকুমারী বলে সম্মানিত করে নিজ আদর্শের একটি সামাজিক বন্দর নির্মাণে ক্ষীণকাল উৎসাহী হয়েছিলেন, কিন্তু সুবিধার ঘাটতি ঘটায় পুনরায় দিক পরিবর্তন করে ইসলামি জাতীয়তাবাদী আদর্শের চোরা স্রোতোধারায় নিজের অবস্থানকে নতুন করে আবিষ্কার করেন। সেপ্টেম্বর ৯-এর টুইন টাওয়ার আক্রমণের পর সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা যখন ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে, তখন ওসামা বিন লাদেনকে বর্তমানকালের চে গুয়েভারার সম্মানে ভূষিত করেন। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লাদেনীয় উগ্রতার একনিষ্ঠ সঙ্গী মজহার তাঁর আদর্শিক নৌকাকে শেষমেশ কট্টর রাজনৈতিক ইসলামের বিপজ্জনক বেলাভূমিতে নোঙর করেন। অর্থাৎ এককালের নাস্তিক মজহার রূপান্তরিত হয়ে যান আস্তিক মজহারে। অধ্যাপক সামুয়েল হান্টিংটনের সভ্যতার সংঘাত[৫] তাঁকে এ ক্ষেত্রে কতটুকু উদ্বুদ্ধ করেছিল বলা কঠিন হবে। যদিও ইসলামপন্থী রাজনৈতিক বিশ্বকে মার্কিন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে খ্রিষ্টীয় সভ্যতার আদর্শিক ঘাঁটিতে আঘাত করার সংগ্রাম কিন্তু সঠিকভাবেই তাঁর ওই আদর্শিক সংঘর্ষের ফ্রেমওয়ার্কে বেশ ভালোই খেটে যায়[৬]। চরাই-উতরাইয়ে ভরপুর এই সুদীর্ঘ অভিযাত্রা সুবিধাবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে আজ আর বাধা নেই। কারণ পৌনঃপুনিক অবস্থান বদলের গুণাবলিসমৃদ্ধ এই রাজনৈতিক জীবনটি সবার কাছে যেকোনো সময়ের চেয়ে আজ অনেক বেশি স্বচ্ছ।

প্রাক্সিসের এই রঙিন এবং বিনোদনী জগতের বাইরেও আরও এক নন্দিত জগৎ তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন, পরিসরগত এবং সুবিধাবাদের বিচারে যেটি কম বিস্তীর্ণ নয়। জ্ঞানের স্থানীয়তার ওপর জোর দিতে গিয়ে তিনি সাম্রাজ্যবাদের সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে জেহাদি সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন। সেই প্রয়াসে প্রথমেই ভাষাতত্ত্বের জগতে আঘাত বাংলা ভাষার ইসলামীকরণের প্রজেক্ট হাতে নিয়ে। 'উন্নয়ন রাজনীতি' নিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব যখন মাতোয়ারা, তখন এক বিকল্প উন্নয়নধারার জন্ম দিতে তিনি উৎসাহ দেখিয়েছেন। ওষুধনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন তাঁর কাম্য ছিল। সে উদ্দেশ্যে গণস্বাস্থ্যভিত্তিক বিকল্প স্বাস্থ্যনীতির পক্ষে ওকালতি করেছেন। 'নবকৃষি আন্দোলন' শুরু করে কৃষি উৎপাদনে স্থানীয় লোকজ্ঞানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে যে জ্ঞানভান্ডার তিনি গড়ে তোলেন, সেটি বহুজাতিক করপোরেশনকে, তাঁর ধারণায়, এক হাত দেখে নিয়েছেন বটে। কিন্তু সেই প্রয়াসের অর্থ এসেছে সাম্রাজ্যবাদী দেশের প্রাতিষ্ঠানিক অনুদান থেকে। ভাবাদর্শের দেশীয় জগৎও তাঁর প্রভাবমুক্ত থাকেনি। বাংলার মাটির আপন সন্তানদের আধ্যাত্মিক ভুবন বিশেষ করে লালনকে অবলম্বন করে তিনি জাতিপরিচয়ের নতুন সীমানা আঁকতে সচেষ্ট হয়েছেন। নিজ প্রচেষ্টাকে আধ্যাত্মিক জগতের বলয়ে সীমিত না রেখে লালনের জন্মস্থানে তিনি গড়ে তুলেছেন এনজিওভিত্তিক প্রতিষ্ঠান,

যা কিনা অর্থ উপার্জনের একটি মাধ্যম হিসেবে বেশ সুফল দিয়েছে। অর্থাৎ প্রতিভাধর এই ব্যক্তি এমন একটি আদর্শিক এবং ব্যবহারিক ভুবন গড়ে তুলেছেন, যে ভুবনে মানুষ ভুল করে স্বদেশপ্রেম ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার গভীর বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করে থাকেন।

ফরহাদ মজহারের আদর্শিক কাঠামোতে সমন্বয়ী বা মিশ্র কৌশল কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে আছে, এটি আবিষ্কার করা কঠিন কোনো কাজ নয়। তবে সমন্বয়ী বলে তাঁকে অপাঙ্‌ক্তেয় ভাবা শ্রেয় হবে না। যে দেশে তিনটি মৌলিক আদর্শের কোনোটিই কার্যকরী শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে পারেনি, সে দেশে সমন্বয়ের কৌশলী উপস্থাপন কিছুটা কার্যকর হলেও হতে পারে, এমন আশাবাদ অবান্তর হবেই বা কেন। সমন্বয়ী পদ্ধতির নানা প্রয়োগ আমরা ইতিমধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি একটি কৃষিপ্রধান সমাজে ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে সামাজিক সমতার ধারণাকে গ্রহণযোগ্য করার আন্দোলনে। এককালে তথাকথিত 'ধর্মহীনতার' অপবাদকে পাশ কাটানোর লক্ষ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা শুনেছি রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডকে ধর্মের হস্তক্ষেপ থেকে দূরে রাখার পরামর্শে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের অনুষঙ্গ হিসেবে সমাজতন্ত্র ও ধর্মের সেই সমন্বয়ী কৌশল কতটুকু সফল হয়েছিল, তা পরিমাপের কোনো মানদণ্ড নেই। কিন্তু বিশ্ব পরিসরে সমাজতন্ত্রের আপাত ব্যর্থতাকে নির্ণায়ক হিসেবে ধরলে তার পরিধি পরিমাপের জন্য পণ্ডিতি মেধার প্রয়োজন হয় না। আজ ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির কৌশলগত ভ্রান্তি এই ধারা উপলব্ধি করে। আর সেই ভ্রান্তি সংশোধনে ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে অসাম্প্রদায়িক শব্দটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় আরও একটি সমন্বয়ী পথ লক্ষ করা গিয়েছিল মওলানা ভাসানীর মতো জাতীয় এবং জনপ্রিয় নেতার কৌশলে। ইসলামি বাক্যবিন্যাসের সহায়তা নিয়ে তিনি ধর্ম সম্পর্কে সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গির তেতো ভাবটা কিছুটা হলেও লঘু করার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। মানুষের শ্রদ্ধাও কুড়িয়েছিলেন সযত্নে। কিন্তু সহযাত্রীদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাঁকে অপদস্থ করার ষড়যন্ত্রে ওই প্রয়াসের নৈতিকতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। মওলানা সাহেব নিজেও বিভিন্ন সময়ে স্ববিরোধী এবং অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে নিজের প্রচেষ্টাকে নিজেই লঘু করেছিলেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাঁর সেই কৌশল ব্যর্থ হয়েছিল সফল হওয়ার আগেই। তবে স্বীকার করতেই হবে যে সমন্বয়ধর্মী চিন্তাকাঠামো নিয়ে পরীক্ষণের যেমন সুবিধা রয়েছে, তেমনি রয়েছে ঝুঁকি। ঝুঁকি হলো এখানে ধর্মকে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধরে নিয়ে তার গায়ে সমাজবাদের রং মিশিয়ে সমন্বয়ের যে ভাব সৃষ্টি করা হয়, সেখানে দুই আদর্শ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে অবস্থান করে। ফলে আপৎকালীন দুর্যোগের মুখে সমাজবাদকে ত্যাগ করে ধর্মের রাজনৈতিক আশ্রয়ে যাওয়ার লোভ সংবরণ করা অনেকের পক্ষে কঠিন হয়। মিশ্রের আরো যে সুবিধা নেই তা নয়। তাকে

নানাভাবে ব্যবহার করা যায়। বহু উপাদান নিয়ে গড়ার কারণে কোনো এক দিকের দুর্বলতাকে সমালোচনায় কাবু করা গেলেও সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিককে হাজির করে সমালোচনার যুক্তিকে খণ্ডন করা সম্ভব হয় বলে। ফলে পদ্ধতিগত দিক থেকে মিশ্র আদর্শের থাকে এক নয়, একাধিক প্রতিরোধের দেয়াল।

ফরহাদ মজহার তাঁর মিশ্রতাত্ত্বিক অবস্থানের বিপদ সম্পর্কে কতটুকু সচেতন বা তাঁর অবস্থান কতটুকু ঝুঁকিপূর্ণ, সেটি পরিষ্কার নয়। তাঁর সেই মিশ্র ভাব যদি নিজেই বড় বিপদের কারণ হয় অর্থাৎ সরষের ভেতরেই যদি ভূতের আস্তানা থাকে, তাহলে সেটি সবারই মাথাব্যথার কারণ হবে বৈকি। কারণ মজহারীয় আদর্শের কোথাও রয়েছে সমাজতন্ত্রের কথা, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা, নগর সভ্যতার বিরোধিতা, আবার পরিপূর্ণ নাগরিক না হওয়া নিয়ে দোষারোপ ও হাহুতাশ[৭], সামাজিক আশ্রয় হিসেবে হেফাজতে ইসলামের দ্বারস্থ হওয়া, জামায়াতে ইসলামীর মতো রাজনৈতিক ইসলামসহ ইসলাম নাম ব্যবহারকারী অন্যান্য সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করার অমিত আকাঙ্ক্ষা। সেখানে মধ্যবিত্ত-বিরোধিতা রয়েছে, একাত্তরের স্বাধীনতাসংগ্রামের বিরোধিতা আছে, দেশজ আদর্শ এবং ভাবের কথা আছে, আউল-বাউলের ভিত্তিমূলকে আদর্শিক তৃণমূল হিসেবে স্থান দেওয়ার নৈতিক তাগিদ আছে। কিন্তু নিশ্চিতভাবে এর সবকিছুর মূল লক্ষ্য ফ্যাসিবাদী একটি ইসলামি রাষ্ট্র, যার চারণভূমি জামায়াতে ইসলামীর মতো সাম্প্রদায়িক এবং মৌলবাদী রাজনীতি বা হেফাজতে ইসলাম আন্দোলন। হিটলার যেমন জাতীয় সমাজতন্ত্রের আশ্রয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন আদর্শিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মানবতার শত্রু তৃতীয় রাইখ, বিকল্প আদর্শ সৃষ্টির নামে মজহারের লক্ষ্য এবং পথটাও অনেকটা সে রকমের।

অবশ্য তাঁর ভাবগত অবস্থানের আকর্ষণশক্তি যে নেই, তা নয়। নিজের অবস্থানকে বিশুদ্ধভাবে বিদেশজাত তত্ত্ব থেকে দূরে রেখে তিনি, তাঁর দাবি অনুসারে বাংলার মাটির ওপর দিয়ে নানা ভাবের যে প্রবাহ এতকাল বয়ে গেছে, সেই ভাবকে ব্যবহার করেছেন। পদ্ধতিগত দিক থেকে এর মূল্য অপরিসীম। দেশীয় আদর্শ দিয়ে দেশীয় সমস্যার সমাধান অবশ্যই আত্মতৃপ্তির কারণ হতে পারে। তা ছাড়া দেশীয় ওই ভাববৃক্ষের পরতে পরতে তিনি লক্ষ করেছেন বিপ্লবী চরিত্রের উপস্থিতি, যে কারণে সে কেবল ভাবাদর্শই নয়, সমাজ পরিবর্তনের অনুঘটকও বটে। দেশীয় আদর্শ নিয়ে এই উৎসাহ সহজ কথা নয়, সেখানেও যে রয়ে গেছে নানা চ্যালেঞ্জ, সে উপলব্ধি এসেছে অতি দ্রুত। প্রথমত, ওই ভাবকে ব্যবহারোপযোগী করতে হলে তাকে ইতিহাসের গহ্বর থেকে উদ্ধার করা চাই। চাই তাকে মাটি-বালি থেকে মুক্ত করে তার প্রকৃত চেহারাকে উন্মোচিত করা। সমস্যাটি কেন দেখা দিল, তার কারণ রয়েছে। তাঁর মতে, বাঙালি জাতি নিজের

ভাবজগতের প্রতি বিশেষ কোনো মনোযোগ দেখায়নি কখনো, তার প্রতি বেখেয়ালি এবং উদাসীন থেকে বরং উপেক্ষা করে এসেছে বিদেশজাত নানা ভাবের প্রতি অনুরাগ দেখিয়ে, অনেকটা মাইকেল মধুসূধনীয় অভিজ্ঞতার মতো করে। আজ দেশীয় তত্ত্বের ঝাঁজ অনুভব করার সময় এসেছে, এসেছে আত্মশুদ্ধির। সেই প্রয়োজনটি উপলব্ধি করে অনেকটা দক্ষ প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো তিনি নিজেই ওই দীর্ঘ পরিত্যক্ত ভাবজগতের বৈপ্লবিক চরিত্র উদ্ধারে ব্রত হয়েছেন। বাংলার ভবিষ্যৎ পথনির্দেশনায় সঠিক মর্যাদা দেখিয়ে তিনি তাকে ব্যবহার করতে চান। আর সেখানেই রয়ে যায় তাঁর চিন্তার মৌলিকত্ব। তবে জটিলতা রয়ে যায় অন্যখানে। অণুবীক্ষণীয় বিশ্লেষণে তাঁর সৃষ্ট সেই তাত্ত্বিক কাঠামোটিতে ধরা পড়ে বিরাট সব গলদ। গলদটি কোনো অসতর্কতার ফসল নয়, বরং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সেখানে রয়েছে জাদুকরি ফাঁকি, অভাবনীয় স্ববিরোধিতা, কথা এবং কাজের অমার্জনীয় বৈষম্য। ফাঁকিগুলো বাংলাদেশে সামাজিক-রাজনৈতিক মেরুকরণ যতই তীব্র এবং ঘনীভূত হচ্ছে, ততই প্রস্ফুটিত হচ্ছে। এই স্ববিরোধী অবস্থান এতকাল কেন বা কীভাবে ধামাচাপা রইল, কেন সচেতন পাঠকের কাছে তা ধরা পড়ল না, সেটি বিস্ময়কর।

তবে তাই বলে তাঁকে যে চরম খেসারত দিতে হয়নি তা কিন্তু নয়। শেষমেশ ককটেলের মতো এক জাতীয় সমন্বয়ী আদর্শ সৃষ্টি ছাড়া তাঁর আদর্শিক জিহাদ বেশি দূর এগোতে পারেনি, যার মিশ্র কারুকার্যে বিপরীতমুখী উপাদানের অভাবনীয় সমাবেশ; সামাজিক সমতার মোহনীয় অঙ্গীকার; ভেদমুক্তির প্রতিশ্রুতি, বাংলা-আরবি শব্দের খেয়ালি অথচ সচেতন মিশ্রণ; বাঙালি স্বকীয়তার অন্তরালে বাঙালিত্বকে ইসলাম হিসেবে জাহির করার দুরূহ প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। শব্দের ভোজবাজি, পাকা জাদুকরি পারদর্শিতা দিয়ে সেখানে সৃষ্টি হয়েছে এক বিশেষ শব্দ লহঙ্গ, যা আর কিছু না হোক, এ দেশীয় আদর্শিক লড়াইয়ে একটি অশনিসংকেত বটে। বাংলাদেশকে তার নিজস্ব সংস্কৃতির ভাষায় বোঝা এবং তার ভিত্তিতে উপযুক্ত আদর্শ গড়ার কৃতিত্ব দাবি করতে গিয়ে তিনি যে মিশ্র ভাবদর্শনের ছদ্মাবরণ ব্যবহার করেছেন, সেখানে লুকিয়ে রয়েছে জঙ্গিবাদী এক ইসলামি রাষ্ট্রের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের আবছায়া ধরা পড়ে তাঁর লেখায় ও রাজনৈতিক প্রাক্সিসে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা

ফরহাদ মজহারের বিশেষ ঘৃণা রয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি। তাঁকে তিনি তুচ্ছজ্ঞান করে ইসলামি সমাজ গড়ার বিকল্প পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন। ইসলাম ধর্মকে বাদ দিয়ে বাঙালি জাতিসত্তাকে ভাবতে তিনি নারাজ। কারণ ইসলাম ও বাঙালির আত্মিক সম্পৃক্তিকরণ যাকে সিনেরজি বলে, তাঁর মতে, তৈরি হয়েছে

ইসলামের প্রতিবাদী ঐতিহ্য, ভেদবিরোধী প্রকৃতির কারণে। তিনি লিখেছেন, 'ধর্ম 'আধ্যাত্মিক' ব্যাপার হয়ে চিন্তার পর্যালোচনা, ভাবচর্চা ও রাজনীতি থেকে আলাদা হয়ে থাকুক এই অবাস্তব ও আজগবি অবস্থান নিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা পুরানা ডুগডুগি বেদম পিটিয়ে যাচ্ছে। জাতীয়, আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক বাস্তবতা তাকে নতুন করে কিছুই ভাবতে শেখায় নি। বরং তার অবস্থান আগের মতোই ঘোর সাম্প্রদায়িক। বাঙালিত্বকে ইসলামের বিপরীতে স্থাপন করার পুরানা সাম্প্রদায়িক অভ্যাস সে এখনো ত্যাগ করে নি' (মজহার, ২০০৬ পৃষ্ঠা ২৭)। অর্থাৎ তাঁর ধারণায় বাঙালির নাগরিক পরিচয় ধর্ম দিয়ে সংজ্ঞায়িত হতে হবে, জাতিপরিচয় দিয়ে অথবা অন্য কোনো পরিচয় দিয়ে নয়।

আত্মপরিচয়ের এই দিকটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে এমন সব রাষ্ট্রে বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। ধর্মের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক কী হওয়া উচিত, সেটি ঠিক ফরহাদ মজহারের মতো করে নির্ণয়ের প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে আমরা লক্ষ করেছি অন্যান্য দেশে ও সমাজে। সে অভিজ্ঞতা বিশেষ মধুর নয়। বিশ্বের সব মুসলিম রাষ্ট্রকে নিয়ে একটি উম্মা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জন্মেছিল ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক দিনগুলোতে। সেই উম্মা গঠনে নানান অপ্রত্যাশিত বাধা এসে হাজির হয়েছিল এবং সেগুলোর সমাধান খুঁজে বের করা ইসলামের পক্ষে সেকালে সম্ভব হয়নি। হজরত মোহাম্মদ (দ.)-এর মৃত্যুর পর ইসলাম ধর্মে শিয়া ও সুন্নি বিভক্তি গভীর খাদের সৃষ্টি করে। নানা অধ্যায় পেরিয়ে সেই বিরোধ জাতিগত ও সংস্কৃতিগত বিরোধে রূপান্তরিত হয়ে মুসলিম জগৎকে রক্তাক্ত অন্তর্দ্বন্দ্বে বিভক্ত করে রাখে। ইরাক-ইরান সংঘর্ষ, সৌদি আরবের সঙ্গে অন্যান্য মুসলিম দেশের সংঘাত, পাকিস্তান-বাংলাদেশ দ্বন্দ্ব ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ ধ্বংসকারী শক্তির উদ্বেগপূর্ণ উত্থানের কারণে মুসলিম উম্মার ধারণাকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল শেষমেশ। সেই ব্যর্থতার কিছুটা হলেও পুষিয়ে নেওয়ার ইদানীংকালীন কৌশল হিসেবে আমরা একক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে সংঘবদ্ধ করা, তাদের নাগরিক পরিচয়কে ইসলামি পরিচয় হিসেবে দাঁড় করানোকে দেখি। বাধা সে ক্ষেত্রেও যে কম তা নয়। অভ্যন্তরীণ বিভেদের বিমিশ্র রংধনু ঐক্যের বদলে আজও জন্ম দিচ্ছে রাজনৈতিক ইসলামি সহিংসতার। শিয়া-সুন্নি বিভেদের তীব্রতা, সুফি-সালাফি বিভেদ উভয় কুলের ভক্তদের মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়েছে। আল-কায়েদা, হানাফি, ওয়াহাবি এবং তালেবানি বিভেদ মুসলমানদের মধ্যে মিত্রতার চেয়ে শত্রুতার জন্ম দিয়েছে। সগোত্রীয়ের বিরুদ্ধে মুসলমানরা দাঁড়িয়েছে ক্ষুদ্র ধর্মীয় অসহিষ্ণুতাকে উপলক্ষ করে। এতকাল অভিন্ন ইসলামের কথা বলা হলেও রাজনীতির আশ্রয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সেই 'অভিন্ন ইসলাম' ইতিমধ্যে এমন সব আগাছা ও পরগাছার জন্ম দিচ্ছে, যেখানে সত্যিকার ধর্মভীরু মানুষ নিজের আত্মরক্ষার

সংগ্রামে হিমশিম খাচ্ছে। ফলে ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার প্রশ্নটি রাজনীতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা আজ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে গুলিয়ে ফেলে আজ আধ্যাত্মিকতাবর্জিত এক বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শ নির্মাণ করা হচ্ছে, যার চাপে ধর্ম ও সমাজ উভয়ই ধ্বংসের মুখোমুখি। রাজনৈতিকীকরণের নেতিবাচক প্রভাব থেকে ধর্মকে যদি মুক্ত করতেই হয়, তাহলে সেটি একটি যুদ্ধও বটে, জিহাদ বলাই শ্রেয়, যেখানে জিহাদের অর্থ মনের বিশুদ্ধতার সংগ্রাম এবং পবিত্র ধর্মগ্রন্থের মর্মবাণী দিয়ে তাকে বুঝলে সে সংগ্রাম ইদানীংকার তালেবানি জেহাদের চেয়ে শত গুণে বিশুদ্ধ[৮]। ঠিক সেই জাতীয় সংগ্রাম হিসেবে, যেটি কেবল ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনের যুদ্ধ হতে পারে, পারে অন্তরের যুদ্ধ হতে—প্লেটোর 'নো দাইসেলফ'[৯] -এর মতো ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মশুদ্ধির আন্দোলন দাঁড় করিয়ে।

ফরহাদ মজহার তাঁর ভাব আন্দোলনের পুরো নকশা এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে এঁকেছেন। সে কারণে তাঁর নিজের অবস্থানটি এই রাজনৈতিক বিভক্তির খণ্ডিত সাম্রাজ্যে কোথায় অবস্থান করে, তা পরিষ্কার করে তিনি জনগণকে অবহিত করেছেন কি না, সেটি আগেভাগে যাচাই করে নিতে হবে। ইসলাম বলতে তিনি কোন রাজনৈতিক ইসলামকে বুঝিয়েছেন, প্রশ্ন সেখানে। এক বাংলাদেশেই রয়েছে জামায়াতে ইসলামী, হেফাজতে ইসলাম, হরকাতুল জেহাদ ই ইসলাম, জামাআতুল মুজাহিদীন, জাগ্রত মুসলিম জনতা, বাংলাদেশ সাহাদাত এ হিকমা, হারকাতুল জিহাদ, হারকাতুল ইসলামিয়া, জামিয়াত কোরানিয়া আরাবিয়া এবং আল খিদমাতের মতো নম্র ও উগ্রপন্থী কয়েক শ রাজনৈতিক ইসলামি ধারা। পবিত্র কোরআনের সূরা আল-ইমরানে (আয়াত ১০৩) মুসলমানদের ওপর সৃষ্টিকর্তার দেওয়া একটি বিশেষ নির্দেশ শর্তেও বিভক্ত জীবনে অতি উৎসাহ, ইসলামি দাবি করে একে অপরকে ধ্বংসের পথ অনুসরণ করা কেন, সে প্রশ্ন হয়তো এখানে নাইবা টেনে আনা হলো, কিন্তু সেই বহুমুখী জীবনপ্রবাহে ফরহাদ মজহারের অবস্থানটি কোথায়, সেটি না জানিয়ে 'ইসলাম' সাইনবোর্ড ব্যবহার করা নৈতিকভাবে প্রশ্নবোধক।

পাশাপাশি ধর্মকে আত্মপরিচয়ের একমাত্র উৎস হিসেবে দেখার ও তার প্রবক্তা হওয়ার বিপদ মজহার নিজেই হয়তো একসময় উপলব্ধি করবেন। কারণ নিজেকে স্থানীয় চিন্তাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি নিজেই এক দ্বন্দ্বে পড়েছেন। সেই স্থানীয়করণ প্রক্রিয়ার অন্যতম দিক, তাঁর কাছে, বাঙালির ব্যবহারিক জীবনের প্রতীকী ব্যবহার। তার প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তিনি লুঙ্গি পরেন, গায়ে সওদাগরি কুর্তা জড়ান, কাঁধে গামছা রাখেন। ঠিক একজন বাঙালি কৃষক বা ব্যবসায়ীর ঢঙে নিজ অবয়বকে গড়ে তোলার ছলে। প্রতীকী এই দিক তাঁর ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু এ দিয়ে তাঁর পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব তিনি এ দেশের

সাধারণ মানুষেরই একজন, তাঁর আদর্শ ও দর্শন একেবারে এ দেশের মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। তবে প্রতীক যদি সত্যিই গুরুত্ববহ হয় এবং যদি তাকে তিনি অপরিহার্য বিবেচনা করে থাকেন, তাহলে ইসলামি আদর্শের একজন প্রধান প্রবক্তা হয়ে এবং ধর্মকে আত্মপরিচয়ের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে দেখেও তিনি কেন ইসলামি আইনের আওতায় প্রাত্যহিক করণীয় কাজগুলোকে নিজের জীবন থেকে নির্বাসন দিয়েছেন, প্রশ্ন সেখানে। নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য তো বটেই, তা ছাড়া মজহারকে প্রমাণ করতে হবে ধর্মের বাইরে তাঁর নিজের আর কোনো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পরিচয় নেই। অন্যথায় আদর্শ ধর্মবিশ্বাসী মানুষের মনে তাঁকে নিয়ে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা কৌতূহল সৃষ্টি হবে তাঁর উত্তর দেওয়া মজহারের পক্ষে কঠিন হতে বাধ্য।

তবে 'ইসলামি আদর্শকেন্দ্রিক' তাঁর ভাব আন্দোলন সামাজিক ভেদের প্রশ্নকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়, ভাব আন্দোলনকে 'সাদা/কালো, প্রাচ্য/পাশ্চাত্যের ভেদ' অবসানের অনুঘটক হিসেবে দেখার পরামর্শ দেন। সেদিক থেকে ভাব সম্পর্কে সাধারণভাবে নেওয়া এই অবস্থান কিন্তু দার্শনিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের সব কর্মকাণ্ডের মূলে কান্ডারির মতো ভাবের একটি নিকট উপস্থিতি থাকে, উপলব্ধি করা হোক বা না হোক। ওই ভাবকে সার্বিক অর্থে দেখা সম্ভব হলেও তাকে তিনি বাংলাদেশের বিশেষ পরিবেশে প্রয়োগ করা, সেই প্রয়োগকে যথোপযুক্ত করা কীভাবে সম্ভব, সে দিকটি বিশেষভাবে ভেবেছেন এবং কয়েকটি ধাপ নির্ণয় করেছেন। সে ক্ষেত্রে, তাঁর মতে, প্রথম করণীয় হবে বাঙালির ভাবজগতের মর্মবাণীকে উপলব্ধি করা, তাঁকে কীভাবে এখানকার মুক্তির আন্দোলনে ব্যবহার করা যায় তার কৌশল উদ্ভাবন করা। এই উভয় কাজের সফলতার প্রশ্নে তিনি অতিমাত্রায় আশাবাদী। কারণ ভেদবিরোধিতার গভীর শেকড় তিনি ইতিমধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন স্থানীয় ভাব আন্দোলনে। বিশাল আদর্শিক ঐশ্বর্যে ভরপুর এ দেশের ভাবজগতের ইতিহাসটাই তাঁর মতে, একান্তভাবে 'জাতপাত বিরোধী, নারীপুরুষ ভেদ মানে না, জালিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ও অসাম্য ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী।' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৫)। অর্থাৎ বাংলাদেশের পরিবেশে কোনো প্রয়োজন নেই আদর্শগত দিক থেকে নতুন কিছু উদ্ভাবনের। স্থানীয় ভাবের অন্তর্নিহিত সাম্যবাদী দর্শনকে চিহ্নিত করা গেলেই হলো। এই সাম্যবাদী ভাব-ঐতিহ্য তিনি আরও লক্ষ করেছেন, ইতিমধ্যে 'বাংলাদেশকে রাজনৈতিক রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহণ করতে' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৫-২৬) সাহায্য করেছে। ফলে যারা তাঁর মতো একনিষ্ঠ লড়াকু, তাদের গুরুদায়িত্ব হলো 'এই লড়াই-সংগ্রাম ও মানবেতিহাসের মহৎ অর্জনগুলো ভাবগত পর্যালোচনায় আত্মস্থ করা' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৫-২৬)। কারণ 'এই রাষ্ট্র

টিকিয়ে রাখা বা টিকে থাকা কেবল এই ভাবচর্চার মাধ্যমেই সম্ভব' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৫-২৬)। অতি মহৎ একটি প্রয়াস বটে।

কিন্তু সমস্যা হলো জাতিগতভাবে, ফরহাদ মজহার লক্ষ করেছেন, বাঙালি তার নিজের ভাবজগৎকে সঠিক অর্থে উপলব্ধি করতে শেখেনি। প্রচণ্ড অবহেলা দেখিয়ে এই জাতি তার নিজের ভাবজগৎকে উপেক্ষা করে এসেছে। সেই ব্যর্থতা, তাঁর ধারণায় উদ্বেগকর এবং জাতির জন্য দুর্যোগপূর্ণ। কারণ 'বাংলার জাতপাত বিরোধী, শ্রেণী বিরোধী নারী-পুরুষ ভেদ বিরোধী লড়াই-সংগ্রামের সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ভাবগত ইতিহাস ধরতে না পারলে বাঙালির অধঃপতন অনিবার্য' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৫-২৬)। এই ব্যর্থতা এবং অবজ্ঞার পরিধি জরিপ করে তিনি দেখেছেন যে 'রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিশাবে নিজেদের পরিগঠনের নতুন কর্তব্য নির্ণয় ও সম্পন্ন করা অনেক কঠিন।...বাংলার ভাবান্দোলনের মোকাবিলার জায়গাগুলো পরিচ্ছন্ন করা গেলে একাত্তরে আমাদের ঐতিহাসিক অর্জনকে বিশ্বের সভায় নিয়ে যাওয়া মোটেও কঠিন কাজ হবে না।...বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা, ভাব ও ভাবুকতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নাই বললেই চলে। তাদের ভাষা, ভাব ও চিন্তার খবর আমরা নিতেই পারি নি' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৩১)। ভাব আন্দোলন সম্পর্কে ধারণার অপরিচ্ছন্নতার মাশুল দিতে হচ্ছে বাঙালি জাতিকে, সেটি মজহারীয় দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। কিন্তু তার চেয়েও আরও উদ্বেগকর হলো, বাঙালির জাতীয়তাবাদী আদর্শ বা ভাব, যে আদর্শ ও ভাব আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল। ওই জাতীয়তাবাদ তাঁর ক্ষেত্রে এমনই উৎকণ্ঠার কারণ যে আজ ধর্মনিরপেক্ষতার নামে বুদ্ধিবৃত্তিক আলস্য ঘৃণা ও প্রতিহিংসার রাজনীতি এবং সর্বোপরি সমাজে সুবিধাবাদী অবস্থান নেওয়া সম্পর্কে আমাদের সতর্ক হয়ে ওঠার সময় এসেছে। 'ধর্ম 'ব্যক্তিগত' ব্যাপার—ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করবার এই প্রয়াস আসলে ধর্মতাত্ত্বিক পরিমণ্ডলেই সম্ভব, কারণ এই প্রয়াস ধর্মতত্ত্বকে অতিক্রম করে না, তাকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত করে মাত্র' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ১৬)।

ফরহাদ মজহার আরও লক্ষ করেছেন যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ উচ্চবর্ণনির্ভর এবং অভিজাত শ্রেণীর হাতে বন্দী। সেটিই অবশ্য তাঁর একমাত্র কলঙ্ক নয়। সেই অভিজাত শ্রেণী আবার বাংলাদেশের নয়, বরং কলকাতাকেন্দ্রিক, কলকাতাকে অনুকরণ করে নিজের ভাবজগৎকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করার ধৃষ্টতা দেখায়। ফলে তাঁর মনোভাবনার জগতে বাসা বেঁধেছে ঔপনিবেশিক মানসিকতা। তিনি লিখেছেন, 'বাংলা জাতীয়তাবাদীরা দাবি করেছে উচ্চবর্ণ ও অভিজাত শ্রেণীর হাতে যে বাংলা ভাষা ও চিন্তা সেটিই নাকি বাঙালির চিন্তা। মূলধারা। এর বাইরে যদি কিছু থাকে তাহলে তা 'লোকায়ত', 'অনাধুনিক' ইত্যাদি।...তারা ঔপনিবেশিক

কলকাতাকেই তাদের মনোগঠনের তীর্থভূমি ধরে নিয়ে বাংলার বিশাল ভাবের ঐশ্বর্য অন্বেষণের কাজকে বাধাগ্রস্ত করেছে' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৩১)। সংগত কারণে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা তার নৈতিক অবস্থান নির্ণয়ে প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি লিখেছেন, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদই বাঙালির আত্মবিকাশের সবচেয়ে বড়ো বাধা। অথচ দরকার ছিল বাঙালির লড়াই-সংগ্রামের আন্তর্জাতিকতা এবং সার্বজনীনতাকে শনাক্ত ও উপলব্ধি করা। সাম্প্রদায়িক ও অভিজাত বাঙালিপনা বা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই পরাজিত করবার প্রয়োজন ছিল। এই কাজ সম্পন্ন হয় নি বলে ইসলাম ও মুসলমান জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ার যে রক্তাক্ত 'অনন্ত যুদ্ধ' শুরু করেছে আমাদের আশংতা এই ক্ষয়িষ্ণু ধারা ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের চিরাচরিত ঘৃণার কারণে সাম্রাজ্যবাদেরই পক্ষালম্বন করবে' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৩০)। এখানে আমরা উপলব্ধি করি ফরহাদ মজহারের ভাবান্দোলনের প্রকৃত চেহারা। বস্তুত বাঙালি জাতীয়তাবাদের সাম্প্রদায়িক ও অভিজাত শেকড়কে উপড়ে ফেলে তিনি নতুনভাবে যাত্রা শুরু করতে চান। সেই নতুন ধারা বলতে একটি ইসলামি ধর্মীয় আন্দোলনকে বোঝায়, কারণ সেখানে তাঁর বিশ্বাস এক ঢিলে দুই পাখি মারা সম্ভব হবে—একদিকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা, অন্যদিকে ভেদমুক্ত সমাজ গড়া, যেটি প্রতিষ্ঠা করতে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ব্যর্থ হয়েছে।

ইসলাম সম্পর্কে তাঁর যুক্তিটি তিনি অপরিচ্ছন্ন রাখেননি। ওই প্রসঙ্গে তিনি আমাদের জানাচ্ছেন, 'ইসলামের প্রতি এই দেশের মানুষ আকৃষ্ট হয়েছে দলিতদের মুক্তির কথা ইসলাম শুনিয়েছে বলেই, দোজখের ভয়ে বা বেহেশতের লোভে নয়। শূদ্র যদি বেদ শোনে তবে তার কানে গরম সীসা ঢেলে দেবার ইতিহাস অতিক্রম করে আসতে হয়েছে এই জনগোষ্ঠীকে। কোন কিছুতেই যার কোন অধিকার নাই—সমাজের সেই তলানি থেকে উঠে আসা মানুষদের রাজনীতিই ভাবান্দোলনের ইতিহাস, তার বিকাশ ঘটেছে লড়াই থেকেই। এই রাজনীতিটুকু না বুঝলে ভাবান্দোলনের 'ভক্তি' ব্যাপারটা আসলে কী, কিম্বা 'নদিয়ার ভাব' কেন বৈপ্লবিক আমরা তা ধরতে পারব না। ভক্তদের এই বইটি তার প্রাথমিক নজির মাত্র। জাতপাত, শ্রেণী ও নারীপুরুষ ভেদ বিরোধী লড়াইয়ের ধারাই বাংলার ভাবান্দোলনের মূল ধারা' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ১৫)। অর্থাৎ ভেদবিরোধিতা এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা উভয়ই জন্ম নিয়েছে ইসলামের গর্ভে। ইসলাম সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন, 'যে জন্ম, রক্ত, গোত্র, গোষ্ঠি, জাত, পাতসহ সকল প্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে নীচু জাতের মানুষের যে ডাক, 'ইসলাম' ডাকনামের মধ্যে তারই প্রতিধ্বনী ঘটেছিল বলে ইসলাম এই দেশে স্থায়ী আসন পেয়েছে। অতএব এই ডাকের ভাব ও রাজনীতি অস্বীকার করলে, ভুলে গেলে কিম্বা তার তাৎপর্য ধরতে না

পারলে রাজনৈতিক জনগোষ্ঠি হিশাবে আমাদের বেড়ে ওঠা বা পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ১৫)। আর সে কারণে 'জাতপাত বিরোধী লড়াইয়ের ভাব ও ইতিহাসের মধ্যে আমি আমার জনগোষ্ঠিকে আবিষ্কার করার তাগিদ বোধ করি। এখানেই ইসলামের জাতপাত বিরোধিতা আর নিম্নবর্ণের মানুষের লড়াই এক বিন্দুতে এসে নানান সময়ে মিশেছে। এই মুহূর্তগুলো শনাক্ত না করা গেলে বাংলাদেশে বিপ্লবী রাজনীতির পুনর্গঠন অসম্ভব। ধর্ম সূত্রে আমরা হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান কিম্বা স্রেফ নাস্তিক হতে পারি, কিন্তু ইসলামের এই ভাবগত ও রাজনৈতিক লড়ায়ের সঙ্গে নিম্ন বর্ণের মানুষের সংগ্রামের তাৎপর্য বিচার না করলে, আর যাই হোক নিজেদের 'প্রগতিশীল' দাবি করা যাবে না' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ১৫-১৬)।

ইসলাম সম্পর্কে তাঁর অবস্থানটি এতই গোলমেলে যে তিনি নিজেই এক বিভ্রান্তিতে ভুগছেন। যেমন তিনি লিখেছেন, 'ধর্মের যদি 'মানবিক' চরিত্র থাকেই তাহলে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারে আপত্তি থাকার যুক্তি কি?...ইতিহাসে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে নির্যাতিত শ্রেণী বা জাতি তার মুক্তির জন্য ধর্মের ঝাণ্ডা তুলে ধরেছে। ধর্ম ও ধর্মতত্ত্ব থেকে শোষকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বয়ান তৈরি করেছে। আমাদের ইতিহাসে—প্রজাস্বত্ব আন্দোলন, জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, মহাজনী শোষণের যাতাকল থেকে মুক্তির রাজনীতিতে ধর্মীয় আত্মপরিচয় আশ্রয়ের কারণেই তা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে গেল? পাকিস্তান আন্দোলন কি ধর্মীয় আন্দোলন?' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৭) 'ধর্মকে ইহলৌকিক পর্যালোচনা ও বিচার বিবেচনা থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা রাখবার আজগবি ও অবাস্তব চিন্তা। লক্ষ করার বিষয় ফিলিস্তিনীদের মুক্তিযুদ্ধকেও কতো অবলীলায় 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যায় আখ্যায়িত করা হচ্ছে। বাংলা ভাষায় বাঙালির ভাবচর্চার বিকাশ ঘটাতে হলে এই বাঙালিবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ছাড়া বাঙালির আর কোন পথ আছে বলে আমরা মনে করি না। এই লড়াইটা এখন প্রকাশ্য, কাজেই কাজেই ক্রমশ তীব্র হতে বাধ্য' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৮)। ভালো কথা। মানতে আপত্তি নেই, ইসলাম এককালে বাংলায় নির্যাতিত মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের মঙ্গল কামনা করেছে। তার অর্থ এই নয় যে ইসলাম কেবল শোষিতের পক্ষাবলম্বন করে, শোষককে পরিত্যাগ করে। তার অর্থ এই নয় যে ওই বিপ্লবী ইসলাম রাজনৈতিক ইসলামে রূপান্তরিত হয়ে পরবর্তী সময়ে আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সহায়ক আদর্শে পরিণত হয়নি, নিজেকে জাতিগত নিপীড়নের সহায়ক শক্তিতে পরিণত করেনি। ইসলাম ও রাজনৈতিক ইসলামের অভ্যন্তরে এই ভেদরেখাটি নির্ণয় না করে, তাকে উপেক্ষা করে বা সুচিন্তিতভাবে এড়িয়ে গিয়ে ফরহাদ মজহার তত্ত্বগতভাবে এক বিশাল ভ্রান্তির জগতে অনুপ্রবেশ করেছেন।

ইসলামের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার আগে দেখা যাক সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার

প্রসঙ্গটি। বিষয়টি কালিক কোনো আকস্মিক ইস্যু নয়। সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা আমাদের দেশের মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চালিত। সে কারণে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ইদানীংকালের 'সাম্রাজ্যবাদপ্রীতি'কে পছন্দ না করা মজহারের পক্ষে যুক্তিসংগত। সাম্প্রদায়িক ও অভিজাত বাঙালিপনা বা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে তিনি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই পরাজিত করতে চান। কারণ সেই পরাজয়ের মানেই হলো জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ারকে পরাজিত করা এবং তাদের পরিচালিত 'রক্তাক্ত অনন্ত যুদ্ধে' ইসলাম ধর্মকে উদ্ধার করা। অর্থাৎ মজহারীয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার মূলে রয়েছে আমেরিকা বা ব্রিটিশ নেতাদের ইসলামবিরোধিতার বিষয়টি। সমস্যা হলো, যে ইসলামকে তিনি সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ থেকে বাঁচাতে চান এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে তলোয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চান, সেই রাজনৈতিক ইসলাম গোটা তিন দশক ধরে (বিশেষ করে ১৯৭৯ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত) সাম্রাজ্যবাদের অতি কাছের মানুষ ছিল। এই ইসলাম বিলিয়ন বিলিয়ন সাম্রাজ্যবাদী ডলার সাহায্য ভোগ করেছে[১০]। আফগান যুদ্ধে মার্কিন প্রশিক্ষকদের হাতে শিক্ষা নিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গা মাখামাখি করে দীর্ঘকাল তাদের রাজনৈতিক কৌশল বাস্তবায়নে দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। শুনেছি আফগান যুদ্ধে মুজাহিদিনদের আরও বেশি করে রুশবিরোধী নীতিতে আকৃষ্ট করতে মার্কিনদের পরামর্শেই আফগান ও পাকিস্তানের মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিতে জিহাদ শব্দ ও তার প্রত্যয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সে সময় মজহারের মতো 'ইসলামি' বুদ্ধিচর্চায় নিযুক্ত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী মার্কিন হস্তক্ষেপের কোনো বিরোধিতা করেনি। ইসলাম ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিপদ সম্পর্কে, ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা না করার উপদেশ দিয়ে তিনি এক বিশেষ প্রেসক্রিপশন দিচ্ছেন ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত ওই বিপদকে উপেক্ষা করে। রাজনৈতিক ইসলামের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সখ্যতা কারও অজানা নয় বটে কিন্তু তার পরও তাঁর সেই অবয়বটি তিনি কেন সযত্নে লুকিয়ে রাখতে চান অথবা কেন ইসলামকে পুনরায় রাজনীতিতে ব্যবহার করতে উৎসুক, সেটি বোধগম্য নয়। বস্তুত এখানেই ধরা পড়ে মজহারের সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার প্রকৃত রূপ।

রাজনৈতিক ইসলাম বা তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে নিতান্তই বিমূর্ত ইতিহাসহীন আদর্শ হিসেবে দেখা গুরুতর অপরাধ। এই দেখার ধরনে অবশ্য অনেক সুবিধা রয়েছে। কারণ সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে রাজনৈতিক ইসলামের ভূমিকাকে এড়িয়ে গণহত্যার দোষ পাকিস্তানি শাসকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ধৃষ্টতা দেখানো যায়, এমন ভাব দেখিয়ে যেন সে সময়কার পাকিস্তানি শাসকদের সঙ্গে রাজনৈতিক ইসলামের কস্মিনকালে কোনো সম্পর্ক ছিল না, যেন রাজনৈতিক ইসলাম রাষ্ট্রপরিচালনার বলয় থেকে দূরে

ছিল, যেন সেই বিশেষ ইসলাম স্থান-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে এক স্বর্গীয় নিরপেক্ষতা বজায় রেখে এসেছে, যেন সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনৈতিক ইসলাম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ঐতিহাসিক মুহূর্তে একে অপরের পিঠ চাপড়ায়নি, বাঙালির রক্তে হাত রাঙায়নি। মজহার লিখেছেন, 'পাকিস্তানী শাসকদের নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে পাকিস্তানী শাসকদের মতাদর্শ আর ইসলাম যে আলাদা, সেই ভেদ জ্ঞান এই জাতীয়তাবাদ নির্ণয় করতে চায় না। জানেও না। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সে ক্রমাগত হাজির করে খেয়ে না খেয়ে একটা ইসলাম বিরোধী সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ হিশাবে' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৫)।

বিমূর্ত ভাবকে কখনো সমাজস্বাধীন বা সমাজনিরপেক্ষ ভাবা কঠিন। বাঘা বাঘা যেসব ভাববাদীর সঙ্গে আমরা পরিচিত (হেগেল বা প্লেটো), তাঁরা ভাবকে কেবল অতীন্দ্রিয়তার কোঠরে আবদ্ধ রাখেননি, সামাজিক উপযোগিতার কথাও ভেবেছেন। পদ্ধতিগত দিক থেকে সেখানে মজহারের গলদটা চিত্তাকর্ষক। রাজনৈতিক ইসলামকে সমাজ বাস্তবতার বাইরে রেখেও নিজের ভাব-পরিকল্পনার সামাজিক কর্তব্য বা ইসলামে ভেদমুক্তির আন্দোলনী ধারার প্রতি মৌখিক সম্মতিতে কার্পণ্য করেন না। ধর্মকেন্দ্রিক মজহারীয় ভাবজগৎ যে কতটুকু বিভ্রান্তিকর সেটি আমরা লক্ষ করি তাঁর বেশ কিছু মন্তব্যে। 'মোকাবেলা' নামক প্রবন্ধ সংকলনে তিনি লিখেছেন, 'পুঁজি তার আগের সব নীতিনৈতিকতা, ধর্মতত্ত্ব, বিশ্বাস, আচার আচরণ, সংস্কার—অর্থাৎ যা কিছুই তার পুঞ্জিভবন, আত্মস্ফীতি ও বিস্তারের পথে বাধা মনে করে, সবকিছুকে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে চলে, ধ্বংস করে। পুঁজির বিস্তারের সামনে সব পুরানা ধর্ম, ধর্মতত্ত্ব, নীতিনৈতিকতার বিনাশ অনিবার্য। কিন্তু পুরানা ধর্মের জায়গায় পুঁজি কায়েম করে পুঁজির ধর্ম। সেটা কেমন? সেটা হচ্ছে মানুষের সকল ধর্ম ও নীতিনৈতিকতাকে পুঁজি সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে নির্বাসন দেয়, ধর্মের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা পুঁজি অস্বীকার করে। পুঁজির দাবী ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। পুঁজি ধর্মকে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে নির্বাসন না দিয়ে টিকে থাকতে পারে না। বুর্জোয়া শ্রেণীর ধর্মনিরপেক্ষতার ধর্মীয় রহস্য আসলে এখানেই' (ফরহাদ মজহার, ২০০৬, পৃষ্ঠা ১৯-২০)।

ধর্ম ও পুঁজির এই বিশ্লেষণ পদ্ধতিগতভাবে বাৎসল্যজনিত রোগে আক্রান্ত। পুঁজি ধর্মকে আক্রমণ করে না। ধর্মকে ধ্বংস করতে চায় না। ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আধ্যাত্মিকতা বা লিপিবদ্ধ নৈতিক কাঠামো পুঁজির আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু নয়। পুঁজির স্বর্গরাজ্য মার্কিন মুলুকে পুঁজি ধর্মকে আক্রমণ করেনি। সেখানে পুঁজি ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে উৎসাহিত করে, কারণ তার ফলে পুঁজির বিস্তার সম্ভব হয় বলে, ব্যক্তিকে ভোক্তা হিসেবে তৈরি করে। ব্যক্তির ধর্ম ও বিশ্বাস সেখানে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু নয়। ধর্মকে পুঁজি তার প্রয়োজনেই ব্যবহার করে। ইসলামি পুঁজি (সৌদি আরব, বাংলাদেশ বা

অন্যান্য দেশে) ধর্মকে আক্রমণ করেছে কি না বা মার্কিন পুঁজি সৌদি মুলুকে বা বাংলাদেশি 'ইসলামি' পুঁজি ধর্মকে বর্জন করেছে বলে কিছু শোনা যায়নি। বরং তাকে পুরোদস্তর ব্যবহার করেছে বলেই জানি। ১৯৭৯ থেকে ১৯৯০ সালে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আমেরিকার নির্দেশে রাজনৈতিক ইসলাম যে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছিল, সে জিহাদ ধর্মকে ধ্বংস করার জন্য নয়। মার্কিন পুঁজি সোভিয়েত একনায়কতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, কারণ মার্কিন বা পশ্চিমা পুঁজির অনুপ্রবেশ বিস্তীর্ণ পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক বলয়ে বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল বলে। পুঁজি ধর্মের বিরোধিতা যে করে না তা নয়। কিন্তু সে বিরোধিতা ধর্মের নিয়মকানুনের বিরোধিতা নয়, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন, বাইবেল, বেদ, ত্রিপিটক, টোরাকে বাতিল করার সংগ্রামে নয়, তার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ধর্মের সামাজিক অবস্থান। সেই ভূমিকা সামাজিক সম্পর্ক থেকে সৃষ্ট। তাকে সে আক্রমণ করে, পারলে ধ্বংস করে, যদি তা পুঁজির সম্প্রসারণে বাধা হয়ে দেখা দেয়। ইউরোপে পুঁজি তার প্রাথমিক বিকাশে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছিল। কারণ তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্য, পুঁজির ধারক উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণীকে রাজনৈতিক অধিকারহীন করে রেখেছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে টিকিয়ে রাখার আদর্শিক অস্ত্র হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করে, পোপ ও রাজতন্ত্রের সঙ্গে আঁতাত করে, নিপীড়ন ও শোষণের মাধ্যম হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করে। নিজ বিকাশের প্রয়োজনে পুঁজির ধর্মমিশ্রিত সামাজিক সম্পর্ককে আক্রমণ করা আর ধর্মকে আক্রমণ করা ভিন্ন জিনিস। পুঁজি এক থলে টাকা বা ডলার নয়। মার্ক্স পুঁজিকে সে অর্থে ভাবেননি, দেখেননি। তিনি পুঁজিকে দেখেছেন একটি সামাজিক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক হিসেবে, সমাজের শ্রেণী কাঠামোর নির্মাতা হিসেবে। এই সম্পর্কের বাইরে পুঁজি পুঁজিই থাকে না, থাকে নিতান্তই অলস হয়ে পড়ে থাকা কিছু মিনটেড মেটাল হিসেবে। সেই সামাজিক সম্পর্কের দিকটি আত্মস্থ না করে পুঁজিকে যেমন বোঝা যায় না, তেমনি বোঝা যায় না পুঁজি ও ধর্মের আন্তসম্পর্ককে। সেখানে পুঁজি ধর্মকে ধ্বংস করতে আগ্রহী নয়, সে চায় ধর্মের সামাজিক সম্পর্ককে আক্রমণ করতে, সেই সম্পর্ক পুঁজির বিকাশের পথে বাধা তৈরি করে বলে। এই দিকটি না বোঝার কারণে মজহারের উক্তি করা সম্ভব হয় যে, 'আল্লাখোদার জায়গায় পুঁজি নিজেকে স্থাপন না করে নিজের পুঞ্জীভবন, স্ফীতি ও বিস্তার নিশ্চিত করতে পারে না। আল্লাকে তার আরশ থেকে না সরিয়ে পুঁজি সেই আরশে বসে কি করে? তাহলে একালের আস্তিকতা-নাস্তিকতা লড়াইয়ের বৈষয়িক ভিত্তি পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই' (মজহার, ২০০৬, পৃষ্ঠা ২১-২২)।

ধর্মের সামাজিক সম্পর্ক বলতে ধর্মকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান যেমন : মসজিদ, মন্দির, চার্চ, গির্জা, সিনেগগ, বৌদ্ধ মন্দির ইত্যাদিকে বোঝায়। এসব প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে মওলানা, পুরোহিত, বিশপ-রেভারেন্ডদের সঙ্গে ধর্ম পালনকারী মানুষের সম্পর্ক

গড়ে ওঠে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জনকল্যাণমূলক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ধর্মগ্রন্থ শিক্ষাকেন্দ্রভিত্তিক যে সামাজিক সম্পর্কের নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে, পুঁজি তাকে ধ্বংস করে না। কিন্তু সে সামাজিক সম্পর্কের এই নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তখনই, যখন এই নেটওয়ার্ক পুঁজির সম্প্রসারণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অন্যথায় পুঁজির সঙ্গে ধর্মের কোনো বিরোধ নেই। মধ্যযুগে বিরোধ হয়েছিল। সে সময় ধর্মের সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে পুঁজির বিকাশ সম্ভব ছিল না। মানবতাবাদী দর্শন দিয়ে সমাজভাবনার এবং সমাজকাঠামোর নতুন ধারা সৃষ্টি করা ওই সংগ্রামের আদর্শিক হাতিয়ার ছিল। তবে প্রয়োজনে পুঁজি তার নিজের সৃষ্ট ওই মানবতাবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও কুণ্ঠিত হয়নি। নিজেকে সে মানবতার শত্রুতে পরিণত করে, যদি তা তার বিস্তারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। লাতিন আমেরিকায় মানবতাবিরোধী মার্কিন ভূমিকায় সামরিক ক্যু, ক্ষমতায় ফ্যাসিবাদী জেনারেলদের বসানো এবং গণহত্যায় মদদ দেওয়া—সবই ছিল পুঁজির পথকে বাধামুক্ত রাখতে। এই আপেক্ষিক দিকটি না বোঝার কারণে মজহারের পক্ষে পুঁজিকে আক্রমণ করা সহজ হয়, সস্তা জনপ্রিয়তা লাভে আগের বিপ্লবী এবং জিহাদি জোশের স্ফুলিঙ্গ উদ্গারিত করে পুঁজি বা ধর্মের সম্পর্ককে তুলে ধরেন পুঁজির অন্তর্নিহিত ওই সম্পর্কের দিককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। সে কারণে তাঁর পক্ষে দাবি করা সহজ হয়, 'একবার যদি মানুষ তার মেধা, কল্পনা ও সংকল্পের শক্তি সম্পর্কে আন্দাজ করতে পারে তাহলে পুঁজির একদিন কি মানুষের একদিন। এই আর্তনাদ ও হাহাকার বাদ দিয়ে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার দাফন কাফন সম্পন্ন করে নিজের ধর্ম ঠিকই নিজে মানুষ কায়েম করবে' (মজহার, ২০০৬, পৃষ্ঠা ২৪)। অথবা 'একালে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড মাত্রই ধর্ম আর ধর্ম মাত্রই বৈপ্লবিকতা। পুঁজির ধর্মের বিপরীতে মানুষের ধর্ম বিপ্লবী রূপ নিয়ে আবার হাজির। হতে বাধ্য। সেই ধর্ম কায়েমের শর্ত একমাত্র পুঁজির বিনাশ ছাড়া অসম্ভব...এতএব এই কালের বিপ্লবের প্রশ্ন একান্তই ধর্মের প্রশ্ন ছাড়া আর কি?...ধর্মের কবর দেওয়া আর মানুষের কবর দাফন সম্পন্ন করা একই কথা' (মজহার, ২০০৬, পৃষ্ঠা ২৪-২৫)। মজহারের এই স্তুতি বুদ্ধিবৃত্তিক আবর্জনা, ইংরেজিতে যাকে trash বলে।

পুঁজির সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে এই অজ্ঞতার কারণে ইসলামের সমতা বাণী নিয়েও তাঁর বাগাড়ম্বর নিতান্তই শব্দধ্বনি হয়ে থাকে। ইসলামে সমতার কথা আছে সত্য, কিন্তু সেই সমতা আদি পর্যায়ে লক্ষ করা গেলেও পরবর্তী সময়ে অসমতায় পরিণত হয় সামাজিক বাস্তবতা, রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রভাবের কারণে। এই একই ভাগ্য আমরা খ্রিষ্টান বা বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রেও দেখি। হেফাজতে ইসলামের মাওলানা শফী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হলে দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা (নারী) প্রথম ধাক্কাতেই সামাজিক অসমতার বাধনে বাঁধা পড়বেন। সংখ্যালঘুরাও যাপন

করবেন বঞ্চিত এবং সম-অধিকারহীন জীবন। কারণ নিজের ধর্মকে তিনি সবার ওপরে দেখবেন, তাকে শ্রেষ্ঠ ভাববেন, অন্যান্য ধর্মের মানুষকে নিকৃষ্ট ভাববেন এবং তার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়ন করবেন। ইসলাম ধর্মে বর্ণবাদ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবজাত। বর্ণভেদ প্রথা এককালে বাঙালি মুসলিম সমাজে একটি পাঁচমিশালি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে সৈয়দ (হজরত মোহাম্মদের কন্যা ফাতিমার বংশধর) এবং আলিম (যারা পণ্ডিত ব্যক্তি), শেখ বা পীরের ভেদাভেদ যেমন ছিল, তেমনি ছিল শিয়া-সুন্নি বিভেদ, আশরাফ-আতরাফের মধ্যে রেষারেষি। ক্রীতদাস বা স্বাধীন, গলা, জলা, পিথারি, কাবারি, তিরকার, কাগজি, কসাই ইত্যাদি পেশা ওই একই বিভেদের অন্য দিক। (পঞ্চানন সাহা, ১৯৯৭ থেকে নেওয়া) এসব ভেদাভেদ বিভিন্ন পণ্ডিতের লেখায়ও স্বীকৃতি পেয়েছে। অমলেন্দু দে দেখিয়েছেন, এমনকি আজলাফ শ্রেণীর (অর্থাৎ নিম্নবর্ণের মুসলমান) মধ্যে চারটি ভাগ সৃষ্টি করা হয়েছিল। সেগুলো ছিল এরূপ: ১. কৃষিকর্মে নিযুক্ত শেখ মুসলমান, আজলাফ সম্প্রদায়ে এদের স্থানই ছিল উঁচুতে। ২. দরজি জোলা ফকির ও রঙ্গ বেজ ৩. ভাতিয়ারা, ছিক, চুড়িদার, দাই, ধাওয়া, দুনিয়া, গদ্দি, কালাল, কসাই ৪. আব্দাল, বাখো, বেদিয়া, ভটি, দাফালি, ধোবি, হাজাম, মুচি ইত্যাদি। এসব নিম্নবর্ণের মুসলমানের এমনকি মসজিদে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ছিল (দেখুন পঞ্চানন সাহা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ২৯)। আজও সেই বিভেদের দরজা যে বন্ধ হয়েছে, দাবি করা কঠিন।

যাই হোক, ফিরে আসা যাক বাঙালি জাতীয়তাবাদের আলোচনায়। সেখানে মজহার বেশ কয়েকটি দোষ লক্ষ করেছেন, যেগুলোর কারণে ওই আদর্শের সঙ্গে বাঙালি জাতির সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়া উচিত বলে জোর দাবি করেছেন। ইতিহাসের ধারায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের দেহে আধুনিক এবং সে অর্থে নেতিবাচক অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। তাঁর দাবি, সেই পরিবর্তন বাঙালির আবহমান সংস্কৃতিতে ছেদ এনেছে। তিনি লিখেছেন, 'যারা এতোকাল পাঞ্জাবি পায়জামা লালপেড়ে শাড়ি ও কপালে টিপ দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে আমাদের 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তারা নিজেরাও এই পরিস্থিতির জন্য তৈরি ছিলেন না। তারা 'আবহমান বাঙালি'র সাধনা করছিলেন এই ভেবে যে 'বাঙালি' নামক স্থিরবস্তু কিছু একটা আবহমানকাল যেমন ছিল বা হয়ে আসছে তেমনি বুঝি চিরকালটিই থাকবে। যে শাশ্বত বাঙালি সংস্কৃতির তাঁরা পূজা করে আসছিলেন, সেই বাঙালিও পুঁজিতান্ত্রিক গোলোকায়নের তোড়ে কীবোর্ড, গিটার, ড্রাম নিয়ে মঞ্চ ফাটিয়ে মিস্টিরিয়াস আবহমানতায় ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছে' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৮)। মন্তব্যটির প্রতি সীমিত গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন এই কারণে যে একটু পরই আমরা দেখব, তিনি তাঁর এই অবস্থানকে নিজেই অস্বীকার করেছেন। জাতীয়তাবাদের আরও কিছু দুর্বলতা তাঁর চোখে পড়েছে, যার মধ্যে

তাঁর অনৈতিহাসিক চরিত্র, ইসলামবিরোধিতা এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব অন্যতম। এই তিনটি অভিযোগ উদ্ধৃত করে তিনি লিখেছেন, 'ধর্মের দিক থেকে হিন্দু ধর্ম বাঙালির স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হলেও ইসলামকে বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা সবসময়ই দুশমন হিশাবেই গণ্য করেছে। তাদের কাছে বাঙালি সংস্কৃতিকে ইসলামমুক্ত করবার সাধনাই হচ্ছে 'বাঙালি' হবার সাধনা।...'বাঙালি জাতীয়তাবাদী' শুধু সাম্প্রদায়িক নয়, বরং ঘোরতর ভাবে অনৈতিহাসিক। ইতিহাসের বিপরীতে তার অবস্থান' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৪)।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ অনৈতিহাসিক কেন, তার কারণ হলো, 'যারা এই জাতীয়তাবাদের ধারক তারা দেখাতে চায় যে 'যেন 'বাঙালি'র কোন ধর্মীয় অতীত নাই, সনাতনী হিন্দু, ইসলাম অথবা জেন বা বৌদ্ধ—কারো সঙ্গেই যেন ধর্ম হিশাবে কোন সম্পর্ক নাই, যেন ধর্মীয় উপাদান রুপ-রসে পুষ্ট হয়ে এর শরীর পরিগঠিত হয় নি। 'বাঙালি' ব্যাপারটা যেন হাওয়াই জিনিস। যে কারণে বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের 'বাঙালি' ব্যাপারটার রাজনৈতিক ইতিহাস '৫২ সাল থেকে শুরু, যার কোন 'আগে' নাই 'পরে'ও নাই।...এই অনৈতিহাসিকতার কারণে বা ইতিহাসের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে বলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের কোন সাংস্কৃতিক ভিত্তি নাই। প্রতিষ্ঠার তাগিদ বোধও নাই। নিজের দাবি অনুযায়ী তাই 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা ভুঁইফোড় ব্যাপার' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৪)। বাঙালির অতীত জীবন ধর্মীয় প্রভাবসমৃদ্ধ, সেটি ঐতিহাসিক সত্য। সে সত্য তুলে ধরতে আপত্তি নেই। কিন্তু সে প্রভাবকে একতরফা ইসলাম ধর্মের প্রভাব হিসেবে দেখা বা ইসলামের সঙ্গে তার অতীত সম্পর্কের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে উপস্থাপন করা ঘোরতর ইতিহাসবিরোধী। সনাতনী হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, সুফি ধারার মিশ্র উপাদানের প্রভাবে বাঙালি সংস্কৃতি নির্মিত (যদিও মজহার সেটি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সে প্রভাবকে এড়িয়ে ইসলামের প্রভাবকে বিশেষভাবে সামনে এনেছেন), আর সে কারণে তাঁকে এক বিশেষ মিশ্র সংস্কৃতি হিসেবে দেখাতে হবে। বাঙালি জাতিকে যদি ইতিহাসের আলোকে মূল্যায়ন করতেই হয়, তাহলে তাকে তার ইসলাম-পূর্ব অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন করার কী কারণ, বোধগম্য নয়। অবশ্য তার অর্থ দাঁড়ায়, তাকে হিন্দু বা বৌদ্ধ বা লৌকিক ধর্মের উপাদান ও প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করা। হিন্দু সনাতনী অথবা ব্রাহ্মণ্যবাদী আদর্শের বিশ্বাসকাঠামো থেকে পূর্ববঙ্গের বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন করার অর্থ, বাঙালি জাতিকে বিশুদ্ধ ইসলামি মৌলবাদী আদলে গড়ে তোলা। ইতিহাসের প্রতি নিরপেক্ষ হলে বাঙালি জাতির পরবর্তী ঐতিহাসিক বিবর্তনকে কটাক্ষ করাও যৌক্তিক নয়। তিনি যেমন লিখেছেন, 'বাঙালি উর্দুর বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু হিন্দিকে তার ড্রইংরুমে টেনে নিতে আপত্তি করলো না। বাঙালিয়ানার অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে উঠল ঢাকার বহুজাতিক

কোম্পানিগুলোরই ভাড়া খাটা কয়েকটি এডভারটাইজিং কোম্পানি, আর সেই কোম্পানিগুলোর জন্যই বিজ্ঞাপন ও পণ্যের প্রসারের তাগিদ।...তারা ইতিহাসের মঞ্চে অভিনয় করবার চেয়েও অভিনয় করতে চেয়েছিল মহিলা সমিতি বা গার্লস গাইড মিলনায়তনে। এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। এখানে পুঁজির বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধের সংস্কৃতি আমরা দেখি নি' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৯)।

বিশ্বায়নের কারণে বাঙালিত্ব প্রভাবিত হচ্ছে। সেই প্রভাবগুলোর চিহ্ন মজহার সাহেব লক্ষ করলেও সেখানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি রীতিমতো একপেশে। তিনি সেসব প্রভাবের প্রতি বিরূপ যেগুলো প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের অথবা পশ্চিমা বিশ্বের। কিন্তু সেটিই তার দেহে একমাত্র পরিবর্তন নয়। বিজাতীয় মধ্যপ্রাচ্যের লোকপ্রিয় সংস্কৃতির প্রভাবকে কেন ভুলে যেতে হবে? সে প্রভাব তো আর রাখা ঢাকা কিছু নয়। আজ বাঙালির পোশাক-পরিচ্ছদে সেই প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছে। তার প্রভাব পড়ছে ভাষাতে। আরবি উপাদানের লক্ষণীয় প্রাধান্যে ঘোমটার বদলে হিজাব বা নানা সংস্করণের বোরকার ব্যবহার আজ বাঙালির একাংশের সংস্কৃতির গণ্ডিকে চিহ্নিত করছে। সে সম্পর্কে মজহারীয় নির্বাকতা যথাযথ কী, যদি বাঙালিত্বের জাতিগত বিশুদ্ধতা নিয়ে কেউ উদ্বিগ্ন হন? ইউরোপীয় বা ভারতীয় পুঁজির পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যীয় 'ইসলামি পুঁজি'র আগমন কি এখানে থেমে আছে? যে জাতি উর্দু ভাষার বিরোধিতা করেছিল, সেই জাতি আজ হিন্দি ছবির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার নয় কেন, সেটি হয়তো মজহার সাহেবকে হতবাক করে। কিন্তু সংস্কৃতির বাজারে হিন্দি সিনেমার আধিপত্য বাঙালি সংস্কৃতির বিবর্তনের কারণেই। হিন্দি সিনেমাপ্রীতি এমন কোনো আজব ঘটনা নয়, যেটি কেবল আমাদের দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। হিন্দি ছবির একচেটিয়া আধিপত্য উর্দু ভাষার আদি জন্মভূমি পাকিস্তানও ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। মধ্যপ্রাচ্য বা মধ্য এশিয়ার কথা না হয় উহ্য থাকল। আর উর্দু ভাষার বিরোধিতা করা এক কথা, বাঙালি জীবনে হিন্দি সিনেমার প্রভাব ভিন্ন জিনিস। একটি হলো, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা থেকে বাঙালিদের বঞ্চিত করা, অন্যটি হলো বিশ্বায়নের কারণে বিভিন্ন ভাষার আন্তপ্রভাবের বাস্তবতা। মজহার সাহেবের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অনুভূতি যদি এতই সূক্ষ্ম হয়ে থাকে তাহলে তাঁর পক্ষে ইংরেজির প্রভাবকেও বরদাশত করা উচিত নয়, নয় পশ্চিমা প্রভাবকে। সেই অর্থে তিনি নিজে ইংরেজিতে প্রবন্ধ লেখা বন্ধ করে বা এনজিও চক্র থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে বা ইংরেজি গান শোনা বন্ধ করে বা ইন্টারনেট ব্যবহারে ক্ষান্ত দিয়ে তাঁর প্রকৃত বিজাতীয় বিরোধী অবস্থানকে আরও একটু ঝালাই করে নিতে উৎসাহিত হতে পারেন বৈকি।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ফরহাদ মজহারের দ্বিতীয় ভ্রান্তি হলো, তিনি বাঙালি জাতি এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদকে এক করে দেখতে অভ্যস্ত। সেটি এক

মারাত্মক বিভ্রান্তি। বাঙালি জাতি একটি নরগোষ্ঠীর স্থায়ী রূপ। বাঙালি জাতীয়তাবাদ একটি বিশেষ অনুভূতি মাত্র। সে অনুভূতির ইতিহাস সুদীর্ঘ হলেও সেটি ওই ইতিহাসের এক বিশেষ মুহূর্ত মাত্র, বাঙালিত্বকে পুরোপুরি বোঝার ক্ষেত্রে তাকে একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা অযৌক্তিক। বাঙালি জাতীয়তাবাদকে দেখতে হবে একটি রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে। সেই আদর্শকে সমালোচনা করতে আপত্তি নেই। সে সমালোচনা যদিও এই কারণে নয় যে ওই জাতীয়তাবাদ ইসলাম ধর্মকে তার আদর্শ হিসেবে দেখেনি। যাঁরা বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমর্থক ছিলেন, তাঁরা তাঁদের মুসলমান ধর্মবিশ্বাসকে বাতিল করে জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করেননি। ১৯৪৭ সালে এই একই বাঙালি জাতি মুসলিম জাতীয়তাবাদের অধীনে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। সে সময় মুসলিম জাতীয়তাবাদী আদর্শে সিক্ত যারা, তারা তাদের বাঙালিত্বকে হারায়নি। মুসলিম জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণ ছিল মুসলিম পরিচয়কে প্রাধান্য দেওয়া, জাতিপরিচয়ের চেয়ে মুসলিম পরিচয়ের প্রাধান্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা। সেই ভাবনার জন্ম হয়েছিল উপমহাদেশীয় রাজনীতি, ব্রিটিশবিরোধিতার বিশেষ সময়কালীন বাস্তবতার কারণে। থাকতে পারে আরও হাজার সহস্র কারণ। কিন্তু মুসলিম জাতীয়তাবাদী হয়ে বাঙালি যেমন তার বাঙালি পরিচয়কে হারায়নি, তেমনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সে তার মুসলিম পরিচয়কে হারায়নি। ১৯৫২ সাল থেকে ঘটেছে উল্টো। সে সময় থেকে মুসলিম পরিচয়ের দোহাই দিয়ে তাকে শোষণের জাঁতাকলে আবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে প্রতিবাদের প্রশ্ন এসেছে। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ সেই প্রতিবাদে অংশ নেয়নি। কারণ সে নিজেই ছিল বাঙালি জাতির নিপীড়ক। সেখানে তার জাতিপরিচয় তার সাহায্যে এসেছে। সে কারণে সে ভেবেছে, জাতি হিসেবে সে সমষ্টিবদ্ধভাবে শোষিত এবং সেই শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে তাকে ওই শোষক জাতি থেকে তার ভিন্নতাকে প্রমাণ করতে হবে। সেই তাড়না থেকে সে তার পার্থক্য চিহ্নিত করেছে, ভাষাকে ব্যবহার করেছে, তার সংস্কৃতি যে পাঞ্জাবি, বেলুচি, পাঠান বা সিন্ধ থেকে ভিন্ন, সেটি সে প্রমাণ করেছে। তার অর্থ এই নয় যে সে তার মুসলিম পরিচয়কে হারিয়েছে। বাঙালি পরিচয় দিয়ে মুসলিম শোষণকে প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে, বাঙালি জাতীয়তাবাদ পরিণত হয়েছে রাজনৈতিক মুক্তির হাতিয়ারে। রাজনৈতিক ইসলাম সেদিন তার পাশে দাঁড়ায়নি।

তবে মজহারের পক্ষে এই দিকটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে সামাজিক শ্রেণীর প্রসঙ্গ টেনে। তিনি লিখেছেন, 'গণমানুষের রাজনীতি যাঁরা করেছেন—উচ্চবর্ণ, আশরাফ বা অভিজাত শ্রেণী এবং জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে যাঁরা লড়ে আসছিলেন একাত্তরে তাঁদের রাজনীতির জয় হয় নি। জয় হয়েছে মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর সেই অংশের যাদের কাছে বাঙালি মানে সেই পুরানা ঔপনিবেশিক বাংলায় গড়ে ওঠা শ্রেণীরই আত্মপরিচয়। যে পরিচয়ের মধ্যে শ্রমিক, কৃষক, খেটে খাওয়া মানুষ অনুপস্থিত, যে পরিচয় ইসলামকে তার শত্রু হিশাবেই জ্ঞান করতে শিখেছে—তার সঙ্গে ভাবগত বা সাংস্কৃতিক মোকাবিলার প্রয়োজন বোধ করে নি। ধর্মের সঙ্গে ভাষা, ভাব ও সংস্কৃতির জটিল সম্পর্ককে যে পরিচয় ক্রমাগত অস্বীকার করেছে। বাঙালি হবার ধারণাকে হাজির করেছে ইসলামের বিপরীতে আত্মপরিচয় নির্মাণ হিশাবে। বাংলাদেশে এবং পশ্চিম বাংলায় বিপ্লবী রাজনীতির ধারা মার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গণমানুষের ভাষা, ভাব ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিক বিকাশের প্রতিশ্রুতিও মার খেয়ে গেল' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৪১-৪২)। সব মিলিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে বর্জনের প্রশ্নটি তাঁর কাছে এতই তাৎপর্যপূর্ণ যে তিনি ওই বর্জনের স্ট্র্যাটেজি হিসেবে বাঙালিত্বকে ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে সমীকরণ করে দেখার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ 'মুসলমান' বলে ইসলাম আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, এই তর্ক সঠিক নয়। বরং খুবই ভুল ও বিপজ্জনক তর্ক। বরং বাঙালির লড়াই-সংগ্রাম ও ভাবুকতার সুনির্দিষ্ট ইতিহাসের মধ্য দিয়েই ইসলাম বাঙালির অবিচ্ছেদ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। ইসলাম প্রশ্ন বাদ দিয়ে বাঙালির কোন ইতিহাস নাই। থাকতে পারে না। অর্থাৎ আমরা বাঙালি বলেই ইসলামের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আত্মিক—ধর্ম সূত্রে বা জন্মসূত্রে 'মুসলমান' বলে নয়' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৬)। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের লড়াকু চরিত্রের জন্যই বাঙালি জাতি মুসলমান; ধর্মীয় বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। সে ক্ষেত্রে কোরআন এবং সুন্নার নীতিমালা নয়, বরং মুসলমান হওয়ার মানদণ্ড তাঁর ধারণায় হচ্ছে সংগ্রামী মনোভাব। এক আল্লাহ এবং রাসুলের প্রতি আত্মসমর্পণের কারণে নয়। অতিমাত্রায় দুর্ধর্ষ এবং ধর্মবিরোধী এই যুক্তি ইসলামের শত্রু হওয়ার জন্য যথেষ্ট হলেও রাজনৈতিক ইসলামিরা এখনো তাকে বাতিল ঘোষণা করেনি কেন, কেন বরং সসম্মানে তাকে আগলে রেখেছে, সেটি এক ধাঁধার ব্যাপার।

আধুনিকতা ও মজহারীয় দৃষ্টিভঙ্গি

ফরহাদ মজহারের আক্রমণের একটি বিশেষ ক্ষেত্র হলো আধুনিকতা। তিনি মনে করেন আধুনিকতা মানুষকে যান্ত্রিক করে গড়ে তোলে। আধুনিক শিক্ষা কেবল জীবিকা উপার্জনের লক্ষ্য নিয়ে মানুষকে শিক্ষা দেয়। সেখানে আধ্যাত্মিকতা অনুপস্থিত। ওই শিক্ষার অধীনে মানুষ বন্দী থাকে এবং সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে সম্ভব হয়, তার শোষণকাজকে চালিয়ে যাওয়া। কারণ আধুনিক শিক্ষার উৎস পুঁজিবাদী সমাজ, পুঁজিবাদ তো রাষ্ট্রকে সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত করে। ফলে আজ বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ও সেখানে তার অবদান

কী এবং কতটুকু, সেটি নির্ভর করছে কত দ্রুত ওই আধুনিক শিক্ষার একটি বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা উদ্ভাবন করা যায়।

বিশ্ব ভাবান্দোলনে আধুনিকতাবিরোধী তত্ত্বের দুষ্প্রাপ্যতা নিয়ে কখনো অসুবিধায় পড়তে হয়নি। সে ক্ষেত্রে মজহারীয় অবস্থান নিতান্তই চমকহীন। ইউরোপে ফ্যাসিবাদের উত্থান কেন হলো, কেন বর্বরতা স্থান করে নিল, কেন লাখ লাখ ইহুদি নিধন সম্ভব হলো, ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল নামে বুদ্ধিজীবীদের এক গোষ্ঠী এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন, যাঁদের মধ্যে পরিচিত নাম বলতে আমরা শুনি মারকিউজ, এডোরনো, হরখেইমার, এরিক ফ্রম, হেবারমাসের[১১]। তাঁরা দেখিয়েছেন আধুনিক সভ্যতা যান্ত্রিক মানসিকতার জন্ম দেয়। সেখানে ভাব বা আধ্যাত্মিকতার স্থান খুবই ম্লান। ওই যান্ত্রিক চেতনা মানুষকে কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ, সে শিক্ষায় শিক্ষিত না করে যুক্তিবাদী মনোভাবের ওপর নির্ভরশীল করে রাখে। এর ফল হয় ভয়াবহ। এই চিন্তাকাঠামোটি ফরহাদ মজহারও রপ্ত করেছেন পুরোদস্তর এবং এক বিশেষ আত্মতৃপ্তিবোধ নিয়ে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে যথেষ্ট গুণগান করেছেন। কারণ ওই ব্যবস্থার মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন সত্যিকারের আধ্যাত্মিকতা। অনেকটা আফগানি বা পাকিস্তানি তালেবানিদের মতো করে আঘাতটি আধুনিক শিক্ষার বিরুদ্ধে হওয়া চাই। ওই মাদ্রাসাশিক্ষায় আধ্যাত্মিকতার বিপুলতা এতই যে তার ওপর ভর করে একটি আধ্যাত্মিকমুখী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব বলেও তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। আধ্যাত্মিকতা বলতে মজহারীয় ধারণাটি কী, সেটি অবশ্য বোঝা কঠিন। তথাকথিত আধ্যাত্মিকতার মধ্যে পুরো দেহ-মনকে ডুবিয়ে রেখেও অনেক শক্তি ইতিহাসে বর্বরতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটিয়ে গেছে। ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তানে সামরিক কর্মকর্তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে ১৯৭১ সালে হত্যা করেছে। বর্বরতা বা যান্ত্রিকতা কি কেবল আধুনিক শিক্ষারই ফসল?

আধুনিক এবং কওমি মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থার দ্বৈততা তাঁর ভুবনে যথেষ্ট স্পষ্ট। আধুনিক শিক্ষাকে তিনি দেখেছেন আধ্যাত্মিক এবং দিব্যগুণবর্জিত এক ব্যবস্থা হিসেবে, যেখানে শিক্ষার নামে কলকারখানা, অফিস-আদালতের জন্য শ্রমিক সরবরাহ করার কারখানা নির্মাণ করা...মানুষকে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার গোলামে পরিণত করা...। মানুষকে জীবজন্তুর পর্যায়ে রাখা। কারণ শুধু শ্রমিক তৈরি হওয়ার দিক থেকে না, মানুষকে নীতি-নৈতিকতাবর্জিত ভোগী হিসেবে তৈরি না করলে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না...(মজহার, শিক্ষা ও কওমি মাদ্রাসার রাজনীতি, ২৫ এপ্রিল ২০১৩) এরই বিপরীতে কওমি মাদ্রাসা জীবের বৃত্তিসম্পন্ন ভোগী মানুষের শিক্ষা দেয় না...তাকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব গণ্য করে, সাচ্চা মুসলমান এবং মানুষ বানায়...(মজহার, শিক্ষা ও

কওমি মাদ্রাসার রাজনীতি, ২৫ এপ্রিল ২০১৩)। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প ব্যবস্থা বলতে সেই শিক্ষাকে বোঝায় যেখানে নারী তেঁতুল তুলনীয়। সেই শিক্ষাব্যবস্থায় যেকোনো আধুনিকায়নকে তিনি ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখেন, 'যে ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য মাদ্রাসাশিক্ষার 'বৈপ্লবিক দিককে' আড়াল করে বিদ্যমান ব্যবস্থার অধীনে অধীনস্থ করা বোঝায়। মজহারের ধারণায় এর সর্বোপরি উদ্দেশ্য, সেপ্টেম্বর এগারোয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে ও পেন্টাগনে হামলার পর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে অনন্ত যুদ্ধ শুরু হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কওমি মাদ্রাসাগুলোকে...সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের টার্গেট বানানো...মাদ্রাসায় যা পড়ানো হয়, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বদলে দিয়ে চায়।' আধুনিকতা ও আধ্যাত্মিকতাকে পরস্পরবিরোধী অবস্থানে দাঁড় করিয়ে মজহারের পক্ষে বিশেষ রাজনৈতিক ফায়দা লোটা সম্ভব হয়। ফরহাদ মজহার নিজেই তো আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন, সেই আধ্যাত্মিকতাবর্জিত শিক্ষা নিয়েও তাঁর পক্ষে বাংলার আধ্যাত্মিক জগতে একটি বিশেষ ভাবান্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া কীভাবে সম্ভব হচ্ছে, কেন তাঁর নিজের আধুনিক শিক্ষা সে ক্ষেত্রে কোনো বাধা হচ্ছে না, বোধগম্য নয়।

পুঁজিবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী সমাজ আধ্যাত্মিকতামুক্ত, আর ধর্মীয় মাদ্রাসাশিক্ষা আধ্যাত্মিক—এ যুক্তি অগ্রহণীয়। বুর্জোয়া শ্রেণী কেবল যান্ত্রিক শিক্ষার প্রতি ঝোঁকে না। সে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাকেও ব্যবহার করে তার নিজ প্রয়োজনে। মার্ক্স কিন্তু ধর্মের আদর্শিক ও রাজনৈতিক ব্যবহারের বিরুদ্ধেই সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ছিলেন।

ধর্মকে আফিম বলার মূল লক্ষ্য ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থে ধর্ম এবং বিদ্যমান আধ্যাত্মিকতা ব্যবহারের প্রতিবাদ করা। গ্রামসি কি দেখাননি, যেকোনো শ্রেণীসংগ্রামে বুর্জোয়া শ্রেণী কীভাবে ধর্ম, ঐতিহ্য, প্রথার ব্যবহার দিয়ে শ্রেণী শাসন বজায় রাখে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তো ইসলাম ধর্মের আধ্যাত্মিকতাকে কাজে লাগিয়েই সোভিয়েত শাসনের পতন ঘটিয়েছিল। আধুনিক শহর সভ্যতার বিরুদ্ধে ফরহাদ মজহার ওই একই কৌশল অবলম্বন করেছেন। সেখানেও শহর-গ্রাম দ্বন্দ্বকে পুঁজি করে নগর সভ্যতার ঘরে আগুন লাগাতে চেয়েছেন। নষ্ট শহরে হেফাজতের গণবিস্ফোরণে (৯ এপ্রিল, ২০১৩) তিনি শহরকে একহাত নিয়েছেন অথচ বাঙালি সমাজে মানুষ এখনো নাগরিক না হওয়ায় আক্ষেপ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'বাংলাদেশ জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ করেছে ঠিকই, কিন্তু নানা কারণে রাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া বিকাশের দরকারে ব্যক্তির সার্বভৌম মহিমা, মর্যাদা ও অধিকার কায়েম করতে পারে নি। যার নজির আমরা ইউরোপের বিপ্লবে দেখি।...বুর্জোয়া রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সার্বজনীন নাগরিকতার অভিষেক ঘটে নি বাংলাদেশে।...ব্যক্তির উপলব্ধি ঘটেছে প্রধানত ভোগের জায়গা থেকে' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩)। যে শহর সভ্যতা ব্যতীত নাগরিক হওয়া

যায় না, যে নাগরিক প্রত্যয় শহর সভ্যতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, সেই শহরের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা, আবার বাংলাদেশে নাগরিক ধারণা কেন বিকশিত হয়নি তার জন্য আক্ষেপ—কি অস্বাভাবিক স্ববিরোধী মজহারীয় এই জগৎ!

প্রাক্সিসের জগৎ ও মজহারীয় ভাবান্দোলন

ফরহাদ মজহারের আদর্শিক অবস্থানের সঙ্গে তাঁর প্রাক্সিসের গরমিল অত্যন্ত প্রবল। নিজের ভাবান্দোলনকে তিনি বুঝতে চেয়েছেন তাঁর ব্যুৎপত্তিগত অর্থে, ভূ হওয়া বা হয়ে ওঠার অর্থে, তাকে রাজনীতি জাতপাত নারী-পুরুষ ভেদ ও শ্রেণী সংগ্রামের জায়গায় দাঁড়িয়ে, রাজনৈতিকভাবে বিশেষত বৈপ্লবিক রাজনীতি ও সংস্কৃতির জায়গায় দাঁড়িয়ে[১২]। সমাজের ভেদচিহ্নগুলোকে মুছে ফেলার লক্ষ্য যে ভাবজগতের, সে জগৎ ভাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে নয়, একটি সামাজিক শক্তির আশ্রয়ে ওই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে। মজহারের ভাবান্দোলন সামাজিক ও ধর্মীয় আশ্রয় হিসেবে খুঁজে নিয়েছে হেফাজতে ইসলামকে বা রাজনৈতিক ইসলামভিত্তিক দলগুলোকে। এসব সংগঠনের সঙ্গে তাঁর সংহতি প্রকাশ থেকে ধরে নেওয়া যায় যে তাদের আদর্শের সঙ্গেও তিনি একমত পোষণ করেন। তাহলে হেফাজতে ইসলামের ১৩ দফা দাবি, যেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধের ঘোষণা আছে এবং পাদটিকা হিসেবে তেঁতুলতত্ত্ব নামে পরিচিত যে অশালীন, কুরুচিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত আছে, তার প্রতি মজহারের ভাবদর্শনের নাড়ির বাঁধন রয়েছে। নারীকে পুরুষের ভোগের বস্তু, তার লালসা নিবৃত্তির মাধ্যম ব্যতীত তেমন কোনো সামাজিক দায়িত্ব যে আন্দোলন দেখে না এবং যে সংগঠনের প্রধান মাওলানা শফীর নারীকেন্দ্রিক ইউটিউবীয় মন্তব্যে নারীর জন্য যে সামাজিক অবস্থান নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে মজহার নিশ্চয় একমত। তা না হলে হেফাজতের পক্ষ নিয়ে এত অধীর আগ্রহে মানবাধিকারের কুয়াশাচ্ছন্নতার আশ্রয়ে পুলিশি অত্যাচার, নিপীড়ন এবং হত্যার প্রতিবাদে তিনি নিজের কণ্ঠকে প্রসারিত করবেন।

আল্লামা শফী সাহেবের ধর্মীয় আন্দোলনকে মজহার সমীকরণ করেছেন নিপীড়িত শ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে। কাগজে-কলমে তিনি তাঁর আন্দোলনকে দেখিয়েছেন শ্রেণী সংগ্রামের বিষয় হিসেবে, 'বিভিন্ন শ্রেণীর দ্বন্দ্ব ও টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে...শাসক শ্রেণীর সাংস্কৃতিক মানদণ্ড ও বয়ান থেকে বেরিয়ে আসার...বৈপ্লবিক চিন্তার সংগ্রাম, স্ফূর্তি ও বিকাশের ধারা' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৩৮) হিসেবে। শব্দের ফুলঝুরি; শব্দের লহর, শব্দের চাটুকারিতা, সামাজিক ভেদরেখাকে বিশেষ করে লিঙ্গবিভেদকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার এই মহতী গোয়েবলসীয় প্রয়াসের বাইরে মজহারের ভাবান্দোলন শ্রেণী সংগ্রামের আন্দোলন এবং নারী-পুরুষ ভেদবিরোধিতার আন্দোলন চিন্তা করতে অপারগ। তার শ্রেণীভেদতত্ত্বের স্ফটিক স্বচ্ছ দুর্বলতাকে তিনি বোঝেন।

কীভাবে সেই দুর্বলতাকে ধামাচাপা দেওয়া যায়, সেটি আঁচ করা যায় তার ২৫ এপ্রিল ২০১৩ সালে *ইকোনমিক টাইমস* তথ্যসূত্রে প্রাপ্ত 'শিক্ষা ও কওমি মাদ্রাসার রাজনীতি' লেখাতে। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'এখানে শুধু শিক্ষণীয় দিকটি হলো ইসলামপন্থী সামাজিক সংগঠন বা রাজনৈতিক দলগুলিকে এককাট্টা একই রকম ভাববার কোন কারণ নেই। তাদের মধ্যে মতাদর্শিক বিরোধ যেমন আছে, তেমনি স্বার্থের সংঘাতও রয়েছে। ফলে তাদের দাবিদাওয়া দেখে শ্রেণী ও শক্তির লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তাদের চরিত্র বুঝতে যাওয়া ভুল হবে।' (মজহার, শিক্ষা ও কওমি মাদ্রাসার রাজনীতি, ২৫ এপ্রিল ২০১৩) প্রশ্ন হলো, তাদের দাবি-দাওয়া যদি তাদের সামাজিক এবং শ্রেণী অবস্থানের নির্ণায়ক না হয়, সামাজিক অবস্থান যদি রাজনৈতিক অবস্থান থেকে জাত না হয়, তাহলে কেন লেখা, 'কউমি মাদ্রাসার গুরুত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে দারুল উলুম মইনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান আল্লামা আহমদ শফীর সুনাম এবং মান্যতা। তাকে ঘিরে অতি সহজেই বাংলাদেশের আলেম-উলেমারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটি ব্যাপক ও শক্তিশালী ধর্মীয় সংগঠন হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছেন। তার মানে সমাজে যে শ্রেণীগুলোর একাধিপত্য আমরা দেখে আসছি, সেখানে বেশ ক্ষয় ঘটেছে এবং অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেণী তাদের আকুতি ও আকাঙ্ক্ষা সরবে হাজির করতে আগের চেয়েও আরও অনেক বেশি সক্ষম। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণেই ধর্মীয় সংগঠনটি এখন সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে হাজির হয়েছে। সাধারণ মানুষের প্রতি ঘৃণা ও ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং আতঙ্কের কারণে শহুরে সেক্যুলার মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণী যত সহজে এখন এই শক্তিকে উপেক্ষা করতে চাইছে, বাস্তবতা অত সহজ বা সরল নয়। মাওলানা-মাশায়েখদের প্রতি তাদের বদ্ধমূল শ্রেণী ঘৃণা উগরে দিয়েই তারা ভাবছে এই শক্তিকে মোকাবিলা করা যাবে। আসলে তা হবে না। উচিত বাস্তব পরিস্থিতির বাস্তব অনুধাবন ও সঠিক বিশ্লেষণ' (মজহার, শিক্ষা ও কওমি মাদ্রাসার রাজনীতি, ২৫ এপ্রিল, ২০১৩)।

ভেদমুক্তির দোহাই দিয়ে যে ফ্যাসিবাদী ব্যক্তিস্বাধীনতাবিরোধী সমাজ নির্মাণের কথা তিনি ভাবছেন, সেই তত্ত্বে লালনকে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় স্থান করে দেওয়ার মজহারীয় দুরভিসন্ধিও পরিষ্কার। সমাজবাদী ভাবজগতে বৃহত্তর মানবতাবাদের লালনীয় আবেদন, আবেগ ও চাওয়া-পাওয়া, যেটি দেশ-কাল-পাত্র, নারী-পুরুষ, জাতপাতের ঊর্ধ্বে, তাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা লালনকে অসম্মান করা বোঝায়। লালনকেন্দ্রিক কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন বাংলায় গড়ে ওঠেনি। কারণ এতকাল মানুষ লালনের বিশ্ব মানবতার বাণীকে নিতান্তই পরিচ্ছন্ন রেখেছে, তাঁর আদি পরিচিতিকে কলুষিত হতে না দিয়ে। সেই পরিচ্ছন্ন ভাবের জগৎ থেকে সব শ্রেণী এবং ধর্মের মানুষ তৃপ্তিসুধা লাভ করেছে। লালনের ওই মানবতাবাদী

এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণীকে মজহার তাঁর আন্দোলনের ভাবগত উৎসে পরিণত করতে চান। আর সেই উদ্দেশে লালনীয় দর্শনের যেটুকু ইসলামি, সেটুককে খুঁজে বের করে তাঁর রাজনৈতিক ইসলামি আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো উদ্দেশ্য। এতকাল যেভাবেই হোক না কেন লালনের ভাবজগতের স্নিগ্ধ সুধাধারা সমাজের কোনো বিশেষ গোষ্ঠীস্বার্থে ব্যবহৃত হয়নি, কোনো সংকীর্ণ স্বার্থের আশ্রয়ে বেড়ে ওঠেনি। আর সে কারণে তাঁর পবিত্রতা এতকাল ছিল অকলুষিত। তাঁকে কলুষিত করার সেই দায়িত্বটি ফরহাদ মজহার নিজে গ্রহণ করেছেন। তাঁকে আজ ব্যবহার করা চাই বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে, বিদ্যমান জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকল্প শক্তি নির্মাণে। তিনি লিখেছেন, 'বিশেষত ফকির লালন শাহ আমাদের যতোটা কাজে আসেন, বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের উপাস্য ব্যক্তিরা ততোটা কাজে আসেন না। ফকির লালন শাহ ও বাংলার ভাবান্দোলনের প্রতি এই কারণেই আমাদের বিশেষ রাজনৈতিক আগ্রহ' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৩১)।

লালনকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের মুখোমুখি শক্তি হিসেবে উপস্থাপনের মজহারীয় চক্রান্তও বেশ সূক্ষ্ম। সেখানে আবেদনটি যুবসমাজের প্রতি। তাঁর মতে, যুবসমাজের বেশ বড় একটি অংশ হতাশ এবং সে কারণে বিরক্ত হয়ে বাঙালি সমাজের মধ্যবিত্তের এক বিশেষ অংশ লালন শাহের ভাবের জগতে আশ্রয় নিতে শুরু করেছে। মধ্যবিত্তের মধ্যে এই প্রবণতা দেখে একদিকে তিনি যেমন খুশি, তেমনি উদ্বিগ্ন। কারণ, 'শিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত সচ্ছল তরুণদের ফকির লালন শাহ সম্পর্কে আন্তরিকভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠা প্রধানত অধিপতি শ্রেণীর সাংস্কৃতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সংকটের লক্ষণ। কলকাতার বাবুসংস্কৃতির অনুকরণে যে ঢাকাকেন্দ্রিক 'আধুনিকতা' ও সাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে, সেই ধারার চেহারা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিষ্কার' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৩৯)। কারণ সেই আকর্ষণ অতিনিমেষে গাঁজা বা নেশাগ্রস্ততায় পরিণত হতে পারে। তিনি আরও লক্ষ করেছেন, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ তার সাংস্কৃতিক ক্ষুধা মিটাতে ব্যর্থ হওয়ায় তরুণদের বড়ো একটা অংশ বসে থাকে নি। নিজেরা যা পেরেছে তৈরি করেছে, আমাদের শুনিয়েছে। নিজেদের পুঁজি ফুরিয়ে যাচ্ছে দেখে বাউল ফকির বয়াতিদের দ্বারস্থ হয়েছে। এই শখ বা ক্রেইজ বেশিদিন থাকবে না। কিন্তু যদি বাংলার ভাবান্দোলনের পরিচয় আমরা ঠিক মতো নিতে পারি—নিছকই জ্ঞান হিশাবে নয়—জ্ঞানচর্চা বা ভাবচর্চার ধারা হিশাবে—তাহলে বাংলার ভাব ও ভাবুকতার ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটতে বাধ্য' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৩২)। সে কারণে তাঁকে কেবল ধর্মতাত্ত্বিকতার অবস্থান থেকে বিচার করতে তিনি নারাজ। লালনকে, তাঁর উপদেশ মতে, দেখতে হবে নদিয়ার ঐতিহ্যে, তাঁর বিপ্লবী আন্দোলনমুখী চরিত্রের আলোকে, যেটি এতকাল কেউ তাঁর মতো করে ভাবেননি। তিনি

লিখেছেন, 'আমরা আউল-বাউল, ফকির-ফ্যাকড়া, দরবেশ, উদাসী, বয়াতি, পালাকার ইত্যাদি নানান নামে গণমানুষের চিন্তার যে লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাস দেখি তাকে এক কথায় বাংলার 'ভাব' বলি। ভাবুকতার এই আন্দোলন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক লড়াই-সংগ্রাম থেকে আলাদা কিছু নয়।...নিরক্ষরের ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে বাংলার চিন্তা বা ভাবচর্চার যে প্রাণবন্ত, উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ রূপটা আমরা দেখি বাংলার দর্শনচর্চার ভিত্তি নির্মাণের কাজ সেখান থেকেই আরম্ভ করতে হবে' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ২১)। কারণ 'যদি বাংলার চিন্তা বা ভাবের বৈপ্লবিক দিকগুলো আমরা ধরতে না পারি তাহলে রাজনৈতিক ভাবে যতোই আমরা বিপ্লবের কথা আওড়াই, তাতে কোথাও কোন কূটাটিও নড়বে না' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৩৮)।

শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে লালন এবং লালনের সঙ্গে ইসলামকে যুক্ত করে তিনি এই কালপুরুষকে ইসলামি আন্দোলনের পুরোধা বানাতে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'নাস্তিক হওয়া খুব সহজ বলে এই বিরক্তিকর উপদ্রব প্রায়ই হাজির হয়। এর জ্বালাতন প্রায়ই আমাদের সহ্য করতে হয়।...নিজেকে 'প্রগতিশীল' প্রমাণ করা সস্তা পথ। মুশকিল হচ্ছে নব্য মধ্যবিত্ত 'বাউল' বা বয়াতিদের মধ্যে পুরানা বাতিকে নাস্তিকতাই অন্বেষণ করে বেড়ায় এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে একটি দুটি গানের কলির মধ্যে তাদের নজির দেখে খুবই আহ্লাদ বোধ করে। পরক্ষণেই আবার এদের মধ্যেই জিকির, আল্লাহ দৈন্য, নবীতত্ত্ব, গৌরগান, কীর্তন, গোষ্ঠগান দেখে নব্য মধ্যবিত্ত হতভম্ব হয়ে যায়—মেলাতে পারে না। বাংলার ভাবান্দোলন আস্তিকতা/নাস্তিকতা এই ভেদরেখার বহাল রাখার লড়াই নয়' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৩৩)। কিন্তু লালনকে ইসলামি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার মজহারীয় প্রকল্প যে তাঁর নিজের অসংলগ্ন অবস্থানকে আরও বেশি উচ্চারিত করে, সেটি বলার অপেক্ষা রাখে না। মৌলবাদী জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে মজহারীয় লিয়াজোঁ এবং ওই রাজনৈতিক শক্তিকে পুরোপুরি ব্যবহার করার মজহারীয় ষড়যন্ত্র যে বুমেরাং হয়ে তাঁর দিকে ফিরে আসবে না, সেটি নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তার কারণ জামায়াতে ইসলামী মৌলবাদী রাজনৈতিক দল হিসেবে লালনীয় ভাব এবং পীর-ফকির তত্ত্বের বিরুদ্ধবাদী একটি আন্দোলন। সুফিবাদবিরোধী, পীরতত্ত্ববিরোধী, কবর জিয়ারতবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে মজহারের সখ্যতা তাঁর নিজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বময় জীবন এবং আদর্শকেই আরও বেশি স্বচ্ছভাবে তুলে ধরে।

তিনি লিখেছেন, 'গরিবের সম্পদ বড়োলোক চুরি করে এটা নতুন কিছু নয়, সেটাও না হয় সহ্য করা গেল। তারা রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান বা সুর এক অক্ষর এদিক-ওদিক করতে পারেন না, কিন্তু এই শ্রেণীর ধৃষ্টতা হোল বাউল ও বয়াতিদের গানের কথা ও সুর তাদের খুশিমতো বদলানো। বিকৃত করতেও তাদের বাধে নি। তখন

বোঝা যায় বাংলার ভাবান্দোলনের প্রতি অধিপতি শ্রেণীর মনোরঞ্জকদের শ্রদ্ধা দূরের কথা এগুলো তাদের কাছে নিছকই কাঁচামাল ছাড়া অধিক কিছুই নয়। কাউকে না বলে এবং কারও কাছে জবাবদিহী না করে তারা যেমন খুশি তেমন এই মাল ব্যবহার করতে পারে। লালনের সঙ্গে খেটে খাওয়া মানুষকে যুক্ত করে অথবা লালনের গানের সুর বদলানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করে এক সাম্প্রদায়িক রং মিশিয়ে লালনকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করার সস্তা সুযোগ তিনি হাতছাড়া করতে নারাজ।

ভূকৌশলগত রাজনীতি ও মজহারীয় অবস্থান

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে বিদ্যমান ত্রিভুজ প্রেমকে (বাংলাদেশকে নিয়ে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে) উপলক্ষ করে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার এক নতুন সংস্করণের জন্ম হচ্ছে এবং সেখানে মজহারের বিশেষ ভূমিকা উপেক্ষা করার নয়। এতকাল বিশ্ব ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু বলতে ইউরোপ ও আমেরিকাকে আমরা বুঝে এসেছি। আজ সেই বোঝার ক্ষেত্রে বেশ দৃশ্যমান এবং গভীর পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। বার্লিন দেয়াল যেদিন ভেঙে পড়ল এবং গোটা ইউরোপ অভিন্ন রাষ্ট্রপুঞ্জের পথে পা বাড়াল, সেদিন থেকে ঠান্ডা লড়াই-ই কেবল শেষ হলো না, এর সঙ্গে এতকাল টিকে থাকা দ্বিকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটল। ওই সমাপ্তির সঙ্গে পুরোনো সব আদর্শিক ও তাত্ত্বিক কাঠামো এবং অভিব্যক্তি জঞ্জালে পরিণত হলো। সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে আমরা দুই পরাশক্তির মধ্যকার আদর্শিক, রাজনৈতিক এবং প্রক্সি যুদ্ধ দেখে এসেছি। সেই বিশেষ বিশ্বব্যবস্থায় নিজেদের হয় এদিকে, নয় ওদিকে দাঁড় করাতে হয়েছে ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছায়। আর তার ফলে অপরিসীমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বহু রাষ্ট্র তাদের দিকনির্দেশনা হারিয়েছে। আজ সেই পরিস্থিতিতে পরিবর্তন এসেছে। দ্বিকেন্দ্রিক (আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন) ব্যবস্থার পতন ঘটিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এককালীন একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও সে আধিপত্য ক্ষণিক প্রমাণিত হচ্ছে। এককেন্দ্রিক বিশ্বের জায়গায় স্থান করে নিচ্ছে বহুকেন্দ্রিক এক বিশ্বব্যবস্থা। সেই বহুকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় যে দুই পরাশক্তির আবির্ভাব আমরা আশা করছি, তারা এশিয়াতে অবস্থিত। চীন ও ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি তাদের অচিরেই বিশ্ব মহাশক্তিতে পরিণত করবে বলে বিজ্ঞজনেরা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। সেদিক থেকে ভাবলে ভারতবর্ষ পরিণত হতে চলেছে এক বিশেষ অঞ্চলে, যার ভূকৌশলগত মূল্য অপরিসীম। চীন ও ভারতের মধ্যে অতীত সম্পর্ক কখনো ভালো ছিল না। তারা ১৯৬২ সালে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আজও সীমান্ত নিয়ে দুই দেশের মধ্যে বিরোধ জিইয়ে রয়েছে। তার ওপর রয়েছে অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রশ্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

চীনের পরাশক্তিতে রূপান্তরিত হওয়াকে ভালো চোখে দেখে না। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন স্বার্থ ক্ষুণ্ন হতে পারে, সেই আশঙ্কা আজ আমেরিকার। সে কারণে বৈশ্বিক রাজনীতির কৌশল হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে আঁতাত করবে, সেটি খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আঞ্চলিক রাজনীতির প্রশ্ন যখন আসে, যেখানে ভারতের পাশাপাশি রয়েছে পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং অন্যান্য রাষ্ট্র; তখন এই অঞ্চলের ওপর ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্যকে নিয়ন্ত্রণে রাখা মার্কিন স্বার্থের জন্য জরুরি হয়ে দাঁড়ায়।

এই বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক এবং ভূকৌশলগত প্রজ্ঞা দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থানকে বিচার করা দায়িত্বশীল কাজ। বিশ্বায়নের যুগে রাষ্ট্রপুঞ্জের অতিমাত্রিক নিকটবর্তিতা এবং একে অপরের মধ্যে আদান-প্রদানের ঘনত্ব বৃদ্ধিকে মূলধন করে এবং আঞ্চলিক রাজনীতিকে ভারতবিরোধিতার রঙে রঙিন করে এক বিশেষ সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ নির্মাণ করা কতটুকু যৌক্তিক, সে প্রশ্ন রয়ে যায়। সেদিক থেকে ভাবলে মৌলবাদী ইসলামের এই মজহারীয় স্ট্র্যাটেজির সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ধারায় বিকশিত দেশীয় বামের ঘনিষ্ঠ গ্র্যান্ড আঁতাত একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির এক সংকটের জন্ম দিচ্ছে। এই গ্র্যান্ড আঁতাতের কি কোনো নিকট যোগসূত্র আছে বৈশ্বিক ভূরাজনীতির দাবা খেলায়? এমন কি হতে পারে যে সাম্প্রদায়িক এবং উগ্র ইসলামি আন্দোলনকে ওই দাবা খেলায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে? ভারত যদি বাংলাদেশকে উগ্র ইসলামি এবং সন্ত্রাসী রাজনীতির প্রভাবমুক্ত একটি দেশ হিসেবে আশা করে তাহলে এ অঞ্চলে ভারতের প্রভাবকে খর্ব করার লক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চিতভাবে ভারতের সবচেয়ে স্পর্শকাতর ইস্যুকে নিয়েই খেলবে। সেখানে সন্ত্রাসী ইসলামি আন্দোলন হতে পারে এক বিশেষ মারণাস্ত্র। সেই ফ্রেমওয়ার্কে ভাবলে জঙ্গি ইসলামের প্রতি ফরহাদ মজহারের পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষ সমর্থন এ অঞ্চলে আমেরিকান এজেন্ডাকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করছে।

দক্ষিণ এশিয়ার জন্য নির্ধারিত দিল্লির রণনীতি এবং শেখ হাসিনার রণরঙ্গিনী মূর্তি ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে, শাহবাগ আন্দোলনকে দিল্লির রণনীতির শক্তিশালী যুক্তি, সাতক্ষীরায় যৌথ বাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীর যোগসূত্র খোঁজার মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার ওই আবহ তৈরি হচ্ছে মজহারীয় কলমে। নির্বাচনকেন্দ্রিক সাম্প্রতিক রাজনীতিতে আল-কায়েদা জাতীয় সন্ত্রাস এবং গেরিলা স্টাইল থেকে জন্ম নেওয়া যে সন্ত্রাস ও তাণ্ডবলীলা দেশ প্রত্যক্ষ করল, তার পরিপ্রেক্ষিতে সার্বভৌমত্বসংক্রান্ত প্রাচীন ধারণার পরিবর্তে সহজভাবে সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের সাম্প্রতিক উদাহরণ টেনে মজহারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে ইসলাম ধর্ম এবং ইসলামের নাম ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানো (ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে

দুনিয়াব্যাপী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধ, ইসলামপন্থীরা তাদের জন্য হুমকি), যা কিনা মার্কিন ভূকৌশলগত রাজনীতির সঙ্গে বেশ মিলে যায়।

শেষ কথা

বাংলাদেশের মাটি নরম। এখানকার মানুষ ধর্মভীরু। এখানে ভারী কোনো আদর্শ মানুষ পছন্দ করে না, সে আদর্শ মৌলবাদী রাজনৈতিক ইসলাম হোক, মার্ক্সবাদী হোক বা হোক উগ্র জাতীয়তাবাদী। একটি আধুনিক, উদারপন্থী মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তোলা আমাদের কর্তব্য। সেখানে বিপ্লব ভাবনা বেশি দূর এগোবে না। সংস্কার দিয়ে সমাজকে মধ্য পন্থার একটি গণকল্যাণধর্মী সমাজ গড়ে তোলাই বিকল্প আদর্শ ভাবনা হতে পারে। ফরহাদ মজহার বাংলাদেশকে ফ্যাসিবাদী ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করতে চান। ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবহার দিয়ে যেসব সমাজ এই পরীক্ষণ করেছে, সেখানে ধ্বংস এবং বিভেদ ছাড়া আর কিছুই মেলেনি। পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, তিউনিশিয়া, মিসর, লিবিয়া তার প্রমাণ। মজহার যে জঙ্গি ইসলামি প্যারাডাইম ব্যবহার করেছেন, সেটি বৈপরীত্যে ডুবে আছে। মানুষের বুঝতে বাকি নেই তাঁর শ্রেণী অবস্থান; ভেদমুক্তির আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা সবই কথার কথা। কেবল হয়তোবা কথার কথাও নয়, বরং তাঁর নিজ জীবনের নানা ডিগবাজি এবং উল্লম্ফনকে যৌক্তিক রূপ দেওয়া ছাড়া ওই সব শব্দ বাগাড়ম্বর, বিশেষ কোনো মূল্য বহন করে না।

[প্রবন্ধটি লেখার ক্ষেত্রে নানাভাবে সাহায্য করার জন্য খন্দকার সাখাওয়াত আলী (প্রতিচিন্তা), খলিলউল্লাহ্ (প্রতিচিন্তা) এবং ইফতেখার মাহমুদকে (প্রথম আলো) ধন্যবাদ।]

টিকা

১। Michel Foucault moving from a postmodern position considered it as the renewal of an entire nation's total existence through the resumption of a spiritual experience found at the heart of Shi'I Islam[3] (see, Richard, Y. 1991: 267). Later Foucault would also mention that Iranian revolution was indeed the first postmodern revolution of our time. Informed by the way modern man is said to have redefined its relationship with truth, Foucault's position challenges the backbone and substance of the Western tradition (Hollingdale, 1977: 9).

২। ফরহাদ মজহারের 'খালেদার জয়-পরাজয়,' *চিন্তা*'য় প্রকাশিত হয়।

৩। ফরহাদ মজহার, 'এখন ঘুরে দাঁড়াবার সময়,' এপ্রিল-৬, ২০১৩, অনলাইন থেকে নেয়া।

৪। অমর্ত্য সেন লিখেছেন, A Hutu labourer from Kigali may be pressed to see himself only as a Hutu and incited to kill Tutsis, and yet he is not ony a Hutu, but also a Kigalian, a Rwandan, an African, a labourer, and a human being (Sen, A, 2006: 4)।
ধর্মের প্রসঙ্গ টেনে তিনি লিখেছেন, In partitioning the population of the world into those belonging to the Islamic World, the Western World, the Hindu World, the Buddhist World, the decisive power of classificatory priority is implicitly used to place people firmly inside a unique set of rigid boxes. Other divisions (say, between the rich and the poor, between members of different classes and occupations, between people of different politics, between distinct nationalities and residential locations, between language groups, etc.) are all submerged by this allegedly primal way of seeing the differences between people. (Amryta Sen, 2006:11).

৫। লিয়াটারডের মতে, মানবমুক্তি, আত্মতৃপ্তি এবং সামাজিক প্রগতিসংক্রান্ত আধুনিকবাদী ধারণাগুলো পোস্টমডার্ন পর্যায়ে এসে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। মানুষ এই সমাজে আর বিশ্বাস করে না যে প্রজ্ঞা দিয়ে কুসংস্কার দূর করা যাবে, মানুষকে নিখুঁত করা যাবে অথবা রাজনৈতিক পরিবর্তন একটি নিখুঁত সমাজ উপহার দেবে। পোস্টমডার্ন সমাজে দুটি দিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—একটি হলো কোনো অনন্ত সত্য নেই এবং সে কারণে সত্য অনুসন্ধানে যে জ্ঞান ব্যবহার করা হয়, সে জ্ঞান একক জ্ঞান না হয়ে বিভিন্ন শাখায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয়ত, প্রায়োগিক কৌশলগত জ্ঞানের প্রসার ঘটবে (দেখুন Lyotard, J. F (1984: p. XXVI) ।

৬। সামুয়েল হান্টিংটন লিখেছেন, It is my hypothesis that the fundamental source of conflict in this new world will not be primarily ideological or primarily economic. The great divisions among humankind and the dominating source of conflict will be cultural. Nation states will remain the most powerful actors in world affairs, but the principal conflicts of global politics will occur between nations and groups of different civilizations. The clash of civilizations will dominate global politics. The fault lines between civilizations will be the battle lines of the future. (Samuel Huntington, The Clash of Civilisations? *Foreign Affairs*, Summer volume 72, no. 3 1993, p.22).

৭। জিহাদ সম্পর্কে নিবিড়ভাবে গবেষণা করে Reuven Firestone লিখেছেন, The semantic meaning of the Arabic term jihad has no relationship to holy war or even war in general. It derives, rather from the root j.h.d., the meaning of which is to strive, exert oneself, or take extraordinary pains. Jihad is a verbal noun of the third Arabic form of the root jahada, which is defined classically a exerting ine's utmost power, efforts, endeavors or ability in contending with an object of disapprobation. Such an object is often categorized in the literature as deriving from one of three sources: a visible enemy, the devil, and aspect of one's own self. There are, therefore, many kinds of jihad, and most have nothing to do with warfare. Jihad of the

heart, for example, denotes struggle against one's own sinful inclinations, while Jihad of the tongue requires speaking on behalf of the good and forbidding evil (Firestone, R, 1999: 16-17).

৮। পবিত্র কোরআন শরিফে বলা হয়েছে, And hold fast, All together, by the rope which Allah (stretched out for you), and be not divided among yourselves; And remember with gratitude Allah's favour on you; for ye were enemies and he joined your hearts in love, so that by His grace, ye became brithren; And ye were on the brink of the pit of fire, and He saved you from it. Thus doth Allah make His signs clear to you; that you may be guided. (Translation by Yousuf Ali)

৯। তিনি লিখেছেন, 'এই ভাবকে প্রথমে বুঝতে হচ্ছে এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থে—ভূ হওয়া বা হয়ে ওঠার অর্থে। আমাদের হয়ে ওঠার কাজ হিশাবে। দ্বিতীয়ত তার রাজনীতি জাত, পাত, নারীপুরুষ ভেদ ও শ্রেণী সংগ্রামের জায়গায় দাঁড়িয়ে বোঝাবুঝি। যদি লড়াই-সংগ্রামের জায়গা থেকে আমরা বাংলার ভাবুকতাকে বুঝতে না পারি তাহলে গোলোকায়ন বা সাম্রাজ্যবাদের এই যুগে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিপরীতে মানুষের সত্যিকারের ইতিহাসের শুরু করবার যে তোড়জোড় শুরু হয়েছে সেই আয়োজনে আমরা পিছিয়ে থাকব।...রাজনৈতিক ভাবে, বিশেষত বৈপ্লবিক রাজনীতি ও সংস্কৃতির জায়গায় দাঁড়িয়ে বাংলার ভাবান্দোলনকে নতুন করে বোঝা ও বিচারের কাজ মোটেও সহজ কাজ নয়। কিন্তু সেই দিকেই আমাদের আগ্রহ' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৩৪)।

১০। কুলি লেখেন, In cooperation with Zia al Haqus military and intelligence services, the CIA, with Saudi finance as well as Pakistani logisticsal support, managed the raising, training, equipping, paying and sending into battle against the Red Army in Pakistan of a mercenary army of Islamic volunteers. Eventualy this army would be drawn not only from Arab and Muslim states everywhere, but also from minority Muslim communities in Western countries, including the United States. Many of those from the African or Asian continents were religious, political or criminal fugitives from their own governments. Others were simply soldiers of fortune. G.. In 1989, under the presidency of George Herbert Bush (1989-1993), the CIA celebrated its victory with champagne. Nevertheless, the Holy alliance of the Americans and the Islamist forces against the Russians in South and Central Asia had ended in a series of distinctly unholy clan and tribal wars, affecting much more than the ex-Soviet Union. Afghanistan itself lay in ruins, wasted by the jihad. Its society and people were ravaged by drug, poverty, and horrific war injuries from fighting and landmines. (Cooley, J., 2002, *Unholy Wars: Afghanistan, America and International terrorism*, London: Pluto Press).

১১। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল মার্ক্সবাদকে পূর্ণতা দেওয়া; সেই কাজে বিশেষ করে মার্ক্সের সঙ্গে ফ্রয়েডের মিশ্রণ ঘটিয়ে এক বিশেষ সমালোচনাধর্মী তত্ত্ব সৃষ্টি করা। তবে সেই প্রকল্প দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের ইহুধি নিধনকে তত্ত্বগতভাবে বোঝা

কঠিন ছিল। এনলাইটেনমেন্টের প্রভাবে যেখানে সমাজ জীবন নির্মিত, সেখানে কীভাবে সম্ভব হলো এই ধরনের বর্বরতার। এর কারণ অনুসন্ধানে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল বিশেষভাবে মেক্স ভেবারের ইনস্ট্রুমেনটাল র‍্যাশনালিটির ওপর জোর দেয়। দেখা যায় যে উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে ফরমাল র‍্যাশনালিটি ইতিমধ্যে মূল্যবোধের ওপর প্রভুত্ব সৃষ্টি করেছে। তবে ভেবার এই প্রভুত্বকে কেবল রাষ্ট্রকাঠামো এবং ক্ষমতাকাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন কীভাবে রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্র প্রজ্ঞাভিত্তিক চিন্তাকে পারপোসিভ র‍্যাশনালিটি-এর পর্যায়ে রেখে তাকে সমাজের মূল্যবোধ বা কী ধরনের সমাজ ভালো বা মন্দ সে ধরনের কোনো ব্যবস্থাপত্র অনুমোদন করে না। মজহার ভেবারের তত্ত্বের পার্থক্যকে বিশেষ গুরুত্ব না দেওয়ায় তাঁর কাছে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা আধ্যাত্মিকতাহীনতার অভিযোগে অভিযুক্ত হন, অনেকটা ভুল বুঝে বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে।

১২। ওই একই চিন্তাকে আরও একটু কঠোরভাবে তুলে ধরে তিনি লিখেছেন, 'কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদীর এই পশ্চাতপদ ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি থেকে আমাদের শিক্ষা নেবার দরকার আছে।...এই শেকড়হীনতার মধ্যে আমরা বাংলাদেশের জন্য ভয়ানক বিপদ দেখি। বাহ্যিক জৌলুস ও ডামাডোলের পেছনে নিজের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে এই ধারার নিজেরই এক করুণ ও পরাজিতের উপলব্ধি আছে। বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি বা সংখ্যাগরিষ্ঠের চিন্তাচেতনায় ও রাজনীতিতে তার আর স্থান হবে না। যার কারণে তাকে টিকে থাকতে হবে অনিবার্য ভাবেই জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ারের 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' স্থানীয় বরকন্দাজ হয়ে। ইসলামের বিরুদ্ধে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র সিভিলাইজিং মিশন হওয়া ছাড়া বাংলাদেশে তার আর কোন সাংস্কৃতিক বা ভাবগত ভূমিকা রইল না। আফসোস। ইসলামী জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড পরিচালনার মধ্যেই সে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে এখন বদ্ধপরিকর' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৩৭)।

গ্রন্থপঞ্জি

Sen, Amryta. 2006. *Identity and Violence: Illusion of Destiny*. New York: W.W.Norton.

Firestone, R. 1999. *Jihad: The Origin of Holy War in Islam*. Oxford: Oxford University Press.

Cooley, J. 2002. *Unholy Wars: Afghanistan, America and International Terrorism*. London: Pluto Press.

Lyotard, J. F. 1984. *The Postmodern Condition*. Manchester University Press, Manchester.

মজহার, ফরহাদ। ২০০৮। *ভাবান্দোলন*। ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স।

মজহার, ফরহাদ। ২০০৬। *মোকাবেলা*। ঢাকা, বাংলায়ন।

মজহার, ফরহাদ। ২১ জানুয়ারি ২০১৪। 'খালেদার জয়-পরাজয়,' *চিন্তা* (ওয়েব থেকে নেওয়া)।

নবধারার নাগরিক আন্দোলন : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ

মহিউদ্দিন আহমদ

সারসংক্ষেপ : সিভিল সোসাইটি বা নাগরিক সমাজের ভূমিকা নিয়ে বাংলাদেশে নানা-তর্কবিতর্ক রয়েছে। এ প্রবন্ধে সিভিল সোসাইটি বা নাগরিক সমাজ ধারণার উৎপত্তি, বিবর্তন ও প্রয়োগের জায়গা থেকে সাম্প্রতিক বিশ্বব্যবস্থায় অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্র ও বাজারের বাইরে এই তৃতীয় শক্তিটির সিভিল সমাজের ভূমিকা বাংলাদেশে কী, সেটির একটা চিত্র এখানে পাওয়া যায়। তাত্ত্বিকভাবে নাগরিক সমাজের ধারণাকে ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী এর প্রায়োগিক উদাহরণের মাধ্যমে প্রবন্ধটি নাগরিক সমাজের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত এবং বর্তমানে কোন অবস্থায় রয়েছে, তার একটা পার্থক্য খুঁজে পেতে পাঠকদের সহায়তা করবে।

মুখ্য শব্দ : রাষ্ট্র, সিভিল সোসাইটি, বিশ্বায়ন, সামাজিক আন্দোলন, হেজিমনি, বঞ্চনা, নারীবাদী আন্দোলন।

প্রারম্ভিক কথা

ইংরেজি ভাষায় 'সিভিল সোসাইটি' বলতে যা বোঝায়, তার ভাষান্তর 'সুশীল সমাজ' নানান প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এটাকে বরং জনসমাজ বা নাগরিক সমাজ বললে সিভিল সোসাইটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের অনেক কাছাকাছি যাওয়া যায়। সমাজে সবচেয়ে ক্রিয়াশীল এবং প্রভাবশালী দুটো শক্তি কেন্দ্র আছে। একটা হলো 'রাষ্ট্র', অন্যটা 'বাজার'। এর বাইরে একটি তৃতীয় শক্তি, স্রোত, ধারা অথবা প্রবণতা যা-ই বলা হোক না কেন, তার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। এই ধারা যত বেগবান হয়, যত সংহত হয়, যত প্রকাশমান হয়, ততই তার শক্তি উপলব্ধি করা যায়। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে, সচেতনভাবে এবং স্বেচ্ছায় জড়ো হয়ে একটা বুদ্‌বুদ বা ঢেউ তোলার প্রয়াস পায় যে জনগোষ্ঠী, সহজ কথায় তা হলো সিভিল সোসাইটি। আমি এর ভাষান্তর করতে চাই নাগরিক সমাজ হিসেবে। এর মধ্যে সুশীল-কুশীল উভয়ই থাকতে পারে। যেমন রাষ্ট্রের নিয়ামক শক্তি হতে পারে সাধারণ মানুষ এবং তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অথবা একটি সামরিক জান্তা। তেমনি বাজার দায়িত্বশীল ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে, অথবা তা মাফিয়া চক্রের পকেটেও ঢুকে যেতে পারে। নাগরিক সমাজেও তেমন মিশেল থাকাটা বিচিত্র নয়। 'ওয়ার্ল্ড অ্যালায়েন্স ফর সিটিজেন পার্টিসিপেশন' নাগরিক সমাজের একটা সহজ সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে : পরিবার, রাষ্ট্র এবং বাজারের বাইরে নিজেদের স্বার্থ তুলে ধরার জন্য সমবেত হওয়া।[১] এর আওতায় কারা থাকবে তা নিয়েও মতভেদ আছে।

নাগরিক সমাজে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য সম্মিলনগুলোর মধ্যে আছে বিদ্বজ্জন (অ্যাকাডেমিয়া), দাতব্য প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও), স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন রকমের সামাজিক আন্দোলন (মানবাধিকার, জেন্ডার, পরিবেশ, শান্তি ইত্যাদি)।[২] মোদ্দা কথা হচ্ছে, জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশের এসব সম্মিলন বা সংগঠন রাষ্ট্রশক্তির বা রাষ্ট্র পরিচালনাকারী সরকার বা রাজনৈতিক দলের প্রতিপক্ষ নয়, তাদের পক্ষভুক্ত নয়।

সিভিল সমাজের ধারণা ও দর্শন বেশ পুরোনো।[৩] এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে নাগরিক, নাগরিকত্ববোধ এবং রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বমূলক অবস্থান। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, এই দর্শন মূলত ইউরোপীয়। এ ক্ষেত্রে আমরা সক্রেটিসের উদাহরণ উল্লেখ করতে পারি। তিনি একটা ভালো সমাজ চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সমাজের মধ্যকার ঝগড়াঝাঁটি যৌক্তিক সংলাপের মধ্য দিয়েই মিটমাট হোক। এই সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে তিনি সত্যের সন্ধান করেছেন। যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়েই সমাজ অগ্রসর হবে, রাজনীতি ক্রমশ সভ্য ভব্য হবে এবং মানুষ উন্নত জীবনের অধিকারী হবে, এই ছিল তাঁর বক্তব্য।

আমাদের এই অঞ্চলে নাগরিক সমাজের বয়স নিতান্তই কম। সুলতানি আমল, মোগল আমল আর নবাবি আমলে ছিল এক ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারী শাসন, যদিও আমরা অনেক সময় ইনিয়ে-বিনিয়ে আমাদের শাসকদের গুণকীর্তন করে থাকি। আমাদের দেশে আধুনিক অর্থে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে। আমাদের নাগরিক সমাজের শুরু তখন থেকেই।[৪]

২.

নাগরিক সমাজের অবস্থান এবং কার্যক্রম দুনিয়াজুড়ে এখন যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, তার সঙ্গে এনার্কি তত্ত্বের সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। আমাদের সাহিত্যে এই তত্ত্বের একটা সহজ অর্থ করা হয়েছে, নৈরাজ্যবাদ। এটা অনেক সময় নেতিবাচক ধারণার জন্ম দেয়। যেন এনার্কিস্টরা রাষ্ট্র, সমাজ, আইনকানুন কিছুই মানেন না।

তাঁরা শুধু ভাঙেন, গড়েন না কিছুই। এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। নৈরাজ্যবাদ আসলে একটি অত্যন্ত ইতিবাচক রাজনৈতিক মতবাদ। ইংরেজ সাংবাদিক-ঔপন্যাসিক উইলিয়াম গডউইনকে (১৭৫৬-১৮৩৬) নৈরাজ্যবাদের প্রথম আধুনিক প্রবক্তা হিসেবে গণ্য করা হয়।[৫] তাঁর দুটো বই *An Enquiry Concerning Political Justice* এবং *Things as They Are* অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিল বিদ্রোহ। এই তন্ত্রের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য গুরু হলেন রাশিয়ার মিখাইল বাকুনিন (১৮১৪-১৮৭৬)। আজন্ম সংগ্রামী বাকুনিন তাঁর বক্তব্য অনেকটাই লিপিবদ্ধ করেছেন *Statism and Anarchy* এবং *God and the State* গ্রন্থে। কার্ল মার্ক্সের সমসাময়িক বাকুনিন মার্ক্সীয় 'সর্বহারার একনায়কত্ব' তত্ত্বের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর স্লোগান ছিল সর্বজনীন দ্রোহ, যা সব ধরনের ক্ষমতার খেলাকে দারুণভাবে চ্যালেঞ্জ করেছিল।[৬] ফলে তিনি মার্ক্স এবং তাঁর অনুসারীদের দ্বারা প্রথম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত হন। মার্ক্সীয় দর্শন, যা পরবর্তী সময়ে চূড়ান্ত রাষ্ট্রবাদিতায় রূপ পায় স্ট্যালিনের প্রায়োগিক কর্মকাণ্ডে, তা নতুন করে শৃঙ্খলিত করেছিল গরিব মানুষদের।

নৈরাজ্যবাদ তত্ত্বের ছোঁয়া আমরা দেখতে পাই খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে চীনের তাওবাদী দার্শনিক লাওৎসুর লেখায়। তাঁর সমাজদর্শনের সারকথা হলো, 'রাষ্ট্র হবে দুর্বল, সমাজ হবে সবল'।[৭] কনফুসিয়াসের মতাদর্শ ঠিক এর উল্টো, যার প্রতিফলন আমরা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোতে দেখি।

সমাজের সব ধরনের আধিপত্যবাদ বা হেজিমনির বিরুদ্ধে লাওৎসু, সক্রেটিস ও বাকুনিন সোচ্চার ছিলেন। তারই পরম্পরা আমরা দেখতে পাই বিশ ও একুশ শতকে পৃথিবীর নানা প্রান্তে নাগরিকদের সামাজিক আন্দোলনে। তাঁরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চান না, ক্ষমতার অংশীদারও হতে চান না। তাঁরা চান রাষ্ট্রকে বদলে দিতে। মূলকথা হলো, ক্ষমতার দিক থেকে রাষ্ট্র হবে দুর্বল এবং ছোট, দায়িত্ব ও সেবার দিক থেকে রাষ্ট্র হবে সবল ও বড়। রাষ্ট্র থাকবে, তবে তার সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্কে একটা র‍্যাডিক্যাল পরিবর্তন আসতে হবে। রাষ্ট্রের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য রাষ্ট্র। সংবিধানে কী লেখা আছে, সেটা বড় কথা নয়, সংবিধানের প্রয়োগটাই আসল কথা। এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রের চরিত্র বদলায়, বদলায় মানুষের চরিত্রও। এরা একে অপরের ওপর ক্রিয়াশীল। কখনো নাগরিক সমাজ, কখনোবা রাষ্ট্র, এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করে।

বিশ্বব্যাপী সামাজিক আন্দোলন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে নবরূপে আবির্ভূত হয়। এই সময়ের একটা বড় আন্দোলন হলো এনার্কা-ফেমিনিজম। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় Mujeres Libres (মুক্ত নারী) নামের একটি গোষ্ঠী নৈরাজ্যবাদ ও নারীবাদকে সমন্বিত করে পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে নারীমুক্তি আন্দোলনে সমর্পিত হয়েছিল। রাশিয়াতেও এ ধরনের আন্দোলন তৈরি হচ্ছিল। তবে তা স্ট্যালিনের

লালফৌজ বুটের তলায় থেঁতলে দিয়েছিল পুরোপুরি।[৮] এনার্কা-ফেমিনিজমের দ্বিতীয় ঢেউ আমরা দেখতে পাই ষাটের দশকে। এ সময় আমেরিকায় নাগরিক অধিকার আন্দোলন এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ নাগরিক সমাজের সম্মিলিত প্ল্যাটফর্মগুলোকে শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড় করাতে পেরেছিল।

৩.

বিশ শতকের শেষে এবং একুশ শতকের প্রথম দিকে নাগরিক সমাজের আন্দোলন নতুন মাত্রা পায় ধনবাদী বিশ্বায়নবিরোধী চরিত্র অর্জনের মাধ্যমে। এই সময়ে এক্সিস অব ইভিল বা ত্রিপক্ষীয় অপশক্তি—বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিরুদ্ধে দেশে দেশে নাগরিক সংগঠনগুলো সোচ্চার হয়ে ওঠে। শিল্পোন্নত দেশগুলোর জোট 'বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম'-এর বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজের বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম 'বিশ্ব সামাজিক ফোরাম'-এর অভ্যুদয় ঘটে। এই প্রক্রিয়ার শুরুতেই ঘটে যায় এক ঐতিহাসিক ঘটনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক সমাজ বরাবরই ন্যায়, দ্রোহ ও উত্থানের অগ্রদূত হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। এর প্রমাণ আমরা দেখি শিকাগোর হে মার্কেটে শ্রমিকদের আট ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবির আন্দোলন, বিশ্ব নারী দিবসের সূত্রপাত, ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী সবচেয়ে বড় সমাবেশ ও শোভাযাত্রার আয়োজন এবং ১৯৯৯ সালে সিয়াটলে তরুণদের সপ্তাহব্যাপী বিক্ষোভ। সিয়াটল এক নবযাত্রার উদ্ভাসন ঘটায়, যার ফলে বিশ্বায়নবিরোধী আন্দোলন আরও বেগবান হয়। এর প্রমাণ আমরা পরবর্তী সময়ে দেখি রোম, কানকুন, হংকংয়ে।

সিয়াটলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের এই সম্মেলনে যে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সমতা ও ন্যায্যতার আন্দোলন। এর ধারাবাহিকতায় প্রথম বিশ্ব সামাজিক ফোরাম (ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরাম) আয়োজন করা হয় ব্রাজিলের পোর্তো এলেগ্রে শহরে, ২০০১ সালের জানুয়ারি মাসে। শিল্পোন্নত দেশগুলোর সম্মেলন 'বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম'-এর সমান্তরাল একটি নাগরিক বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বিশ্ব সামাজিক ফোরাম বিবেচিত হয়ে আসছে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম) সুইজারল্যান্ডের জেনেভাভিত্তিক একটি 'অলাভজনক' ফাউন্ডেশন। দাভোস শহরে এরা প্রতিবছর একটা সভার আয়োজন করে থাকে। জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসনের অধ্যাপক ক্লস শাব (Klaus Schwab) ১৯৭১ সালে এই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। জন্মসূত্রে তিনি জার্মানি। প্রথমে এই ফোরামের নাম ছিল 'ইউরোপিয়ান ম্যানেজমেন্ট ফোরাম'। পশ্চিম ইউরোপের ধনবাদী দেশগুলো থেকে আমন্ত্রিতরা

এর বার্ষিক সভায় যোগ দিতেন। ১৯৮৭ সালে এর রূপান্তর ঘটে, নাম হয় ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয় এই ফোরামে। বর্তমানে বিশ্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী কুশীলবেরা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

শিল্পোন্নত দেশগুলোর জোট জি-৭, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সমালোচনা শুরু হয় ১৯৯০ সাল থেকেই। সমালোচনা ছিল যে এই সংস্থাগুলো ধনবাদী বিশ্বায়নের মাধ্যমে পরিবেশ ধ্বংস করছে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বাড়াচ্ছে। 'বিশ্বায়ন' যদিও একটা আগ্রহজাগানিয়া শব্দ, নোয়াম চমস্কির ভাষায়, এটা হলো সুবিধাভোগী এলিট লগ্নিকারীদের একটা আঁতাত। বিশ্বায়ন হলো তাদের একটি বিকৃত প্রচার। যাঁরা এর বিরোধী, তাঁরা সত্যিকার অর্থে বিশ্বায়নবিরোধী নন। তাঁরা হলেন আধিপত্যবাদবিরোধী। কেননা বিশ্ব সামাজিক ফোরামে অংশগ্রহণকারীরাও বিশ্বায়নের পক্ষে। তবে সেটা পুঁজি লগ্নিকারীদের স্বার্থে বাজার দখলের বিশ্বায়ন নয়।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বিরুদ্ধে প্রথম বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় ২০০০ সালে। এক হাজার মানুষ দাভোস শহরে মিছিল করে একটা ম্যাকডোনাল্ড দোকানের জানালার কাচ ভাঙচুর করে। হাজার হাজার পুলিশ দিয়ে আলপাইনের সম্মেলন কেন্দ্র থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়। সুইজারল্যান্ডের অন্যান্য শহরেও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

শুরু হয় নতুন চিন্তাভাবনা। নাগরিক সমাজের একটা বৈশ্বিক সম্মেলনের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল অনেক দিন ধরেই। বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের বার্ষিক সভা হয় প্রতিবছর সেপ্টেম্বরে। সে সময় বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন সমান্তরাল বা পাল্টা কর্মসূচি দিয়ে থাকে একই শহরে। এই উদ্যোগগুলো হয় ছোট আকারে এবং তার একটা তাৎক্ষণিক প্রভাব সম্মেলনস্থল ছাড়া অন্য কোথাও, অন্য সময় দেখা যায় না। এ রকম একটা প্রেক্ষাপটে বিশ্ব সামাজিক ফোরাম বা ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরামের পরিকল্পনা করা হয়। মূল উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন ওদেদ গ্রাজো, চিকো হোয়াইটকার ও বার্নাড ক্যাসেন। ফোরাম অনুষ্ঠিত হলো ব্রাজিলের পোর্তো এলেগ্রে শহরে ২০০১ সালের ২৫-৩০ জানুয়ারি। ফোরাম আয়োজনে সর্বাত্মক সহযোগিতা করল নগরের স্থানীয় সরকার এবং ব্রাজিলের ওয়ার্কার্স পার্টি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ১২ হাজার নাগরিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করলেন। ব্রাজিলে এ সময় রাজনৈতিক পরিবর্তনের ঢেউ আছড়ে পড়ছিল। ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা লুই ইনাসিও লুলা দ্য সিলভা পরবর্তী সময়ে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। সারা দক্ষিণ আমেরিকায় পরিবর্তনের

হাওয়া লাগে। নয়া উদারবাদবিরোধী সামাজিক আন্দোলনগুলো একে একে সংহত হয় আর ক্ষমতার পালাবদল ঘটে পেরু, আর্জেন্টিনা ও চিলিতে। ভেনেজুয়েলায় তো রীতিমতো বিপ্লব ঘটে যায় হুগো শাভেজের ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে। লাতিন আমেরিকার 'বানানা রিপাবলিকগুলো' যেন নিমেষেই সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরাম নাগরিক সমাজের জন্য এক নতুন দিকের সূচনা করে, তাদের জন্য তৈরি করে এক ব্যতিক্রমী প্ল্যাটফর্ম। এখানে কোনো সভাপতি নেই, কোনো সমন্বয়ক নেই, কোনো নির্বাহী কমিটি নেই। একমত হওয়ার প্রয়োজনও নেই। নয়া উদারবাদী ও আধিপত্যবাদী বৈশ্বিক অর্থনীতি ও বাণিজ্যনীতির বিরুদ্ধে যারা সোচ্চার, তারা সবাই এই প্ল্যাটফর্মে অংশ নেওয়ার অধিকারী। এটা হলো বিশ্বের নাগরিক সমাজের এক সম্মিলনস্থল, পয়েন্ট অব কনভারজেন্স, যেখানে সবাই এককাট্টা হয়ে আওয়াজ তোলেন, অ্যানাদার ওয়ার্ল্ড ইজ পসিবল, যুদ্ধবাজ নিপাত যাক, মানুষে মানুষে এবং দেশে দেশে বৈষম্যের অবসান হোক, দারিদ্র্য ও বৈষম্য সৃষ্টিকারী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বদলাতে হবে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মোড়লিপনা চলবে না। এই ফোরামের চেষ্টা ছিল আগ্রাসী পুঁজিবাদ এবং কমিউনিস্ট মৌলবাদের বিরুদ্ধে একটি নতুন ধারা তৈরি করা।

ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরাম একটি অহিংস সামাজিক ধারণা ও আন্দোলন। প্রথাগত বিক্ষোভের ভাষা প্রয়োগের কোনো সুযোগ নেই এখানে। ২০০১ সালে অবশ্য এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল, যার ফলে একটা নেতিবাচক প্রচার হয়েছিল এই ফোরাম সম্পর্কে। ২৬ জানুয়ারি একদল অংশগ্রহণকারী বহুজাতিক বায়োটেকনোলজি করপোরেশন 'মনসান্তো'র একটি পরীক্ষামূলক প্ল্যান্টেশন আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়।

ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরাম ১১ বছর অতিক্রম করল। প্রায় প্রতিবছর এই সম্মেলন হয়। কখনো বৈশ্বিক, কখনো বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে। একটি প্রক্রিয়া যখন দীর্ঘদিন ধরে চলে, তাতে ঘুণ ধরে যায়। অনেক আগাছাও জন্মায়। এ ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছে। সামাজিক আন্দোলনগুলো নেপথ্যে চলে যাচ্ছে। তার জায়গা দখল করে নিচ্ছে আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল ও প্রভাবশালী এনজিওগুলো। সমাজের এই বৈশ্বিক প্রক্রিয়া, যার প্রাণশক্তির জোগান দিত সামাজিক আন্দোলনগুলো, আজ তা অনেকাংশেই অন্তর্হিত। করপোরেট এনজিওগুলো চলে এসেছে সামনের সারিতে। সম্মেলনের চরিত্র পাল্টে যাচ্ছে।

৪.

বৈশ্বিক রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন মুছে যাওয়ার পর থেকেই সারা দুনিয়ায় 'গণতন্ত্রের' জয়জয়কার। পুঁজিবাদী দুনিয়া এটা বোঝাতে চাইছে,

পুঁজিবাদের বিকল্প নেই। রাজনৈতিক ব্যবস্থাপত্র হিসেবে 'গণতন্ত্র'ও অদ্বিতীয়। একসময় যারা সামরিক জান্তার কাঁধে বন্দুক রেখে পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করত, আজ তারা কৌশল পাল্টে ফেলেছে। ঠান্ডা যুদ্ধের শেষ লগ্নে এসে তারা তাদের তৈরি দৈত্যগুলো বোতলে ভরে ফেলেছে। দৃশ্যপট থেকে ভিখিরির মতো একে একে বিদায় নিয়েছেন রেজা শাহ্, মার্কোস, সুহার্তো। পৃষ্ঠপোষকদের কাছে তাঁদের প্রয়োজন তত দিনে ফুরিয়ে গেছে। সে সময় ওই দেশগুলোতে রাজনৈতিক আন্দোলন এবং নাগরিক অধিকার আন্দোলন প্রবহমান ছিল, পাশাপাশি ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো একধরনের র‍্যাডিক্যাল ভূমিকা পালন করেছিল। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণজোয়ারে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ইরান ও ইন্দোনেশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ধর্মীয় পুনর্জাগরণের মাধ্যমে ভাষা খুঁজে পেল। ফিলিপাইনে চার্চের আন্দোলন ছিল অসামান্য। একদিকে কমিউনিস্ট আন্দোলন, অন্যদিকে কার্ডিনাল সিনের নেতৃত্বে গির্জার অনড় অবস্থান। ফলে মার্কোসকে দেশ ছেড়ে পালাতে হলো। শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর একক প্রচেষ্টায় এই পরিবর্তনগুলো হয়তো হতো না। দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপট একটু ভিন্ন। এখানে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক ও প্রতিক্রিয়াশীল। তাই দেখা যায়, গণমানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তারা প্রায় সব সময় জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

সামাজিক আন্দোলনের নানা ধরন। এগুলোকে রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখা সম্ভব হয় না। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হয়েও নাগরিক সংগঠনগুলো বিশেষ একটা রাজনৈতিক অবস্থান বা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে। অদলীয় রাজনীতির ধ্যানধারণা নতুন নয়। দল না করেও রাজনীতি করা যায়, রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে জনসম্পৃক্ত হওয়া যায়।

৫.

সামাজিক আন্দোলনের জমি তৈরি হয় বঞ্চনা আর ক্ষোভ থেকে। কেউ যদি মনে করেন তাঁর কিছু প্রাপ্য ছিল, কিন্তু তিনি তা পাচ্ছেন না, তখন এই না পাওয়ার যন্ত্রণা থেকে ক্ষোভ তৈরি হয়। একটি এলাকায় যদি সারা রাত বিজলি বাতি জ্বলে আর তার পাশের এলাকায় ক্রমাগত লোডশেডিং চলতে থাকে, তাহলে যারা বিদ্যুৎ পাচ্ছে না, তারা বিক্ষুব্ধ হতেই পারে। এটাকে আপেক্ষিক বঞ্চনা হিসেবে দেখা হয়।[৯] এই বঞ্চনা ও ক্ষোভ সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি করে। একপর্যায়ে তা সহিংস হয়ে উঠতে পারে। এমনকি পরিণতিতে বেধে যেতে পারে দাঙ্গা এবং গৃহযুদ্ধ, অপরাধতত্ত্বের ভাষায় যা হলো অন্যায়।[১০] কেননা এ ধরনের আচরণ সামাজিক প্রথা ও অনুশাসনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।[১১] একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে।

ধরা যাক, একটি নাগরিক সংগঠনের উদ্যোগে নিরাপদ পানির জন্য অথবা শিক্ষা ব্যয় কমানোর দাবিতে মিছিল বের হলো। ব্যানার-ফেস্টুনে সব দাবি-দাওয়া লেখা। একপর্যায়ে মিছিলে উত্তেজনা দেখা গেল। তারপর গাড়ি ভাঙচুর, দোকানে হামলা ও লুটপাট। আমরা এই দৃশ্যের সঙ্গে পরিচিত। আন্দোলন তখন তার চরিত্র হারায়।

তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামাকে আন্দোলন বলে চালিয়ে দেওয়া হয়, তাকে গৌরবান্বিত করা হয়। অন্যভাবে বলা চলে, আন্দোলন দানা বাঁধার আগেই দাঙ্গায় রূপান্তরিত হয়। হরতালকে এ ধরনের 'আন্দোলন' হিসেবে দেখানো যেতে পারে। যদিও একে 'গণতান্ত্রিক' কিংবা সাংবিধানিক অধিকার বলে দাবি করার লোকের অভাব নেই। সামাজিক আন্দোলনকে পেছন থেকে ছুরি মারার জন্য কায়েমি স্বার্থবাদীরা নানান ছলছুতার আশ্রয় নেয়। তার মধ্যে অন্যতম হলো অহিংস প্রতিবাদকে সহিংস দাঙ্গায় পরিণত করা। অবশ্য আবেগাশ্রয়ী হয়ে আপাতনিরীহ মানুষও এই ফাঁদে পা দেয়, উত্তেজনার বশে অন্যকে আঘাত করে। এ রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল ১৯২২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের উত্তর প্রদেশে চৌরিচৌরা নামক স্থানে। একটা পুলিশ চৌকিতে বিক্ষোভকারীরা ২২ জন পুলিশকে পুড়িয়ে মেরেছিল। গান্ধী তাৎক্ষণিকভাবে ব্রিটিশ শাসনবিরোধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন এবং তাঁর 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন এ রকম 'হত্যাগ্রহ'তে রূপান্তরিত হওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।[১২]

আপেক্ষিক বঞ্চনাতত্ত্বের উল্টো দিকে আছে প্রকৃত বঞ্চনাতত্ত্ব। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম উপাদানগুলো না পাওয়ার যন্ত্রণা থেকে ক্ষোভের জন্ম হয়। আমরা এর সঙ্গে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা মিলিয়ে দেখতে পারি। প্রচলিত অর্থে দারিদ্র্য মানে বেঁচে থাকার মৌলিক উপাদানগুলোর অভাব। এর মধ্যে আছে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে শিক্ষা, চিকিৎসা, পানি ও পয়োসুবিধা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকরভাবে অংশ নেওয়ার সুযোগ। এর সঙ্গে মৌলিক চাহিদা নীতির সাযুজ্য রয়েছে। এটা স্থান ও কালভেদে পরিবর্তিত হয়।[১৩] প্রকৃত বঞ্চনার বিষয়টি নাগরিক সমাজের এজেন্ডায় থাকলেও এ নিয়ে তেমন সামাজিক আন্দোলন নেই। যেটা আছে, তা হলো এনজিও পরিচালিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি। এনজিওগুলো নাগরিক সমাজের অংশ, যারা সঙ্গে থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নানা রকম সেবা দিয়ে থাকে। এ নিয়ে প্রকল্প আছে, আন্দোলন নেই।

১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে কোপেনহেগেনে জাতিসংঘ শীর্ষ সম্মেলনে সামাজিক উন্নয়নের জন্য ১০ দফা অঙ্গীকার ঘোষণা করেছিলেন বিশ্বনেতারা। কোপেনহেগেন ঘোষণায় সম্মতি দিয়েছিল অধিকাংশ দেশ। ২০০০ সালে দরিদ্র দেশগুলোর জন্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল বেশ ঢাকঢোল পিটিয়ে। অন্যতম

লক্ষ্য ছিল ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ন্যূনতম অর্ধেকে নামিয়ে আনা। অধিকাংশ দেশ এখনো এই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। উরুগুয়ের রাজধানী মন্টেভিডিওভিত্তিক একটি সংগঠন সোশ্যাল ওয়াচ প্রতিবছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যেখানে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা কোন দেশ কতটুকু অর্জন করতে পারল, তা পর্যালোচনা করে দেখা হয়। কিন্তু এ নিয়ে জোরালো কোনো আন্দোলন আজ পর্যন্ত কোনো দেশে দেখা যায়নি। লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার পেছনে প্রধান দুটো কারণ হলো জাতীয় সরকারগুলোর অবহেলা ও অগ্রাধিকার নির্ণয়ে ব্যর্থতা এবং অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে আর্থিক সহযোগিতা না পাওয়া।

নবধারার সামাজিক আন্দোলনতত্ত্বের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, এর নেতৃত্ব আসবে নতুন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্য থেকে, গরিবদের মধ্য থেকে নয়। পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলোতে (পোস্ট-ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমি) ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়।[১৪] এসব দেশে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের সমস্যা নেই। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যথেষ্ট হয়েছে এবং জীবনযাত্রার সাধারণ মানেরও উন্নতি হয়েছে। এসব দেশে নাগরিক সমাজের চিন্তাভাবনা, আলোচনা ও আন্দোলনের বিষয়ে বৈচিত্র্য এসেছে। তাদের এজেন্ডায় ওপরের দিকে রয়েছে মানবাধিকার, পরিবেশ ইত্যাদি। মানবাধিকার আন্দোলনে এসেছে বিষয়গত পরিবর্তন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গর্ভপাতের অধিকার, সমলিঙ্গের বিয়ের অধিকার ইত্যাদি। নারীবাদী আন্দোলনেও নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। থার্ড ওয়েভ ফেমিনিজম (১৯৮০-৯০) অনেকটাই ঝুঁকেছে রাজনীতিতে নীতিনির্ধারক পর্যায়ে নারীর অধিক হারে অংশগ্রহণের দাবিতে।

পাশ্চাত্যের উত্তর-আধুনিক সমাজের তুলনায় আমরা বেশ পিছিয়ে। আমাদের সমাজে শিল্পোন্নয়নের স্বয়ংযাত্রা শুরু হয়েছে মাত্র। জিডিপিতে কৃষির অবদান কমে গেলেও আমরা এখনো কৃষিসমাজেই বসবাস করছি। এ রকম প্রেক্ষাপটে পাশ্চাত্যের উত্তর-আধুনিক মানবাধিকার আন্দোলনের নতুন বিষয়গুলো চটজলদি চলে আসছে আমাদের দেশে। তবে তা আসছে অত্যন্ত সীমিত আকারে। কনফারেন্স কক্ষের চার দেয়ালের ভেতর কিংবা বার্ষিক প্রতিবেদনে অনেক এনজিও এলজিবিটি অধিকার নিয়ে কথা বলে। প্রকাশ্যে এসব বলার মতো পরিবেশ নেই, প্রয়োজন কতটুকু, তা নিয়েও বিতর্ক আছে। যে দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে, যে দেশে তিন-পঞ্চমাংশ মানুষ সাধারণ মানের পয়োসুবিধা থেকে বঞ্চিত, যে দেশের শিশুরা পুষ্টিহীনতায় এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে নিচে, সে দেশে সমকামী বিয়ের অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে প্রচার করার ঝুঁকি আছে।

নবধারার সামাজিক আন্দোলন বামঘেঁষা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। তত্ত্বের

দিক থেকে এর অভিযাত্রা আসলেই নয়া বাম বা নবধারার বাম। এই সংজ্ঞায়িত শব্দাবলি ষাট ও সত্তরের দশকে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে আন্দোলনের কর্মী, বিক্ষোভকারী এবং তাদের প্রণোদনা দানকারী নেতৃত্বকে বোঝাত। মার্ক্সীয় ঘরানা থেকে এরা আলাদা। হিপ্পি আন্দোলনের সঙ্গে এর যোগসূত্র ছিল।[১৫] মুশকিল হলো, পাশ্চাত্যে যা র‍্যাডিক্যাল, যা তারুণ্যের প্রতিবাদে ভরপুর, প্রাচ্যের অনেক দেশে তা অপরাজনীতি বা অপসংস্কৃতি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশগুলোর অবস্থান তাদের মধ্যে পার্থক্যের সীমা টেনে দিয়েছে। স্থান-কাল-পাত্রভেদে মানুষের পারসেপশন বিভিন্ন রকম হয়। একই বস্তু বা প্রবণতা কারও কাছে কালো, কারও কাছে সাদা। ইউরোপের সব দেশে মৃত্যুদণ্ড বিলুপ্ত হয়েছে। এশিয়ায় নেপাল ছাড়া আর সব দেশে মৃত্যুদণ্ডের বিধান আছে। উভয় ক্ষেত্রেই মানবাধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়, তবে দু রকমভাবে।

৭.

নাগরিক সমাজের তাত্ত্বিক আলোচনায় যাঁরা অবদান রেখেছেন, তাঁদের অনেকেই উঠে এসেছেন মার্ক্সীয় ঘরানা থেকে। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইতালির বিশিষ্ট রাজনীতিক-লেখক আন্তনিও গ্রামসি। গ্রামসি (১৮৯১-১৯৩৭) বিশ শতকের একজন উল্লেখযোগ্য চিন্তাবিদ। তাঁর বিখ্যাত তত্ত্ব 'সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ'-এর মূলে আছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্র কীভাবে টিকে থাকে তার আলোচনা। গ্রামসি সমাজে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। তাঁর একটা বিখ্যাত উক্তি হলো, সব মানুষই বুদ্ধিজীবী, সবাই যাঁর যাঁর মতো করে বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগ করেন, যদিও সবাই বুদ্ধিবৃত্তিক সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন না।[১৬] তাঁর মতে, বুদ্ধিজীবীদের কাজ শুধু কথা বলা নয়, তাঁরা শিক্ষা কিংবা গণমাধ্যম ব্যবহার করে আদর্শগত প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। বুদ্ধিজীবীদের কাজ জনবিচ্ছিন্ন থেকে শুধু তত্ত্ব আওড়ানো নয়, জনগণের মধ্যে থেকে, তাদের মনের কথাগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে তাদের পক্ষে উপস্থাপন করা, সনাতন ও প্রথাগত গবেষকদের মতো সূক্ষ্ম নিয়মের ছাঁচে ঢেলে থিসিস উপস্থাপন করা নয়। নবধারার এই বুদ্ধিজীবীদের তিনি বলেছেন অর্গানিক ইনটেলেকচুয়াল। তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে ক্রিটিক্যাল পেডাগজি বা পপুলার এডুকেশনের ধারণার মিল আছে, যার উদ্ভাবক হলেন ব্রাজিলের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সংগঠক পাওলো ফ্রেইরি এবং ফরাসি দার্শনিক ও লেখক ফ্রাঁয ফানো।

গ্রামসি রাষ্ট্রকে সংকীর্ণ অর্থে বিচার করেননি। তিনি একে দুই ভাগ করে দেখিয়েছেন। এক ভাগ হলো 'রাজনৈতিক সমাজ'। এর মধ্যে আছে পুলিশ, সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি, যা নিয়ন্ত্রণ করে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংগঠনগুলো। অন্য একটি ভাগ হলো 'নাগরিক সমাজ'। এর অংশ

হলো পরিবার, শিক্ষাব্যবস্থা, শ্রমিক ইউনিয়ন ইত্যাদি। এই ভাগটি হলো বেসরকারি বা রাষ্ট্রবহির্ভূত। তাঁর মতে, এই বিভাজন সম্পূর্ণ ধারণাগত, বাস্তবে এই দুইয়ের মিশেল থাকতেই পারে। গ্রামসির মতে, একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র 'শক্তি' এবং 'সম্মতি'র সমন্বয়ে পরিচালিত হয়। রাজনৈতিক সমাজ শক্তি প্রয়োগ করে এবং সম্মতির জায়গাটি হলো নাগরিক সমাজ। ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়—এ ধরনের জলো স্লোগানের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান গ্রামসির। তিনি সব ধরনের রাষ্ট্রপূজার বিরোধী, যা উদ্ভূত হয় রাজনৈতিক সমাজ থেকে। শক্তিশালী রাষ্ট্রের চিন্তা ফ্যাসিবাদের প্রকাশ ঘটায়। গ্রামসি বিশ্বাস করেন, সর্বহারা শ্রেণীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব হচ্ছে একটি সুশৃঙ্খল সমাজ তৈরি করা এবং রাষ্ট্র বিলুপ্ত হলেই নাগরিক সমাজ সত্যিকারের আত্মনিয়ন্ত্রণের স্তরে পৌঁছাতে পারবে।

গ্রামসির তত্ত্ব ও ধারণা বিশ শতকের শেষার্ধ থেকে দুনিয়াজুড়ে নাগরিক সমাজের আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ প্রণোদনা দিয়ে আসছে। গ্রামসি মার্ক্সকে অস্বীকার করেননি। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে তিনি মার্ক্সীয় তত্ত্বকে নবজীবন দান করেছেন। তাঁর তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই অগ্রসর হয়েছে ইউরো কমিউনিজমের ধারণা।[১৭] যাঁদের ইতিহাস ও সমাজচিন্তা মার্ক্স পর্যন্ত এসে থেমে গেছে, তাঁরা এই পরিবর্তনের নিয়ামকগুলো বুঝতে অক্ষম। এঁদের একটা বড় অংশ বর্তমান বিশ্বের নাগরিক আন্দোলনগুলো থেকে শুধু বিচ্ছিন্নই নয়, এর বিরোধিতাও করে থাকে। তারা সবকিছুতেই ষড়যন্ত্রের গন্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদের কালো হাত দেখতে পায়। এরাই কমিউনিস্ট মৌলবাদের ধারক ও বাহক। আমরা আশপাশে তাকালে এর দু-চারটা নমুনা দেখি।

৮.

নাগরিক সমাজের আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে নারীবাদী আন্দোলন। শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয় ১৮৭২ সালে ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডসে, ১৮৯০ সালে যুক্তরাজ্যে এবং ১৯১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে। যদিও নারী অধিকার নিয়ে কথাবার্তা চলছিল আরও আগে থেকেই। আঠারো শতককে বলা হয় 'এজ অব এনলাইটেনমেন্ট' বা আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার যুগ। এ সময় যাঁরা নারী অধিকার নিয়ে সোচ্চার ছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জেরেমি বেনথাম, মারকুই দ্য কনদোরেত, মেরি ওলস্টোনক্রাফট, ক্যাথরিন ম্যাকলে, হেদবিগ চালোতা, নর্দেন ফ্লিশট প্রমুখ।[১৮]

নারীবাদী আন্দোলনের তিনটি পর্যায় চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। প্রথম পর্যায়টি উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের গোড়ার সময়টুকু নিয়ে। এ সময় যুক্তরাজ্য, কানাডা, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, ফিনল্যান্ড এবং আরও কয়েকটি দেশে

যেসব দাবি-দাওয়া ও আন্দোলন ছিল, তা মূলত আইনি সংস্কার নিয়ে। মূল লক্ষ্য ছিল নারীর সর্বজনীন ভোটাধিকার। প্রাপ্তবয়স্ক সব নারীর ভোটাধিকার সর্বপ্রথম স্বীকৃত হয় নিউজিল্যান্ডে, ১৮৯৩ সালে। আন্তর্জাতিক নারী ভোটাধিকার জোট গঠন করা হয় ১৯০৪ সালে।[১৯] যুক্তরাজ্যে নারীরা সর্বজনীন ভোটাধিকার পান ১৯১৮ সালে এবং যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০ সালে। ইউরোপে অবশ্য প্রথম এই অধিকার পান ১৯১৩ সালে নরওয়ের নারীরা।

নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এবং তা চলে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত। এই পর্যায়ে নারী অধিকারের পরিসর আরও বিস্তৃত হয়। ভোটের অধিকার আর সম্পত্তির অধিকারের সঙ্গে যুক্ত হয় নানা ধরনের পরিবারিক ও সামাজিক বৈষম্য, যৌনতা, প্রজনন অধিকার ইত্যাদি।[২০] সিমন দ্য ব্যুয়োভর রচিত *Le Deuxieme Sexe* (the second sex) প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে। এই বই মনোজগতে রীতিমতো ঝড় তোলে। বেটি ফ্রিডম্যান লেখেন *The Feminine Mystique*, প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। এটাও ছিল নারীর সনাতন ভূমিকার বিপরীতে নারীশক্তির আবাহনের চ্যালেঞ্জ। এ সময় বিবাহজাত ধর্ষণ, তালাক, কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ইত্যাদি নিয়ে র‍্যাডিক্যাল চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটে, যা প্রচলিত মনমানসিকতার মূলে আঘাত হানে।

নারী আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ে, যার শুরু আশির দশক থেকে, দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যর্থতাগুলো অতিক্রম করার চেষ্টা চলতে থাকে। নারীবাদ আরও স্বয়ংসম্পূর্ণ তত্ত্বের মোড়কে আবির্ভূত হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় নারীত্বের উত্তর-আধুনিক ধ্যানধারণা, নারীশক্তি, ইকো-ফেমিনিজম, ট্রান্সজেন্ডার রাজনীতি ও ইতিবাচক যৌনতা। যৌনতা একই সঙ্গে নির্যাতন ও ক্ষমতার প্রতীক। এ প্রসঙ্গে পর্নোগ্রাফি এবং যৌনকর্মী সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারণার বিপরীতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করা যেতে পারে। যৌনকর্মী আর দশজন শ্রমজীবীর মতোই। সে পতিতা নয়।[২১]

নারীবাদী আন্দোলন আমাদের এই অঞ্চলে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকা পুরুষতান্ত্রিকতার ভিত তেমন নাড়াতে পারেনি। তবে জেন্ডার সমতা আন্দোলন, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে, বেশ গতিশীল। নাগরিক সমাজের উদারবাদী অংশ এটাকে মানবাধিকার আন্দোলনের সহজাত অনুষঙ্গ হিসেবে দেখে। তবে এর প্রতি বিরূপ জনগোষ্ঠী তুলনামূলকভাবে অধিক শক্তিশালী। এ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক উদারবাদীদের সঙ্গে গোঁড়া জনগোষ্ঠীর আঁতাতও বেশ স্পষ্ট। ভোটের রাজনীতিতে উদারবাদ তেমন সোচ্চার হতে পারে না। পদে পদে তাকে আপস করতে হয়।

বেগম রোকেয়া প্রায় শত বছর আগে যে র‍্যাডিক্যাল নারীবাদী লেখা লিখেছেন, তা আজও প্রাসঙ্গিক। কিন্তু সমাজ এখনো অনগ্রসর এবং তাত্ত্বিক আলোচনা এখনো রোকেয়াকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।

৯.

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নাগরিক সমাজের আন্দোলন এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছিল তুঙ্গে। এগুলো একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সহযাত্রী ছিল, অন্যদিকে তা ছিল নয়া উদারবাদী রাজনীতির প্রচণ্ড সমালোচক। রাজনীতিকেরা যখন তাঁদের সাংবিধানিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত পাকাপোক্ত করার জন্য নির্বাচনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন, নাগরিক সংগঠনগুলো তখন আরও গভীরে গিয়ে কাঠামোগত সংস্কারের জোরালো দাবি তোলে এবং নাগরিকদের সংগঠিত করার প্রয়াস পায়।

থাইল্যান্ডে রেড শার্ট আন্দোলন ছিল ক্ষমতাসীন রাজতন্ত্র ও সামরিকতন্ত্রের আঁতাতের বিরুদ্ধে নয়া উদারবাদী রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ। এর বিপরীতে থাই তরুণদের সাইবার গণতন্ত্রের আন্দোলন ছিল অনেক শাণিত। তারা সামরিকতন্ত্র ও সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করছিল ইন্টারনেট মিডিয়ার মাধ্যমে।[২২]

যেসব দেশ ঠান্ডা যুদ্ধের বলি হয়েছে সবচেয়ে বেশি, তার অন্যতম হলো কোরিয়া। আমরা যেমন ভোট দিয়ে ভারত ভাগ করেছিলাম, তারা তা করেনি। এর বিরুদ্ধে জনমনে ক্ষোভ ছিল বরাবরই। কিন্তু তা কখনোই সহিংস হয়ে ওঠেনি। দক্ষিণ কোরিয়ায় অনেকগুলো নাগরিক সংগঠন আছে, যারা একত্রীকরণের শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে।[২৩] তরুণ প্রজন্মের মধ্যে শান্তির অন্বেষণ বাড়ছে, বাড়ছে দুই কোরিয়ার মিলনের আকাঙ্ক্ষা। এটা এখন সময়ের ব্যাপার।

কোরিয়ায় আরেকটি নাগরিক আন্দোলন বেশ জোরালো। ২০০০ সালের গোড়ার দিকে কোরিয়ার একদল পরিবেশবাদী ও নারী সংগঠন একজোট হয়ে দুর্নীতিবিরোধী প্রচার ও আন্দোলন শুরু করে। এর নাম ছিল নাকচন-নাকসন বা কালো তালিকা বানানোর আন্দোলন। তারা সমাজের উঁচুতলার অনেক দুর্নীতিবাজ রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীর একটা তালিকা তৈরি করে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলে। তাদের একটি প্রধান দাবি ছিল, দুর্নীতিবাজদের নির্বাচনে যাতে মনোনয়ন না দেওয়া হয়। এ জন্য তারা প্রচুর চাপ সৃষ্টি করে। এটার ইংরেজি নাম হলো Civil Action for General Election। আন্দোলনটি সফল হয়। কালো তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের ৬৯ শতাংশই নির্বাচনে পরাজিত হয়। সিউল মহানগরে এসব পরাজিত প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৯৫ শতাংশ।[২৪]

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ঋণগ্রস্ত দেশগুলোর একটি হলো ফিলিপাইন। দুর্নীতির কারণেই এই ঋণগ্রস্ততা। ফিলিপাইনের নাগরিক সংগঠনগুলোর একটি জোট Freedom from Debt Coalition সেসব ঋণ, যা স্বৈরাচারী মার্কোস সরকারের আমলে নেওয়া হয়েছিল, তার দায় একতরফাভাবে বাতিল করে দেওয়ার জন্য

জনমত সংগ্রহ করে এবং সরকারের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। দায় বাতিল হয়নি। কিন্তু ফিলিপাইনের সিনেটে তারা একটা কমিটি করতে সক্ষম হয়, যারা বৈদেশিক ঋণের নেতিবাচক দিকগুলো পরীক্ষা করে দেখবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঋণ আর না নেওয়া হয়, এ ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবে।[২৫]

১০.

বাংলাদেশে নাগরিক সমাজের বিকাশ আর এ দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান একই সময়ের। তবে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী যত না অর্থনৈতিক মধ্যবিত্ত, তারা চেয়ে অনেক কম হলো সাংস্কৃতিক মধ্যবিত্ত। ফলে এ দেশে নাগরিক সমাজের আন্দোলনে তেমন ধারাবাহিকতা নেই, প্রভাব-প্রতিপত্তিও কম।

১৯৪৮-৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে বলা যায় এ দেশের নাগরিক সমাজের প্রথম আন্দোলন। এ আন্দোলন ছিল মূলত সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে, যার চরিত্র ছিল রাজনৈতিক। কিন্তু নেতৃত্ব ছিল ছাত্র-শিক্ষক-সাংস্কৃতিক কর্মীদের হাতে। অংশগ্রহণও ছিল তাঁদের বেশি।

নাগরিক সমাজের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য আন্দোলনটি ছিল অনেকটা সাংগঠনিক ও প্রচারধর্মী। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে নাগরিক সমাজের একটা অংশ একত্র হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তখন আত্ম-আবিষ্কারের বর্ম। এর উপজাত ফসল হলো ছায়ানট, যা এ দেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় নতুন মাত্রা যোগ করেছিল।

সাংস্কৃতিক উপনিবেশবাদের মাধ্যমে পাকিস্তানি এসটাবলিশমেন্ট বাঙালিকে আঘাত করার জন্য বেছে নিয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে তথ্য ও বেতারমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের রবীন্দ্রবিরোধী মন্তব্য উসকে দিয়েছিল বিতর্ক। বাঙালি নাগরিক সমাজের অগ্রগণ্য কয়েকজন সদস্য নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে এর প্রতিবাদে তাৎক্ষণিকভাবে একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তাঁরা সরকারি গণমাধ্যমে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জনের প্রতিবাদ করেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষর দেন মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা, কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, জয়নুল আবেদিন, এম এ বারী, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, খান সারওয়ার মুরশিদ, সিকান্দার আবু জাফর, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আহমদ শরীফ, নীলিমা ইব্রাহিম, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, ফজল শাহাবুদ্দিন, আনিসুজ্জামান, রফিকুল ইসলাম ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। বিবৃতিটি ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে নাগরিক সমাজের মধ্যে নানা রকম আলোচনা হতে থাকে। সরকারি নীতির প্রতিবাদে ঢাকায় কয়েকটা মিছিল হয়।[২৬]

এ সময় জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীন সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং র‍্যাডিক্যাল চিন্তাভাবনার এক অপূর্ব সম্পর্কের স্ফুরণ ঘটে বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে কবিতায়। ১৯৭০ সালে *সমকাল* পত্রিকায় আল মাহমুদের 'সোনালী কাবিন'-এর ১৪টি সনেট ছাপা হয়।। এ রকম কবিতা এ দেশে আগে কেউ লেখেননি।

আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বণ্টন
পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণীর উচ্ছেদ
এমন প্রেমের বাক্য সাহসিনী করো উচ্চারণ
যেন না ঢুকতে পারে লোকধর্মে আর ভেদাভেদ।

নতুন প্রজন্মের এক ঝাঁক কবির আবির্ভাব হলো। এঁরা চালচলনে বোহেমিয়ান, চোখে পৃথিবী পাল্টে দেওয়ার স্বপ্ন। এঁদের মধ্যে আছেন নাসিরুল ইসলাম বাচ্চু, নির্মলেন্দু গুণ, মাশুক চৌধুরী, হুমায়ুন কবির, সাবদার সিদ্দিকী প্রমুখ।

স্বাধীন বাংলাদেশে নাগরিক সমাজের আন্দোলনের প্রথম সংগঠিত প্রকাশ দেখা যায় ১৯৭৪ সালে, যখন রাজনৈতিক অঙ্গন ছিল উত্তপ্ত। অধ্যাপক আহমদ শরীফের নেতৃত্বে পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একটি নাগরিক কমিটি হয়েছিল। নাগরিক কমিটি নাম দিয়ে অরাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে বিশেষ কিছু দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনের সম্ভবত এ দেশে এটাই প্রথম উদ্যোগ।

দেশে নারী অধিকার আন্দোলনে অগ্রপথিকের ভূমিকায় যে নাগরিক সংগঠনটি সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে, তার নাম বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ নামে এটি জন্ম নেয় ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল। এর সদস্যসংখ্যা প্রায় ৭৫ হাজার। সাংবিধানিক সংস্কার, ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড, যৌতুকের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান, জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন, এসব ক্ষেত্রে এ দেশে যা কিছু অর্জন, তাতে মহিলা পরিষদের ভূমিকা অনন্য।[২৭]

পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন আন্দোলনে কতিপয় নাগরিক সংগঠন জোরালো ভূমিকা রাখছে। এ ক্ষেত্রে প্রথম সফল আন্দোলনের রূপকার ছিলেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি অল্প কয়েকজনকে সঙ্গী করে ওসমানী উদ্যানে গাছ কেটে সম্মেলন কেন্দ্র বানানোর সরকারি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। কোনো দাতা সংস্থার অনুদান ছাড়া নিজেদের শ্রম, ঘাম দিয়ে এ রকম একটি আন্দোলন সফল করে তোলার উদাহরণ সম্ভবত এটাই প্রথম। তখন স্লোগান ছিল, নাগরিকদের জন্য খোলা জায়গা চাই, মুক্ত পরিবেশ চাই, বিশুদ্ধ বাতাস চাই। এই আন্দোলনের ফলে প্রস্তাবিত সম্মেলন কেন্দ্রটি (বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র) শেরেবাংলা নগরে স্থানান্তরিত হয়।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন এ রকম আরেকটি প্রয়াস, যা শুরু হয়েছিল বুড়িগঙ্গা নদীকে দখল ও দূষণমুক্ত করার জন্য। বিভিন্ন পেশাজীবীদের সমন্বয়ে

গড়ে ওঠা এই জোট প্রায় ১০ বছর ধরে প্রচার চালিয়ে আসছে, কিন্তু কাজের কাজ তেমন হয়নি। এই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেকেই সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আছেন, এমনকি সরকারের মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছেন। তাঁদের সামাজিক দায়বদ্ধতা একপর্যায়ে এসে আপসের চোরাগলিতে হারিয়ে গেছে।

এ ছাড়া অনেক সামাজিক আন্দোলনে বিভিন্ন পেশার মানুষ সমবেত হচ্ছেন, অংশ নিচ্ছেন। উদাহরণ হিসেবে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়। কিন্তু এসব আন্দোলনের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বিদেশ থেকে আর্থিক সহযোগিতা পাওয়া এনজিওগুলো।

এ দেশে এনজিওগুলোর যেমন অনেক ইতিবাচক ভূমিকা আছে, তেমনি আছে এমন সব কাজ, যার সঙ্গে সামাজিক শক্তিগুলোকে সংঘবদ্ধ করার কোনো প্রচেষ্টা নেই। তাঁরা নাগরিকদের সংগঠিত করেন না। তাঁরা তাঁদের নির্ধারিত প্রকল্প বাস্তবায়ন করেন। তাঁদের জবাবদিহিও থাকে দাতা সংস্থা এবং নিজস্ব সংস্থার পরিচালকমণ্ডলীর কাছে। এসব এনজিওর অনেকেই সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট, আবার অনেকে দাতা সংস্থার অনুগ্রহপুষ্ট। এদের বলা হয় পেটোয়া সংস্থা।

স্থানীয়ভাবে অর্থ সংগ্রহ করে জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার উদাহরণ আমাদের দেশে খুব বেশি নেই। এ দেশে একসময় অ্যাসিড-সন্ত্রাস খুব বেড়ে গিয়েছিল। সন্ত্রাসের শিকার হতো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নারী। এটা চরমে পৌঁছে ২০০২ সালে। ১৯৯৯ সালে দাতা সংস্থার অনুদানে যাত্রা শুরু করে অ্যাসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন। পরের বছর (২০০০) এক দিনের বেতন দান করে *প্রথম আলোর* সাংবাদিক কর্মীরা প্রথম আলো সহায়ক তহবিল তৈরি করেন। গণমাধ্যমে প্রচার ও অন্যান্য সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অ্যাসিড-সন্ত্রাসবিরোধী প্রচার জোরদার হয়, নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ে। *প্রথম আলোর* তহবিলে বিভিন্ন ব্যক্তি ও করপোরেট সংস্থা আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। ফলে তাদের পক্ষে সম্ভব হয় অ্যাসিড-আক্রান্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনে সাহায্য করা।[২৮] ক্রমাগত প্রচারণার ফলে সরকার অ্যাসিড-সন্ত্রাসবিরোধী আইন পাস করে ২০০২ সালে। এর পর থেকে অ্যাসিড-সন্ত্রাস হ্রাস পেতে থাকে, যদিও তা এখনো নির্মূল করা সম্ভব হয়নি।

আরেকটি দেশজ আন্দোলনের উদাহরণ হলো তেল-গ্যাস-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির কার্যক্রম। জাতীয় সম্পদ, বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদ যাতে দেশের মানুষের প্রয়োজনে লাগে, এগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে যাতে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়ে। এ জন্য তারা ধারাবাহিকভাবে প্রচার ও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এ কাজে তারা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসেরও শিকার হয়েছে।

বাংলাদেশে নাগরিক সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো বেসরকারি

সেবামূলক ও উন্নয়ন সংস্থাগুলো, যারা এনজিও নামে পরিচিত। এরা অনেকেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্রঋণসংক্রান্ত সেবা দিয়ে থাকে, যার মূল দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র তার ম্যান্ডেট অনুযায়ী কাজ করে না বলেই এনজিওগুলো সেবা খাতে বড় ভূমিকা রাখতে পারছে। রাষ্ট্রের কাছ থেকে সেবা আদায় করে নেওয়ার জন্য জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত করা হলে হয়তো রাষ্ট্রের চরিত্র বদলানো যেত এবং সমাজে গুণগত পরিবর্তন আসত। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। এনজিওগুলো কখনো সহায়ক, কখনো বা প্রতিযোগী হিসেবে সরকারের পাশাপাশি কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের আমলাতন্ত্র, অস্বচ্ছ আচরণ ও দুর্নীতির কারণে শিল্পোন্নত দেশগুলো তাদের অনুদান এনজিওগুলোর মাধ্যমে প্রবাহিত করতে পছন্দ করে। ফলে ওই দেশগুলোর সরকার ও নাগরিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে এ দেশের এনজিওগুলোর একটা পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এদের কার্যক্রমে সরকার অনেক সময় বিদেশি হস্তক্ষেপের অভিযোগ করে থাকে।

১১.

বঞ্চনা আর অত্যাচার থেকে ক্ষোভের জন্ম হয়, মানুষ বিদ্রোহী হয়। সমাজে বিদ্রোহ আপনাআপনি সংগঠিত হয় না। এ জন্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে হয়। যারা এই ভূমিকা পালন করে, মানুষের কল্যাণই তাদের লক্ষ্য।

১৮৩৫ সালের আগস্ট মাসে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় কার্ল মার্ক্স একটি রচনা লিখেছিলেন। রচনার শিরোনাম: একজন তরুণ পেশা নির্বাচন করবে কীভাবে। পেশা নির্বাচনে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত তা হলো, কী করে মানুষের কল্যাণ করা যায় এবং তার নিজেরও বিকাশ ঘটে পরিপূর্ণতার দিকে। শুধু নিজের জন্য যে বাঁচে, সে হয়তো ব্যক্তিগত খ্যাতি অর্জন করতে পারে, একজন পণ্ডিত হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে, হতে পারে একজন চমৎকার কবি। কিন্তু কখনোই সে একজন মহৎ মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। সাধারণের কল্যাণের জন্য যাঁর প্রাণ নিবেদিত, তিনিই মহাত্মা।[২৯]

মার্ক্স এমনতর অনুঘটকের কথা কল্পনা করেছেন, যিনি মানবজাতির জন্য ত্যাগ স্বীকার করবেন। তাঁর কল্পনায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন সম্ভবত প্রমিথিউস। মার্ক্স তাঁর পিএইচডি থিসিসের ভূমিকায় ঈশ্বরের দাস হার্মেসের প্রতি প্রমিথিউসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন।

জেনে রাখো তোমার গোলামি
কখনো মেনে নেব না আমি
নফর হব নিছক পাথরের

তবু হব না অনুগত দেবতা জিউসের।[৩০]

মার্ক্স প্রমিথিউসকে আখ্যায়িত করেছেন ইতিহাসের প্রথম বীর এবং প্রথম শহীদ হিসেবে। প্রমিথিউস একটি পৌরাণিক চরিত্র। প্রতীকী অর্থে সমাজের অসামঞ্জস্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের তিনিই নেতা। আমরা আধুনিক সমাজের জটিল অবয়বে ও বুননে যে ক্ষুদ্রতা, শঠতা, নিপীড়ন ও লুণ্ঠন দেখি, সেখানে নাগরিক সমাজের উপলব্ধি ও কর্মকাণ্ডে প্রমিথিউসীয় আবেগ, অঙ্গীকার ও সততার বড়ই প্রয়োজন। এর অনুপস্থিতি এবং সুবিধাবাদের দৌরাত্ম্যে আমরা সমাজে অনেক আন্দোলন দেখলেও পরিবর্তন দেখি না। মিউজিক্যাল চেয়ারের মতো ক্ষমতার পালাবদল দেখি।

প্রমিথিউস একটি একক সত্তা, এক ব্যক্তি। বাংলার কবি কাজী নজরুল ইসলামের অমর কবিতা 'বিদ্রোহী'র প্রেক্ষাপটে একজন ব্যক্তি, তিনিই সব। অন্যায়, অবিচার, ক্ষমতার দম্ভ ভেঙেচুরে তিনি সাম্য প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু বাস্তবে সামাজিক পরিবর্তন ব্যক্তিগত উদ্যোগে হয় না। সামাজিক শক্তিকে এগিয়ে আসতে হয়। সামাজিক শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হয়। তাকে সংগঠিত করতে হয়। আধুনিক বিশ্বে নাগরিক সমাজের আন্দোলন হলো যূথবদ্ধ প্রয়াস। কোনো একজন পণ্ডিত বা বিদগ্ধ লোকের পক্ষে একা কিছু করা সম্ভব নয়। ব্যক্তি এখানে অপরিহার্য নয়। অনেকেই ভাবেন, অমুক একজনের জন্ম না হলে এটা হতো না, সেটা হতো না—এ ধারণা অবৈজ্ঞানিক ও ভ্রান্ত।

১২.

নাগরিক সমাজের আন্দোলন তখনই বেগবান হয়, যখন অধিকসংখ্যক নাগরিক সেই আন্দোলনে যোগ দেয় এবং নাগরিকদের আকাঙ্ক্ষার বাইরে নেতৃত্বের কোনো গোপন এজেন্ডা থাকে না। নাগরিক আন্দোলনকে তার নিজস্ব সীমানা মেনে চলতে হয়, নইলে তা আর নাগরিক সমাজের আন্দোলন হয় না। প্রকৃতপক্ষে তা হয় রাজনৈতিক দলের প্রকাশ্য বা গোপন লেজুড়বৃত্তি। এ ধরনের এজেন্ডা নিয়ে আমাদের দেশে অনেকেই নাগরিক কমিটি নাম দিয়ে রাজনীতি করেন। এ কাজ নাগরিক সমাজের আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাকে বেপথে নিয়ে যায়। এ ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতার কারণে এ দেশে এনজিওগুলোর সমন্বয়কারী সংস্থা এডাব এবং পুরো এনজিও খাত প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

নাগরিক সমাজের একটি রাজনৈতিক অবস্থান থাকা জরুরি। কিন্তু বিদ্যমান রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর কোনো একটির পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার তো কোনো প্রয়োজন নেই। নাগরিক সমাজের দৃষ্টি থাকবে সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তনের দিকে। এ পরিবর্তন হতে হবে প্রকৃত মুক্তির লক্ষ্যে। কাকে সরিয়ে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন, সেই বিবাদে যুক্ত হয়ে পড়া নাগরিক সমাজের কাজ নয়।

নাগরিক সমাজের আন্দোলন হবে নাগরিক শক্তির আবাহন করে সমাজের মানুষের পরিপূর্ণ ক্ষমতায়নের। এটাকে ক্ষুদ্র বুদ্ধির মানুষেরা ইউটোপিয়া বলে যতই গালমন্দ করুক, একদিন না একদিন ওই পরিবর্তন আসবেই। দিনক্ষণ ঠিক করে এই পরিবর্তন আসবে না, তার প্রয়োজনই বা কী। এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া।

তথ্যসূত্র

১. CIVICUS, Civil Society Index Methodology and Conceptnal Framework, www.civicus.org

২. Center for Civil Society, Philippine Normal University, 2004.

৩. খন্দকার সাখাওয়াত আলী, *আন্তোনিও গ্রামসির জীবন সংগ্রাম ও তত্ত্ব*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১।

৪. বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, ওরিয়েন্টাল প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮৩।

৫. Peter Kropotkin, 'Anarchism,' *Encyclopaedia Britannica*, 1910.

৬. Michail Bakunin, *Statism and Anarchy*, Cambridge University Press, 1991.

৭. Mohuuddin Ahmad, *Seaul Diary*, Ayan Parokashani, Dhaka, 2009.

৮. Ian Birchall, *Sartre Against Stalinism*, Berghahn Books, 2004.

৯. Iain Walker, Heather J. Smith, *Relative Deprivation: Specification, Development and Integration*, Cambridge University Press, 2001.

১০. Tedd Robert Gurr, *Why Men Rebal*, Princeton University Press, 1970.

১১. Macionis, J and Gerber, L (2010). *Socioloty*.

১২. Shahid Amin, *Event, Metaphor, Memory, Chauri Chaura, 1922-1992*, Barkely, University of California Press, 1995.

১৩. Canadian Council on Social Development, *Defining and Re-Defining Poverty: A CCSD Perspective*, 2001.

১৪. Nelson A. Pichardo, 'New Social Movements: A Critical Review,' *Annual Review of Sociology* Vol.23. Annual Reviews Inc, CA, 1997.

১৫. Cynthia Kaufman, *Ideas for Action: Relevant Theory for Radical Change*, South End Press, Cambridge, MA, 2003.

১৬. Antonio Gramsci, *Selection from Prison Books*, Lawrence and Wishart, 1982.

১৭. Joseph A. Buttigieg, *The Contemporory Discourse on Civil Society: A Gramscian Critique Boundry 2*, Duke University Press, 2005.

১৮. Patricia Phillips, *The Scientific Lady: A Social History of Women's Scientific Interests 1520-1918,* St Martins, N.Y, 1990.

১৯. Allison Sneider, 'The New Suffrage History: Voting Rights in International Perspective,' *History Campass* vol, 8, issue, 7, 2010.

২০. www.britannica. com (EBchecked/topic/647122/womens-Movement.

২১. Jhonson, Merri, Lisa, ed, *No Turning Back: The History of Feminism and Future of Women*, London, Ballantine Books, 2002.

২২. Mohiuddin Ahmad, 'Breaking the Barrier: Inter Asia Reader on Democratization and Social Movements,' *Development & Social Movement Institute*, Sungkonghoe University, Seoul, 2008.

২৩. Ibid

২৪. Ibid

২৫. Ibid

২৬. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *মুক্তিসংগ্রাম*, প্রথম পর্ব, ১৯৭২।

২৭. Asiatic Society of Bangladesh, *Banglapedia*, National Encyclopedia of Bangladesh, 2006.

২৮. www.prothom-alo.org.

২৯. Karl Marx and Fredrick Engels, *Collected Works*, Volume-1, Progress Publishers, Moscow, 1975.

৩০. মহিউদ্দিন আহমদ, *কার্ল মার্ক্সের কবিতা*, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫।

খাতি অর্থনীতি চিন্তা

গণমুখী জাতীয় আর্থরাজনৈতিক কৌশলপত্রের সন্ধানে একটি দলনিরপেক্ষ অনুসন্ধান

হায়দার আলী খান

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ একটি প্রতিশ্রুত উন্নয়নমুখী নেতৃত্বের মাধ্যমে দ্রুত স্বনির্ভর ও সমতামূলক উন্নয়নের জন্য বেশ সম্ভাবনাময় দেশ। এ দেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত প্রশ্ন হলো, কীভাবে সফল নীতি চলমান রাখা যায় এবং ভবিষ্যতের জন্য আরো অধিক ভালো নীতি প্রণয়ন করা যায়। কৌশলগতভাবে দীর্ঘ মেয়াদে চিন্তা করলে আমাদের অবশ্যই রাষ্ট্রের সব স্তরে দৃঢ়, দক্ষ ও প্রতিশ্রুত নেতৃত্বের মাধ্যমে কৌশলগত উন্মুক্ততা এবং স্বনির্ভরতার সমন্বয়সাধন জরুরি। বর্তমানের এই সম্যক হতাশাজনক চিত্রের কারণ হলো, স্বাধীনতার পর থেকে দেশপ্রেমিক ত্যাগী নেতৃত্বের অধীনে দেশ একটি স্বনির্ভর ও গণমুখী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালিত না হওয়া। কৌশলগতভাবে বর্তমানের সংঘাতমুখর রাজনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ প্রণোদনার মাধ্যমে বেসরকারি খাতে সত্যিকার অর্থে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারির সংযোজনের পাশাপাশি সরকারি খাতে দক্ষ ও সমতামূলক সেবা প্রদান করতে হবে।

একই সঙ্গে অর্থনীতিবিদদের তথাকথিত বিদেশি সহায়তার নামে অনাকাঙ্ক্ষিত ঋণের বোঝা ক্রমান্বয়ে কমানোর ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে যে ঋণের বেশির ভাগই উন্নত দেশের বৃহৎ পুঁজির ওপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নির্ভরতা এবং দেশে একটি দেশীয় পরজীবী খরিদ্দারতন্ত্র তৈরি করে। ইতিবাচকভাবে আমাদের অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো স্বাধীনতার আদর্শের প্রতিফলন ঘটায় এমন শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠনে জোর দিতে হবে। প্রগতিমুখী শিক্ষাগত এবং অন্য নীতি গ্রহণের মাধ্যমে মানবসম্পদ গঠনে কৌশলগত উন্মুক্ততা ও অভিনবত্বসহ নয়টি সুনির্দিষ্ট বিষয় এই গণমুখী অবস্থানপত্রে আলোচিত হয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : বাংলাদেশ উন্নয়ন কৌশল, বৈদেশিক সাহায্য, এনজিও, নব-উদ্ভাবন ও শিক্ষা।

প্রারম্ভিক কথা

একবিংশ শতাব্দী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের চেয়ে স্বনির্ভর শিল্পায়নপ্রক্রিয়ায় ব্যাপকতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এটা চলমান বৈশ্বিক আর্থিক এবং অর্থনৈতিক সংকটের ক্ষেত্রেও সমানভাবে সত্য। এই পরিবর্তিত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও বাস্তুতান্ত্রিক সংকট আবশ্যিকভাবে নতুন প্রাযুক্তিক ও শিল্পানুকূল রূপকল্প এবং বঙ্কিম পথের উন্মেষ ঘটাবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সামনে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক কাজ রয়েছে। তবে বাংলাদেশের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সক্ষমতার পাশাপাশি বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরে মধ্যে অন্তত মধ্য স্তরের উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জনেরও সামর্থ্য আছে। ইতিবাচক দিক হলো, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি সক্ষমতা অর্থনীতিতে ব্যাপক রূপান্তর ঘটিয়েছে। অস্বীকারের উপায় নেই, প্রবৃদ্ধির হার স্থিতভাবে বেড়েই চলেছে। একই সঙ্গে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য সফলতার কারণে বিশ্বব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর স্ববিশেষ সুনাম অর্জনে বাংলাদেশ সক্ষম হয়েছে। জাতীয় সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ হারের মতো অন্য সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকগুলোও ব্যাপকভাবে বেড়েছে। রপ্তানি প্রবৃদ্ধিও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশ এখন ওয়াশিংটনের সরলীকৃত উন্নয়ন পথের বিপরীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের সবচেয়ে উত্তম উন্নয়ন পথ পূর্ব-এশীয় ধরনে পদার্পণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই এই ধরনের উন্নয়নধারার কৌশলগত প্রধান বিষয়াবলি প্রথমে চিহ্নিতকরণ জরুরি। তারও আগে 'উন্নয়ন-ধারণা' স্বয়ং কী বস্তু, তা খোলাসা করার কাজটিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। এ লেখায় আমি মাঝেমধ্যে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম কিংবা মালয়েশিয়ার মতো দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশের অর্থনীতির উল্লেখ করব, যার অনেক কিছুই বাংলাদেশের জন্য প্রাসঙ্গিক।

উন্নয়ন কী? বাংলাদেশে উন্নয়নের পর্যায়সমূহ এবং কিছু কৌশলগত বৈশিষ্ট্য

দ্ব্যর্থবোধকতা এবং বিভ্রান্তি এড়াতে এই প্রসঙ্গে 'উন্নয়ন' পদটির বিষয়ে কিছু স্পষ্টকরণ জরুরি। এই প্রবন্ধের বাকি অংশে উন্নয়নের তিনটি ধারণার অবতারণা করছি, যা পরোক্ষভাবে অনেকাংশে শিল্পায়ন এবং উন্নয়নের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। প্রথম ধারণাটি প্রবৃদ্ধির সঙ্গে কিছু কাঠামোগত পরিবর্তনজনিত, যা কোনো দেশের উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। দ্বিতীয় ধারণাটি প্রবৃদ্ধির বণ্টনগত দিক, বিশেষত অসমতা ও দারিদ্র্য বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দেয়। উন্নয়ন অর্থনীতিবিদেরা পরোক্ষভাবে আজকাল এই উভয় ধারণাই পোষণ করছেন। ব্যাপকতর পরিসরের তৃতীয় ধারণাটি অমর্ত্য সেনের সার্বিক সক্ষমতা ধারণা এবং এর তৎপরবর্তী সংযোজনের ভিত্তিতে আলোচনার দাবি রাখে। এই ধারণায় উন্নয়নকে কালের সম্প্রসারণ ও ক্ষেত্রের (space) পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির স্বাধীনতার সম্প্রসারণ

হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশেষত এটি ব্যক্তিকে এমন ইতিবাচক স্বাধীনতা দেয়, যা তাকে জীবনের মূল্য দিতে শেখায়। অবশ্য শিল্পায়ন এবং উন্নয়নের প্রায়োগিক নমুনায় প্রত্যক্ষভাবে এ ধারণা বহুল প্রচলিত নয়। এখনো উন্নয়নে 'সামষ্টিক কল্যাণের' একটি প্রচলিত ধারণা আছে, যা আসলে পুরো শিল্পায়ন ও উন্নয়নের সামগ্রিক প্রকল্পের ভিত্তি। 'স্বাধীনতা নিশ্চিতে উন্নয়ন' এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়নের ওপর লিখিত কিইউন লির (Keun Lee) প্রবন্ধটি প্রাসঙ্গিক। যেখানে তিনি লিখেছেন, 'গণতন্ত্রে আমরা স্পষ্টতই এমন কিছু সুবিধামূলক বৈশিষ্ট্য দেখি, যেখানে কোনো নাগরিককে ইচ্ছাকৃত আটক এবং নির্যাতন করা যায় না। কিন্তু শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো এসব সুবিধা পেলেও তাদেরই এটা বেশি লঙ্ঘিত হয়। সত্যি—শক্তিশালী রাষ্ট্রের যেখানে এটি সঠিক হওয়ার কথা, সেখানেই প্রায় অধিকতর ভুল হয়। এভাবে ল্যাটিন আমেরিকা অতীতের স্বল্পমাত্রার সামরিক উত্তরাধিকার ছেড়ে এলেও তাইওয়ান ও কোরিয়া খুব পোক্তভাবেই অতীতের সামরিক স্বৈরতন্ত্রের উত্তরাধিকার ছেড়ে এসেছে। ল্যাটিন আমেরিকা এবং তাইওয়ান-কোরিয়ার মধ্যে নিজ নিজ জাতীয় শিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে কৌশলগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে স্পষ্টতই পার্থক্য আছে। বিষয় হলো, বর্তমানে যেকোনো উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে এটি পছন্দ হতে পারে। এর মধ্যে কোরিয়া কিংবা পূর্ব এশিয়ার সাফল্যের নেপথ্যে ছিল প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়িত্ব।' (লি ২০০৮, পৃষ্ঠা ১৩)

সুতরাং মনে হয়, অন্যান্য বিষয়সহযোগে প্রবৃদ্ধি অর্জনের উন্নয়নচিন্তার সঙ্গে সত্তর-পরবর্তী উন্নয়নচিন্তার একটি পরোক্ষ সংযোগ আছে। যখন অন্যান্য বিষয়ের তালিকায় গবেষকভেদে ভিন্নতা আছে, তখন এই ক্ষেত্রের কোনো গবেষকই আজ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নকে সমানভাবে পরিমাপ করতে পারেননি। প্রায় সবাই এ বিষয়ে একমত যে উচ্চ প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা উন্নয়নের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। অনেক প্রাজ্ঞ গবেষক অবশ্য 'প্রবৃদ্ধির এবং বণ্টনের রাজনৈতিক অর্থনীতিতে' অধিক গুরুত্ব দেন।

উচ্চ প্রবৃদ্ধির অভিজ্ঞতার সংশ্লেষণ এশীয় অর্থনীতির কিছু সাধারণ কৌশলগত বিষয়ের পাশাপাশি বাহ্যিক পারিপার্শ্বিকতা এবং নীতির রূপান্তরের প্রভাব প্রকাশ করে। এটি বহু-ভারসাম্য এবং পথ-নির্ভরতার অরৈখিক জটিল অর্থব্যবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। সময়ের আবর্তে যে কেউ একদিকে যেমন কিছু ক্ষেত্রে কাঠামোগত রূপান্তরের উত্থান পর্যবেক্ষণ করতে পারে, অপরদিকে প্রাথমিক অবস্থা, কৌশল, নীতি কিংবা বাহ্যিক পারিপার্শ্বিকতাসহ অন্য বিষয়ে স্থবিরতাও দেখতে পারেন। এখানে আলোচনার দিকগুলো হলো, এশীয় নমুনায় প্রত্যেকের মধ্যে অনেক সুনির্দিষ্ট ভিন্নতাও আছে। তবে নিচে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রায় মিলও আছে।

১. কৌশলগত উন্মুক্ততা : কৌশলগত উন্মুক্ততা হলো হংকং, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ডের সঙ্গে ব্যাপক মাত্রায় উন্মুক্ত হওয়া। একই সঙ্গে ভিয়েতনামের বাণিজ্যিক অভিমুখ বিশেষত বস্ত্র খাতের নীতির সঙ্গে ন্যূনতম মাত্রায় সংযোগ স্থাপন। কিন্তু প্রথম দিককার কৌশলগত আমদানি বিকল্পের (SISI) বাইরে সব ক্ষেত্রে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি উন্নয়নে কৌশলগত অঙ্গীকার এবং অধিক মূল্য সংযোজনের দিকে মনোযোগী হওয়া। তবে মনে রাখা উচিত, সব উন্নয়নশীল দেশে রপ্তানি প্রবৃদ্ধিমুখী নীতি গ্রহণের ব্যাপারে সাংগঠিক কূটাভাস (fallacy of composition) আছে। এ ক্ষেত্রে পারস্পরিক চাহিদা না থাকলে উন্নত দেশের রপ্তানি বাজারের আসন্ন প্রতিযোগিতায় উন্নয়নশীল দেশগুলো জয়ী কিংবা পরাজিত হতে পারে। সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য উদ্যমী দেশগুলোকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বাজার উন্নয়ন এবং অন্য অনেক নীতি প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মাধ্যমে গতিশীল তুলনামূলক সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে।

২. স্থিতিশীলতার জন্য বিকাশমান সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন : বর্তমান বিশ্বে চীন ও ভারত সবচেয়ে বিকাশমান অর্থনীতির দেশ। অবশ্য থাইল্যান্ডের তুলনায় তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম ও কোরিয়া অধিকতর মিশ্র বিকাশমান অর্থনৈতিক নীতির চর্চা করে। এমনকি আর্থিক দিক থেকে হংকং ও সিঙ্গাপুরও একই সঙ্গে ভিন্ন নীতি অনুসরণ করে। মনে হয় চীন, ভারত, কোরিয়া, মালয়েশিয়া কিংবা ভিয়েতনামের মতো দেশগুলোর উন্নয়নশীল অর্থনীতির অভিজ্ঞতায় পুরো অঞ্চলই ওয়াশিংটনের অর্থনৈতিক মডেল দৃঢ়ভাবে পরিহার করবে।

৩. উৎপাদনশীল বিনিয়োগের জন্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণ : উৎপাদনশীল বিনিয়োগের জন্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে কোরিয়াই মনে হয় সবচেয়ে অগ্রগামী। ষাটের দশকে কোরিয়া সংস্কারসাধনের মাধ্যমে কতিপয় পর্যায়ক্রমিক স্তর পার করেছে এবং এখন দেশটি ২০৫০ সালের তথ্য এবং জৈব ও ন্যানো প্রযুক্তির সম্মিলনে যথাযথ প্রাযুক্তিক উৎকর্ষে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। অবশ্য এসব প্রতিষ্ঠান নির্মাণে এখনো রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রাধান্যশীল। উৎপাদনশীল বিনিয়োগ উপযোগী প্রতিষ্ঠান নির্মাণে বোধ হয় চীনেরই কেবল সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মসূচি আছে, যা পরে একটি বিশেষ কেস স্টাডির মাধ্যমে আলোচনা করা হবে।

৪. কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন : কৃষিভিত্তিক উন্নয়নে কম-বেশি প্রায় সব দেশই জোর দেয়। কেবল চীন ও ভিয়েতনামে সম্ভবত প্রথম দিকে কৃষিতে সমতাভিত্তিক কৃষকমুখী উন্নয়ননীতি গৃহীত হয়েছে। জাপানি উপনিবেশের অবসানের পর কোরিয়া ও তাইওয়ানেও সমতামূলক ভূমি সংস্কার সাধিত হয়েছিল।

ওয়ারের (Warr) আলোচনায় তাইওয়ানে কৃষির গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে,

বিশ্লেষণের ফল নির্দেশ করে থাইল্যান্ডের মোট প্রকৃত উৎপাদন বৃদ্ধিসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কৃষি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু এর সবচেয়ে বড় অবদান হলো কৃষিভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধির বিপরীতে এটি অন্যত্র উৎপাদনশীলভাবে সম্পদের চাপ কমাতে অবদান রেখেছে। অন্যান্য খাতের তুলনায় কৃষিতে উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ধীরগতির, এমন তথ্যের ওপর ভিত্তি করে থাইল্যান্ডের কৃষিকে স্থিত বলে চিত্রায়িত করা সম্পূর্ণ ভুল। যদি কৃষি খাত সত্যিই 'স্থবির' হয় তবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে কম হবে। কারণ, কৃষির উৎপাদনশীলতা যথেষ্ট পরিমাণ উন্নীত করা কিংবা ব্যাপকভাবে সম্পদের ওপর চাপ কমানোর নীতি গ্রহণ কখনো ভারসাম্যপূর্ণ উৎপাদন প্রবৃদ্ধিকে সম্ভবপর করবে না। অথচ থাইল্যান্ড এখনো তা-ই অব্যাহত রেখেছে।

থোবার্নের (Thoburn) লেখায় ভিয়েতনামের কৃষি সংস্কার সম্পর্কে মূল্যায়ন পাওয়া যায়। সেখান থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা তুলে ধরছি:

ভিয়েতনামের কৃষি সংস্কারে ধান সত্যিই বিরাট সাফল্যগাথা নিয়ে আসে। দেশটি সহজেই আশির দশকের চালের একক আমদানিকারক অভিধা বদলে নব্বই দশকের মাঝামাঝিতে বিশ্বের তৃতীয় বৃহৎ চাল রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে আবির্ভূত হয়। যদিও অন্যান্য পণ্যের তুলনায় নব্বই দশকের শেষ পর্যন্ত চালের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি খুব একটা উন্নীত হয়নি। এই ঘাটতি আবশ্যিকভাবে চমকপ্রদও নয় অথবা ব্যর্থতার নমুনা নয়। নব্বই দশকের শেষের দিকে চাল রপ্তানি প্রবৃদ্ধি যেখানে শিখরে ছিল, সেখানে অন্যান্য উৎপাদনের মাত্র ১৫ শতাংশ রপ্তানি হতো। যে অর্থনীতির প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষই একই সঙ্গে চালের ভোক্তা ও উৎপাদক, সেখানে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ওঠানামায় প্রাথমিকভাবে চাল উৎপাদন এবং রপ্তানি মানুষের গ্রামীণ আয় ও খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে দেখা যায়, রাষ্ট্র নিজেই কাজুবাদাম এবং পরবর্তী সময়ে কফির মতো নতুন শস্য উৎপাদনে উৎসাহ দিয়েছে। কফি উৎপাদন সরাসরি কোনো সাফল্যগাথা না আনলেও নব্বই দশকের মাঝামাঝিতে কতিপয় আন্তর্জাতিক দাম পড়তিতে ভিয়েতনামের কফি রপ্তানি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে।

৫. শিল্পভিত্তিক উন্নয়ন ও কাঠামোগত পরিবর্তন: শিল্পভিত্তিক উন্নয়ন ও কাঠামোগত পরিবর্তনের মতো বিষয়ের কৌশলগত পরিপ্রেক্ষিত আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ব্যাপকমাত্রায় সফল দেশগুলোর ধারাবাহিক উন্মোচিত গতিশীল নীতি গ্রহণের বিষয়ে ইঙ্গিত দেয়। নিরন্তর পর্যালোচনামূলক প্রচেষ্টা আমাদের এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ গল্প বলে, যা সাধারণত নব্যধ্রুপদি অর্থনৈতিক (new classic economy) মূলনীতির মাধ্যমে কতিপয় ভালো সূচক অনুসরণে একটি সম্পূর্ণ অবরোহণমূলক চিত্রে নিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে জোমো (Jomo) এবং উইর (Wee) মালয়েশিয়া কেস স্টাডিটা খুবই উত্তম ও জুতসই প্রতি-উদাহরণ। এই দুজন গবেষক নির্দিষ্ট সময়সীমা মাথায় রেখে মালয়েশিয়ার কৌশলগত ও নীতিগত কতিপয় পরিবর্তন আলোচনা করেছেন।

বছরের পর বছর সরকার মালয়েশিয়ায় শিল্পায়নপ্রক্রিয়ার কৌশল পরিবর্তন করেছে। সমস্যা এবং নতুন অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে সেখানে সরকার ১৯৮৬-১৯৯৫-এর প্রথম শিল্প মহাপরিকল্পনা পরিবর্তন করে ১৯৯৬-২০০৫-এর জন্য নতুন দ্বিতীয় শিল্প মহাপরিকল্পনা ঘোষণা করে। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে সে দেশের সরকার নির্দিষ্ট তথ্যপ্রযুক্তি বিনিয়োগ প্রসারে মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডর (এমএসসি) নির্মাণ করে। একই সঙ্গে সরকার এই উদ্যোগকে সফল করতে অবকাঠামোগত উন্নয়নে তাৎক্ষণিক ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় এবং এ ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগকারী ও নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি আইন প্রণয়নসহ অধিকতর উদারনৈতিক প্রণোদনা প্রদান করে।

এভাবে আশির দশকের মাঝামাঝিতে দেশটি নীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি এবং শিল্পায়নপ্রক্রিয়ায় সফলতা লাভ করে। তখন থেকে নতুন নীতি গ্রহণের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি আধুনিকায়ন ও শিল্পায়নের পথ সুগম করতে ২০২০ সাল পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করে। যদিও সেখানে মধ্য নব্বই দশক নাগাদ বৃহত্তর অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বাড়িয়ে বিদেশি বিনিয়োগ প্রায়ই শূন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তবু ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থবছরের আঞ্চলিক সংকটের কারণে সে দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি টেকসই গতি পায়নি। সহযোগী রাষ্ট্রের সাড়ায় কিছু বিবেচনাহীন নীতি গ্রহণের মাধ্যমে সংকটের গভীরতা ও উত্তরণের জটিলতা আরও খারাপের দিকে যায়। যদিও ওই সহযোগী রাষ্ট্রের নির্দেশনা সংকট উত্তরণে তেমন কাজে আসেনি।

পরিবর্তিত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের বাস্তবতায় ওই দেশ ষাট ও সত্তরের দশকে আরও কিছু পরিবর্তন সাধন করে। ষাটের দশকে রাবারের দরপতন নিঃসন্দেহে মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও নীতিতে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। বিদেশি পৃষ্ঠপোষকতা, বিশেষত ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার নিরীক্ষা অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন, যেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগগুলো মূল ভূমিকা পালন করে। এমনকি এই নিরীক্ষা উত্তর-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর অভিজ্ঞতা, যেখানে রপ্তানি উন্নয়নে কার্যকর সুরক্ষা শর্তাধীন থাকে—তা থেকেও ভিন্ন। অবশ্য সত্তরের দশকে

দেশটি নিট তেল আমদানিকারক থেকে রপ্তানিকারক দেশে উন্নীত হয়, যখন পেট্রোলিয়ামের দাম ব্যাপকভাবে বেড়েছিল। তখন দেশটির সরকার ১৯৮০ সালের ভলকার (Volker) হস্তক্ষেপে প্রকৃত সুদহার বৃদ্ধি এবং পণ্য দরপতনে বৈশ্বিক মন্দায় নিপতিত না হওয়া পর্যন্ত বাইরে থেকে কম দামে পেট্রোডলার ধার করার অনুমতি দিয়েছিল। (জোমো এবং উই, পৃষ্ঠা ১৪)

ভিয়েতনামের কেস স্টাডিও তাৎক্ষণিক ও সাময়িক নীতি আপাততভাবে প্রথম দিককার সফল উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে পেরেছে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় প্রকাশ করে। এ ক্ষেত্রে সম্পদ বণ্টনে ভ্রান্তি এড়াতে সার্বক্ষণিক তদারকি ও নীতি পর্যালোচনার মাধ্যমে বিদ্যমান নীতি কাজ না করার কারণ সন্ধান করাই একটা শিক্ষা হতে পারে।

৬. তথ্যপ্রযুক্তির সক্ষমতা অর্জন : প্রাযুক্তিক সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত পুরো প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের পথপরিক্রমার বঙ্কিম রেখায় কোরিয়া একটি ভালো নমুনা সৃষ্টি করেছে। লির ভাষায় : 'সক্ষমতার বিভিন্ন দিকের মধ্যে প্রাযুক্তিক সামর্থ্যের দিকে জোর দেওয়া উচিত। কেননা এটা ছাড়া কোনো টেকসই প্রবৃদ্ধি সম্ভব নয়। এই উন্মুক্ত বাজার প্রতিযোগিতার যুগে ব্যক্তি খাতের কোম্পানিগুলোকে প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সস্তা পণ্যের ওপর নির্ভর করতে হয় এবং এই সস্তা পণ্যগুলোর প্রাযুক্তিক অভিনবতায় বাড়তি উন্নয়ন ঘটিয়ে উচ্চমূল্য আরোপ করে মূল্যশৃঙ্খলে (value chain) পরিচালনা করতে হয়। অধিকন্তু ব্যক্তি খাতের কোম্পানিগুলোকে যতটা সম্ভব স্থানীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় কোম্পানি হিসেবে থাকাটাই শ্রেয়তর, কোনোভাবেই বিদেশি নিয়ন্ত্রিত বহুজাতিক কোম্পানির শাখা হিসেবে থাকা উচিত নয়। বহুজাতিক কোম্পানির শাখাগুলো সব সময় বিশ্বব্যাপী স্বল্প মজুরি এবং বৃহত্তর বাজারের অন্বেষণে থাকে। সুতরাং এসব কোম্পানি কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা দেশের টেকসই প্রবৃদ্ধি গঠনে নির্ভরযোগ্য হতে পারে না; তবে এসব কোম্পানি জ্ঞান বিনিময় এবং শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে সেবা প্রদান করে।'

জোমো এবং উইয়ের যৌথ উদ্যোগে করা মালয়েশিয়ার কেস স্টাডিও মধ্য মেয়াদ থেকে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় প্রাযুক্তিক সক্ষমতা সৃষ্টির কৌশলগত দিকটিকে আবশ্যিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। চীন, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের বেলায়ও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবং এখনো বিবেচিত হচ্ছে।

৭. প্রাযুক্তিক জ্ঞান অর্জন এবং নব-উদ্ভাবন : কোনো দেশের জাতীয় উদ্ভাবনব্যবস্থা সৃষ্টিতে বছরের পর বছর নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং প্রাযুক্তিক জ্ঞানের চর্চা অব্যাহত রাখা জরুরি। দেশে উন্নয়ন যদি কাঙ্ক্ষিত ধাপ অতিক্রম করে

তখন নতুন নতুন নীতিগ্রহণের চ্যালেঞ্জ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিষয়টি বোঝার ক্ষেত্রে কোরিয়ার ওপর লির কাজটি বেশ কাজ দেবে। প্রয়োজনীয় অংশ পাঠকের সুবিধার্থে উদ্ধৃত করলাম :

> সুতরাং স্থানীয় ব্যক্তি খাতের কোম্পানিগুলোর সক্ষমতা চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উন্নয়নের মানদণ্ডে উন্নীত করতে হলে অগ্রণী এজেন্সির মাধ্যমে পুরো প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে নির্দেশনা প্রদান এবং সমন্বয়সাধনের প্রয়োজন হয়। এটা প্রয়োজন হয় এ কারণে, প্রধান সম্পদ এতই অপ্রতুল যে এসব সম্পদকেই বিভিন্ন সেক্টর বা প্রজেক্টে বারবার ব্যবহার করা লাগে। বিষয়টি বুঝতে গারসেনক্রন (Gerschenkron) খুব কাজ দেয়; যিনি বিশ্লেষণ করেছেন জার্মানি ও রাশিয়ার পরে আসা শিল্পায়নে বৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত বিনিয়োগ ব্যাংক পুরো প্রক্রিয়াকে সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। এটা এমন অনুঘটক, যা শিল্পায়নপ্রত্যাশী দেশের বিভিন্ন ঘাটতি পূরণে সহায়তা করে। প্রতিটি পূর্ব-এশীয় দেশই এ রকম সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে, যা পুরো শিল্পায়নপ্রক্রিয়ার দেখভাল করে। কোরিয়া ষাটের দশকে পার্ক শাসনামলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পর্ষদ, শিল্পনীতি ও রপ্তানি সহায়তায় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা এবং অর্থসংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নে অর্থ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠাসহ এ রকম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান গঠন করে।

উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র ও সুশীল সমাজ উভয়কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। অবশ্য, প্রথম দিকে রাষ্ট্রকেই আবশ্যিকভাবে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হয়। পরবর্তী পর্যায়ে প্রযুক্তিগত সামর্থ্য সৃষ্টিতে উদ্ভাবনের প্রাক্-প্রতিযোগিতামূলক এবং প্রতিযোগিতামূলক সময়ে বেসরকারি-সরকারি অংশীদারির ওপর নির্ভর করতে হয়। (খান ২০০৪)

৮. প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ও বিদেশি সহায়তা : প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ও সহায়তা উপরিউক্ত দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এর মধ্যে সম্ভবত বেশি ভূমিকা রেখেছে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে। সহায়তার তুলনায় বোধ হয় বাইরের বিনিয়োগ অধিকতর তাৎপর্যবহ। এমনকি অভ্যন্তরীণ ও রাষ্ট্রীয় খাতের বিনিয়োগও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে কোরিয়া, তাইওয়ান ও চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে। ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার উৎপাদন খাতের মতো বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। খাতওয়ারি হিসেবে উৎপাদন খাত প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ১৯৮৮-২০০৬ সাল পর্যন্ত ভিয়েতনামে বিদেশি প্রত্যক্ষ পুঁজির ৫২ শতাংশ, পরিবহন, স্টোরেজ এবং যোগাযোগের ৯৬ শতাংশ, প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন

ক্ষেত্রে ৮ শতাংশ এবং আবাসনের ৮ শতাংশ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। (থোবার্ন ২০০৮, পৃষ্ঠা ৮)

থোবার্নের লেখায় প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগই যে উন্নয়নের একমাত্র চাবি নয়, তারও প্রমাণ মেলে। স্ববিরোধী হলেও সত্য, ভিয়েতনাম গতানুগতিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি ও প্রতিযোগিতার পদক্ষেপে খুব একটা ভালো করছে না, তবু এখনো পর্যন্ত বিনিয়োগকারীদের কাছে বেশ সমাদৃত। বিশ্বব্যাংকের ডুয়িং বিজনেস (Doing Business) জরিপে ভিয়েতনাম ব্যবসাবান্ধব ১৭৫টি দেশের মধ্যে ১৪৪তম স্থানে আছে। ২০০৭ সালের ভিডিআর থেকে জানা যায়, জাপানি বিনিয়োগকারীরা ভিয়েতনামকে বিশ্বের তৃতীয় আকর্ষণীয় বিনিয়োগক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করে। মনে হয়, আন্তর্জাতিক জরিপগুলোতে আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সবিস্তার বর্ণনার বিষয়টিতে ভিয়েতনামের স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশ, উচ্চমান ও নিম্ন শ্রম ব্যয় এবং নিম্ন অপরাধ হার অধিকতর গুরুত্বসহযোগে বিবেচিত হচ্ছে (থোবার্ন ২০০৮, পৃষ্ঠা ৭)। বিদেশি সহায়তা, সুনির্দিষ্টভাবে বললে, জাপানি সহায়তা থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু এশীয় দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জন্য সহায়তার আসল পরিমাণ থেকে এর সুবিধা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

৯. দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল : প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে দারিদ্র্য বিমোচনের মতো বিবিধ নীতি নির্ধারণ বেশ ফল দেয়। যদিও প্রবৃদ্ধি স্বয়ং দারিদ্র্য বিমোচনের মতো কৌশলগত অনুষঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, তবু সব ক্ষেত্রে গ্রামীণ ও শহুরে দারিদ্র্য কমাতে সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ জরুরি। অবশ্য চীনের ক্ষেত্রে ১৯৯৫ সময় নাগাদ এসব বিষয় খুব উপেক্ষিত বা বিপরীত ছিল, যদিও বর্তমান নেতৃত্ব এসব বিষয়ে বেশ যত্নবান এবং একই সঙ্গে এসব প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আবার থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম সরকারের একটি ভারসাম্যপূর্ণ সামঞ্জস্যশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীমুখী উন্নয়ন কৌশল গ্রহণে যথেষ্ট মনোযোগ আছে। এটাকে বিবেচনা করা হয় উন্নয়নের 'উদ্বৃত্ত প্রবৃদ্ধি' কৌশল হিসেবে (ওয়েস ও খান ২০০৬)। ওপরে আলোচিত নয় ধরনের অনুঘটের বাইরেও কিছু তাৎক্ষণিক অথচ ঐতিহাসিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুঘটক আলোচনার দাবি রাখে। মালয়েশিয়ার কেস স্টাডির ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে এসব অনুঘটকের উপস্থিতির প্রমাণ মেলে। এমনকি অন্যান্য ক্ষেত্রে ত্বরিত দৃষ্টি দিলেও ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ঘটনা যেমন বিপ্লব কিংবা যুদ্ধের মতো ঘটনায়ও অধিক পরিবর্তন যে হতে পারে তার ইঙ্গিত দেয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, ষাটের দশকে কোরিয়ায় পার্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে অধিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। জোমো ও ইউর গবেষণা থেকে মালয়েশিয়ায় বিভিন্ন সময়ে পাঁচ ভিন্ন রকম নীতির শিক্ষা পাওয়া যায়।

কোনো তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক সক্ষমতার ভিত্তিতে কোন নীতি সফল কি ব্যর্থ, তা মূল্যায়ন করা কঠিন। মালয়েশিয়া খুব উন্মুক্ত অর্থনীতির দেশ হওয়ায় অনেক সময় অনির্ধারিতভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতির শিকার হয়।

১৯৮৫ সালের প্লাজা অ্যাকর্ডে ইয়েন শক্তিশালী হওয়ায় মালয়েশিয়ার সার্বভৌম বিদেশি ঋণ (sovereign foreign debt) ইয়েন-নিয়ন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিল। আশির দশকের আর্থিক মন্দা মালয়েশিয়ায় ব্যাংকিং সংকট তৈরি করেছিল, যা ১৯৯৭-৯৮ সালে চরমে পৌঁছেছিল। পরবর্তী সময়ে এই সংকট উত্তরণে দেশটি ব্যাংকব্যবস্থায় ব্যাপক সংশোধন করে, যা প্রথম দিককার আর্থিক উদারনীতিকরণ-জনিত অনিয়ম ঠেকাতে বেশ কাজে লেগেছিল। আশির দশকের শেষের দিকের নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্কার দেশটির বাইরের ব্যক্তি খাতের অর্থঋণকে সঠিকভাবে উৎসাহিত করে ওই খাতের অরক্ষণীয়তা কমিয়ে দিয়েছিল। রাশিয়া ও এলটিসিএম (LTCM) সংকট অনুসরণে আটানব্বই সালের শেষ পাদের পূর্ব এশীয় অর্থনৈতিক পুনরুত্থানের সফলতা মাহাথিরের সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে তাঁর ডেপুটিকে রাজনৈতিকভাবে নিঃশেষ করার বিতর্কিত পদক্ষেপের প্রভাবে ম্লান হয়ে যায়।

ওপরের আলোচনার সূত্র ধরে আমি মনে করি, আপেক্ষিকভাবে অধিক সামঞ্জস্যশীল অনুঘটকগুলো বিবেচনায় রেখে একুশ শতকের উন্নয়ন ও শিল্পায়নের সমস্যা মোকাবিলায় বাস্তবধর্মী ও উত্তরণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। একই সঙ্গে ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করাও জরুরি। বাজারসহ অন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতাও সমানভাবে কমানো গুরুত্বপূর্ণ। ব্যর্থতা এড়াতে বৃহৎ ও পূর্বনির্ধারিত উন্নয়ননীতি গ্রহণের বিপরীতে বিভিন্ন বিপরীতধর্মী নীতি গ্রহণের ইচ্ছাই হবে সর্বোত্তম উন্নয়ন রেসিপি। এশীয় দেশগুলোর প্রতিষ্ঠান নির্মাণের দিকে তাকালে এটা স্পষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানগুলোকে টেকসই আকার দেওয়ার চেয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর ভালো কাজের তালিকাকরণেই তারা বেশি মনোযোগী। প্রকৃত প্রস্তাবে, এখানে জটিলতার সঙ্গে সংগতি বিধান করে একই কাজ অনেক প্রতিষ্ঠান করে থাকে। এশীয় দেশগুলোর ক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট, এখানে প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পত্তির তাৎক্ষণিকমতো নিরাপত্তা, চুক্তির কার্যকারিতা এবং বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে একীভূত করাসহ স্থিত কৌশলগত প্রলুব্ধকর নীতির বিপরীতে কেবল উপরি পর্যায়ে আপাতনিশ্চয়তা দেয়। তা ছাড়া এসব দেশ আবশ্যিকভাবে কঠোর রক্ষণশীল আর্থিক অবস্থান ছাড়াই সামাজিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করে। সময়ের আবর্তে প্রদত্ত পর্যাপ্ত আর্থিক উন্নয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি খাতের মধ্যবর্তীদের আর্থিক ঝুঁকি গ্রহণের নিশ্চয়তা দেবে। সমতাভিত্তিক প্রবৃদ্ধির উন্নয়নে সামাজিক বীমা এবং নিরাপত্তা সুরক্ষা দেয় এমন প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে এবং একই সঙ্গে জবাবদিহিমূলক

গণতান্ত্রিক ক্ষেত্র নির্মাণ করতে হবে। কিন্তু সেখানে সব-কাজে-জুতসই হয় এমন কোনো একক পদ্ধতি থাকবে না।

প্রতিযোগিতার দিক থেকে বাংলাদেশ কোথায়?

বৃহত্তর রাজনৈতিক অর্থনীতিতে কৌশলগত পরিপ্রেক্ষিতের শক্তি ও দুর্বলতাগুলো দেখা হয়েছে এখানে। অতীতে ব্যাপক অব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও এক দশকের অধিক সময় থেকে বাংলাদেশে বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তথা জিডিপি ৫ শতাংশ বা তারও বেশিতে থাকছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকে (এডিবি) কর্মরত সময় আমি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নিয়ে কিছু প্রতিবেদন লিখেছি। এসব গভীর গবেষণার ভিত্তিতে আমি দেশের উন্নয়ন সম্ভাবনার কথা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি। ফলপ্রসূ জনসংখ্যা পরিকল্পনা নীতিসহ কিছু দেশপ্রেমিক কর্মী ও আওয়ামী লীগের নেতা এবং তাদের মিত্রের তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়ন-প্রচেষ্টা অন্য অনেক উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক সাফল্য নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের কিছু সূচকে দারুণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। আমি দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হওয়ার অধিক ঘোরতর সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার আগে বাংলাদেশের শক্তি-সামর্থ্যের একটি সংক্ষিপ্তসার তৈরি করব।

বাংলাদেশের শক্তিসমূহ :

১. আপেক্ষিকভাবে সমজাতীয় জনসংখ্যা, তবে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকতর সুরক্ষার প্রয়োজন।
২. ঐতিহাসিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ও সহনশীল জনগোষ্ঠী, তবে ১৯৭৫-পরবর্তী কিছু সমস্যা বিদ্যমান।
৩. প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুতসহ বিকাশমান ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অর্থনীতির সন্নিবেশ।
৪. যোগাযোগব্যবস্থা ও বাহ্যিক অবকাঠামোর উন্নয়ন।
৫. ক্ষুদ্রঋণ এবং অন্যান্য দারিদ্র্য বিমোচন নীতিতে সাফল্য।
৬. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতিতে সাফল্য।
৭. দেশের ভেতরে অর্ধদক্ষ শ্রমিকের ক্রমবর্ধিত সংখ্যা এবং ব্যাপকসংখ্যক দক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিকের বাইরে গমন।
৮. অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয়; জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওতে মানবসম্পদ এবং বিবিধ প্রতিষ্ঠানগত ও পেশাগত ক্ষেত্রে মানবসম্পদের সম্মিলন।
৯. ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে জনপ্রিয় সংস্কৃতি, চেতনা এবং সামাজিক চর্চার বৃহত্তর অংশ এখনো গোঁড়ামি, কঠোরতা ও অসহিষ্ণুতা থেকে মুক্ত। বাঙালির খুব ক্ষুদ্র একটা অংশের মধ্যে এসব নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই ক্ষুদ্র অংশ ক্ষমতা ও ধ্বংসযজ্ঞের উপায়ের দিক থেকে ধ্বংসাত্মক ও পীড়নকারী। ন্যায্যতার সঙ্গে বলা যায়, অধিকাংশ বাঙালি এসব ধ্বংসাত্মক কর্মযজ্ঞ কোনোমতেই সমর্থন করে না। এই বিবৃতি সাম্প্রতিক দুর্নীতিবিরোধী নীতির ব্যাপক সমর্থনের প্রমাণের সঙ্গে প্রতিপাদনযোগ্য।
১০. ব্রিটিশরাজ এবং পাকিস্তানি শাসনব্যবস্থার মতো অধিকতর শক্তিশালী অথচ অন্যায্য রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস বিদ্যমান। এসব সফল সংগ্রাম আমাদের শিক্ষা দেয়, বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অভিনবত্বের সুপ্ত শক্তি আছে। তবু আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি, এই অভিনবত্বের জন্য পূর্বশর্তসমূহ কী?

বাংলাদেশের উন্নয়নের কিছু কৌশলগত সমস্যা

পাঁচ প্রধান কৌশলগত সমস্যা: আমি বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য কৌশলগতভাবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যেগুলোকে মনে করি, প্রথমে সেগুলোতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। তারপর আমি বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিষয়টি কৌশলগত গুরুত্বের জায়গা থেকে আলোচনা করব, যাতে আমরা সংকট-তাড়িত সমাধানে পৌঁছাতে পরি। পরিশেষে, আমাদের প্রগতিশীল সুশীল সমাজ এবং রাজনৈতিক শক্তিকে কৌশলগত জায়গা থেকে সংযুক্ত করে এমন দশটি প্রশ্ন উত্থাপন করব। কৌশলগত সমস্যাগুলো নিম্নরূপ :

১. সংসদীয় সাংবিধানিক রাজনীতির সমস্যা—প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা।
২. অর্থনৈতিক ন্যায্যতা, শ্রেণী, লিঙ্গ, নৃতাত্ত্বিক ও সংখ্যালঘুদের সমস্যা।
৩. সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং নতুন ধনিক শ্রেণী ও সর্বহারা শ্রেণীসহ পেছনে পড়ে থাকা জনগোষ্ঠীর মধ্যকার পৃথকীকরণের সমস্যা।
৪. বলিষ্ঠ নাগরিক সমাজ সৃষ্টিতে সমস্যা।
৫. আন্তর্জাতিকভাবে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সঙ্গে সংযুক্তি এবং গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিসমূহ থেকে বিযুক্তির সমস্যা।

অনেক জটিল ঐতিহাসিক কারণে এসব সমস্যা অমীমাংসিত থাকা বা বিগত কিছু দশকে বড়জোর এসব সমস্যা সমাধানে আংশিক প্রচেষ্টার বিষয়টি গভীর বিতর্কের বিষয়বস্তু। এই বিতর্কে না জড়িয়ে আমি রাজনৈতিক ও নাগরিক সংস্কৃতি বিনির্মাণের সমস্যা সম্পর্কে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই, যার সমাধান না করে

বিশ্বের কোথাও গণতন্ত্র কাজ করতে পারে না। আমি এটা করছি এ কারণে নয় যে আমি বিশ্বাস করি, আমাদের জিনের মতো এ সংস্কৃতি অপরিবর্তনীয় কোনো বিষয় নয়। বরং জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে সংস্কৃতি সৃষ্টি করা সম্ভব। বলা যায় এটি মানবসৃষ্ট। অধিকন্তু সেখানে যুক্তি-তর্কের ঐতিহ্যসহ দেশীয় সম্পদ আছে, যা অমর্ত্য সেন এবং অন্যরা বিশেষভাবে লক্ষ করেছেন।

সম্ভবত, সূক্ষ্ম পর্যায়ে এ সমস্যার সর্বোত্তম চিত্রায়ণ দেখা যায় অধ্যাপক আহরাব আহমেদের লেখায়। তাঁর ভাষায়, 'বাংলাদেশের সমস্যা কোন দল রাষ্ট্র পরিচালনা করে তা নয়, বরং কোন শ্রেণী থেকে নেতৃত্ব আসে এবং তারা আচরণগত বা দৃষ্টিভঙ্গিগতভাবে কোন ধরনকে প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা এমন একটি সমাজে বাস করি, যেখানে অভিজাতদের অস্বাভাবিক ভোগ, ঔদ্ধত্য, সংস্কৃতি, হতাশাবাদ এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আইনকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য 'মর্যাদা ও ক্ষমতার' নমুনা হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি এমন একটি পরিবেশ যেখানে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এবং দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতি সমানভাবে জায়মান।'

আমাদের নেতারা তাঁদের সঙ্গে মতের অমিল হওয়া যেকোনো ব্যক্তির দেশপ্রেমে সংশয় প্রকাশ করেন, তাঁরা তাঁদের বাকসর্বস্ব জবানিতে ষড়যন্ত্র শব্দটিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন এবং বিরোধী পক্ষকে অবজ্ঞাসূচক অসহিষ্ণুতা এবং ক্ষুদ্র প্রতিহিংসার মাধ্যমে হেনস্তা করেন।

নেতারা ভাষার অলংকারের মাধ্যমে যেভাবে নিজেদের উপস্থাপন করেন এবং পরে কীর্তিকলাপে উদাহরণ সৃষ্টি করেন, তার মধ্যে প্রায় স্ববিরোধিতা দেখা দেয়। নমুনাস্বরূপ, আপাতভাবাবেগে তাঁরা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির কথা বললেও সন্তানদের পাঠান ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে, তাঁরা পরিবেশগত সংকটে ব্যাপক উচ্চকণ্ঠে কথা বলেন কিন্তু নাগরিক যাতনার ব্যাপারে কোনো রূপ কর্ণপাত না করে উঁচু উঁচু দালান নির্মাণ করেন। তাঁরা নৈতিক স্বচ্ছতার কথা হরহামেশা বলে থাকেন, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক অবৈধ সুবিধা এবং ঘুষ গ্রহণের নৈতিক টিকিটিকে উপেক্ষা করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা দেখেন না।

তাঁরা উত্তেজনা, সংঘর্ষ ও নৈরাজ্যের রাজনীতির চরম নিন্দা করলেও প্রথম সুযোগে আবার তাঁরাই তাতে যুক্ত হন। তাঁরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে গৌরবান্বিত করে অথচ সংসদকে অবমাননা করতে দ্বিধা করেন না, তাঁরা ধর্মকে ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার বলে মসজিদ ও রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট দেয়ালের কথা বলে অথচ সৌদি আরবে তাঁদের ঘন ঘন সফর নিশ্চিত করেন এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। তাঁরা জনগণের সঙ্গে চিরকালীন সংহতি প্রকাশ করেন কিন্তু জনগণের ওপর আরোপিত নীতি এবং রাজনৈতিক কৌশলের কারণে সৃষ্ট ভোগান্তির ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপ করেন না। তাঁরা গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় ব্যাপক

সোচ্চার অথচ সাংবাদিকদের লেখনীতে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো তথ্য বেরিয়ে এলে সাংবাদিক পেটাতে এমনকি তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে দ্বিধা করেন না। তাঁরা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং অন্যের প্রতি আদর্শিক অঙ্গীকারকে উৎসাহ দেন কিন্তু নিজেকে হীন ঝগড়াঝাঁটি এবং অসম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে নিবৃত্ত করেন না। একই সঙ্গে পরিবর্তনশীল মৈত্রী এবং ভাসমান আনুগত্যের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক সুযোগ-সুবিধার জন্য 'বহুরূপী' হিসেবে নিজেদের ভোল পাল্টাতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। রাজনৈতিক অভিভাবকেরা সহজেই বুদ্ধিবৃত্তিক সত্যকে জলাঞ্জলি দেন এবং অন্যের কাজকে ভণ্ডামি তকমা দিয়ে তাকে 'ষড়যন্ত্রকারী' প্রতিপন্ন করেন। তাঁরা এতই ক্ষমতালোভী যে কোনো নৈতিক কর্তৃত্বের ধার ধারেন না। তাঁদের মধ্যে অবশ্যই অসাধারণ ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বও আছে। যা হোক, সাধারণত তাঁদের সামষ্টিক প্রয়াসে উত্তরাধিকারভিত্তিক চৌর্যবৃত্তির মাধ্যমে একটি সহযোগী পুঁজিবাদের উন্মেষ ঘটে এবং রাজস্বপ্রত্যাশী শোষক রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটে। যেটি পুরোপুরি 'ব্যর্থ' না হয়ে কিছু সময় ধরে টিকে থাকার সংগ্রাম করছে। একই নেতৃত্বদানকারী শ্রেণীর হাতে একই নির্দেশনায় এই দেশ পরিচালিত হচ্ছে। যদি আমরা শিয়ালের হাতে মুরগির খোঁয়াড় রক্ষার দায়িত্ব দিই, তাতে কোন দল ক্ষমতায় আসে, প্রশাসনিক কী পরিবর্তন হয় এবং কোনো জায়গায় কোনো কার্যবিধি কার্যকর হয় কি না, তা চিন্তিত হওয়ার কি কোনো মানে হয়? আর যদি আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা অভিজাতদের কর্মকাণ্ড, আচার-আচরণ এবং মূল্যবোধসহ সার্বিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তনে বিশ্বাসযোগ্য উপায় বের করতে না পারি, তবে গণতান্ত্রিক সম্প্রীতি সন্দেহজনক হবে। এটা মনে রেখে আমাদের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎকে টেকসই ও বিশ্বাসযোগ্য করতে আমি দশটি কৌশলগত প্রশ্ন উপস্থাপন করছি, যার উত্তর না মিলিয়ে আমরা সামনে এগোতে পারব না :

১. নাগরিক সমাজ ও রাষ্ট্র কীভাবে জীবনের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, নাগরিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও করপোরেট গোষ্ঠীর সম্পত্তির সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেবে?
২. কীভাবে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা যায় এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের দুষ্টচক্র থেকে বের হয়ে আসা যায়?
৩. নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা কীভাবে প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা যায়?
৪. কীভাবে সংসদীয় ব্যবস্থাকে কার্যকর করা যায়?
৫. অবকাঠামো, শিল্পায়ন এবং সার্বিক মানব উন্নয়নে কীভাবে সর্বোচ্চ সামাজিক বিনিয়োগ নিশ্চিত করা যায়?
৬. কীভাবে আমলাতন্ত্র, সশস্ত্র বাহিনী এবং পুলিশ বাহিনীকে জবাবদিহির মধ্যে নিয়ে আসা যায়?

৭. জনগণের ক্ষমতায়ন এবং সেবা প্রদানে স্থানীয় সরকারকে কীভাবে কার্যকর করা যায়?
৮. স্বতন্ত্র বিচার বিভাগ শক্তিশালী করে কীভাবে দুর্নীতি ও লোভ পদ্ধতিগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়?
৯. উৎপাদনশীল এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন নাগরিক তৈরিতে কীভাবে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করা যায়?
১০. সার্বিক মানব ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে কীভাবে দারিদ্র্য কমিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থবহভাবে পুরো উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করানো যায়?

বাংলাদেশ পূর্ব এশীয় কৌশলগত পথে নেই অথচ সে পথে যাওয়া দরকার

আশির দশকের মাঝামাঝি না হলেও মধ্য নব্বই দশক থেকে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে প্রবৃদ্ধির হার বাড়াতে বেশ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। অবশ্য প্রতিবছর দেশকে ৫-৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির হারে উন্নীত করতে পূর্ব এশীয় দেশগুলোর ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় কঠিন কিছু নয়। তবে পূর্ব এশীয় প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রীয় দিক, বিশেষত মাধ্যমিক ও চূড়ান্ত পর্যায়ে শিল্পায়নপ্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের সঙ্গে সমন্বয়সাধন করে ব্যাপকভিত্তিক কাঠামোগত পরিবর্তনের দিক থেকে বাংলাদেশ অনেকখানিই পিছিয়ে যাচ্ছে। পূর্ব এশীয় প্রবৃদ্ধি কর্মসংস্থানমুখী শিল্পায়নকে এগিয়ে নিতে কৃষির বোঝাস্বরূপ জনশক্তিকে দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছিল। এ রকম কৌশল কৃষির শ্রম উৎপাদনশীলতা ও অর্থনীতির অন্য খাতের শ্রম উৎপাদনশীলতার মধ্যকার ব্যবধান কমিয়ে এনেছিল। এমনকি আমরা যদি জাতীয় হিসাবের পদ্ধতিগত পরিবর্তন করি, যার ফলে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় দ্বিগুণের চেয়ে অধিক হয়েও যায় এবং বিনিয়োগ হার অব্যাহত উর্ধ্বমুখী হওয়ার বিষয়টিকে উপভোগ করি, তবু পূর্ব এশীয় দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের সঞ্চয়ী বিনিয়োগের কার্যকারিতা কম। যেখানে পূর্ব এশীয় দেশগুলোতে ব্যাপক উর্ধ্বমুখী বিনিয়োগ কালেস্কিয়ান ভঙ্গিতে (Kaleckian fashion) অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়কে বাড়িয়ে তুলেছে, সেখানে ধীরে ধীরে লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের দুর্বল প্রণোদনা ও লাভযোগ্যতার শক্তিশালী অবস্থানগত প্রামাণিক ঘাটতির কারণে যথেষ্ট পরিমাণ সঞ্চয়ও পুঁজি পাচারে পর্যবসিত হয়। উন্নয়নের তুলনামূলক পর্যায়ে পূর্ব এশীয় বিনিয়োগ হার প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনশীল খাতের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে এবং বৃহৎ উৎপাদনশীল অবকাঠামো নির্মাণে অর্থ জোগান দিয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, বাংলাদেশে অপ্রতুল বিনিয়োগই হলো প্রত্যক্ষ উৎপাদনশীল খাত এবং সার্বিক অবকাঠামো উন্নয়নে প্রধান বাধা। বাংলাদেশে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি পরিমাণগত দিক থেকে যথেষ্ট। কিন্তু

স্বীকার করতে হবে, এ ক্ষেত্রে পূর্ব এশীয় রপ্তানি প্রবৃদ্ধির তুলনায় বৈচিত্র্য ও পুনঃপুন ব্যাপক কাঠামোগত পরিবর্তনের দিক থেকে ঘাটতি আছে। অবশ্য বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে, সুরক্ষিত বাজারব্যবস্থায় বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের রপ্তানি ছিল একটি ঐতিহাসিক দুর্বিপাক, যা বর্তমান বাণিজ্যিক পরিবেশের ওপর নির্ভর করতে পারে। এই খাতটি আর বেশি দীর্ঘস্থায়ীভাবে টেকসই হবে না। অধিকন্তু, রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং ধারাবাহিক বিদেশি সহায়তানির্ভরতা কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সম্পদ অভিশাপ প্রপঞ্চ তৈরি করছে, যা অতীতে সুদৃঢ় অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমে যথাযথভাবে মোকাবিলা করা হয়নি।

চীন বাদে পূর্ব এশীয় অগ্রগামী দেশগুলো অসমতা দূর করে মাথাপিছু জিডিপি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়। তবে বাংলাদেশে আয়ের দিক থেকে প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেলেও সম্পদের অসমতা বিদ্যমান। এটার অর্থ হলো, কোনো নির্দিষ্ট প্রবৃদ্ধি হারের তুলনায় দারিদ্র্য তুলনামূলক কম হারে কমছে, যা পূর্ব এশীয় দেশের চেয়ে ভিন্ন।

জনসংখ্যার দিক থেকে যদিও বাংলাদেশে সাম্প্রতিক দশকে জন্মহার প্রশংসনীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে, তবু এই অর্জনের বিস্তারের ব্যাপারে কিছু অনিশ্চয়তা আছে। এমনকি যদি এই অনিশ্চয়তা তিরোহিতও হয়, তবু একটি তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়, উন্নয়নের তুলনামূলক স্তরে পূর্ব এশীয় অর্থনীতি যে ধরনের জনমিতিক রূপান্তরে সমর্থ হয়েছিল, বাংলাদেশ সে ধরনের জনমিতিক রূপান্তর ঘটাতে পারবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে।

অবশ্যই এটা নিঃসংকোচে স্বীকার করতে হবে, বাংলাদেশের অনুসরণকৃত উন্নয়ন পথ আর পূর্ব এশীয় দেশগুলোর উন্নয়নধারা একই নয়। বাংলাদেশকে অবশ্যই নিছক বৃদ্ধির অকৌশল পরিত্যাগ করতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পূর্ব এশীয় কৌশল গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার মানে কী হতে পারে?

বাংলাদেশ অর্থনীতির একজন চিন্তাশীল পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে, 'স্বাধীনতার সময় থেকে বাংলাদেশ সব মানের দিক থেকে একটি আমদানি-বিকল্প শিল্পায়নপ্রক্রিয়ার (ISI) উত্তরাধিকারী। অতি মূল্যের বিনিময় হার, আমদানি কোটা, অভ্যন্তরীণ বাজারে শিল্পের উন্নয়নে উঁচু অথচ বিভিন্ন হারের সার্বিক সুরক্ষা এবং রপ্তানির বিপরীতে শক্তিশালী বৈষম্য (যা আসলে উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে রপ্তানি বোনাস স্কিম বাতিল হওয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত পণ্যের রপ্তানির অনুমোদন প্রাথমিক অর্থনীতিকে অবমূল্যায়নের দিকে নিয়ে যায়)। এই অর্থনীতি পণ্য এবং ফ্যাক্টর মার্কেট পরিচালনায় ব্যাপক প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রেখেছিল। এ ক্ষেত্রে শিল্প ও আধুনিক সেবা উদ্যোগের গণমালিকানা ছিল ব্যাপক, আরোপিত দাম এবং বণ্টনে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ছিল সর্বব্যাপী, আধুনিক খাতে সুদের হার এবং মজুরি ছিল নিয়ন্ত্রিত এবং ব্যক্তি খাত বিবিধ নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।'

এটা স্পষ্টভাবে বলা যায়, সত্তরের দশক এবং তৎপরবর্তী সংস্কারপ্রক্রিয়া অর্থনীতিতে কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি এনেছিল। নব্বই দশকের বাণিজ্যব্যবস্থা কোটার বিলোপ, শুল্ক হারের ব্যাপক হ্রাসসহ বিনিময় হারের উদারনীতিকরণ ঘটিয়েছিল।

আইএসআই পদ্ধতির প্রণোদনার ব্যাপারে চূড়ান্ত বিরতির পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যক্তি খাত ও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগে জোর এবং অধিকাংশ শিল্পকারখানা, ব্যাংক ও বীমা কোম্পানির বেসরকারীকরণের মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নব্বই দশক থেকে রেশনব্যবস্থাসহ খাদ্যপণ্য ও কৃষিপণ্যের গণবণ্টন বিলুপ্ত হয়। আর্থিক দিক থেকে দেশে বাজার হারের সঙ্গে সংগতি রেখে আসল সুদের হার বেড়ে গিয়েছিল এবং কৃষি ভর্তুকি কমে গিয়েছিল। যদিও এসব পদক্ষেপের বিপরীতে বিকল্প সামঞ্জস্যশীল নীতি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়নি। এ ক্ষেত্রে এ আর খানের মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য :

> আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলোর অনুপ্রেরণায় অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও সংস্কার কার্যক্রম হিসেবে উচ্ছেদন কাজ সমাপ্ত করার টার্গেট নির্ধারণ করে। এ সংস্কারের পেছনে যে গোঁড়ামি আসলে কাজ করে তা হলো কোনো বিকল্পই জরুরি নয়: দাম, সুদ এবং মজুরির 'সঠিক' হার প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সঠিক সঞ্চয়, বাইরে থেকে পুঁজি আহরণ এবং বিনিয়োগের লাভযোগ্যতাকে উৎসাহ প্রদান করে। এখানে একে অপরের কাজকর্মে অল্প-স্বল্প প্রণোদনা এবং নির্দিষ্ট ধরনের রপ্তানির ক্ষেত্রে নির্বাচিত সহায়তা থাকে। কিন্তু এখন অতীতের আইএসআই প্রক্রিয়ায় প্রণোদনার বিপরীতে ক্ষতির ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট কম। একই সঙ্গে শিল্পের বিকাশকালে যে ধরনের দুর্ভোগ পোহাতে হয়, তা পরিবর্তনেও প্রণোদনা কম। এমনকি আমদানির বিপরীতে রপ্তানিতে কার্যকর বিনিময় হার প্রদানের ব্যাপারে আদৌ বাণিজ্যব্যবস্থার কার্যকর উদ্যোগ থাকবে কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে।

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক সংকটের পর এটা স্পষ্ট যে ওপরের তাৎক্ষণিক দৃষ্টিভঙ্গি বাজারব্যবস্থার ফলপ্রসূতা সম্পর্কে সরল বিশ্বাস মারাত্মকভাবে মহাদুর্ভোগের কারণ হচ্ছে। দুর্ভাগ্যক্রমে ওয়াশিংটন মতৈক্যের (Washington Consensus) এসব আরোপণ মুক্তবাজারে কার্যকর সম্পদ বণ্টনের মাধ্যমে তাদের নির্ধারিত প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা মেটাতে ব্যর্থ হয়েছে। এ বিষয়ে খানের যুক্তি দেখা যাক: 'অর্থনৈতিক তত্ত্ব এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস এমন এক আদিম গোঁড়ামিতে পড়ে আছে, যা আমাদের শেখায় কেবল মুক্তবাজার ও মুক্তবাণিজ্যমুখী সংস্কারই পর্যাপ্ত প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করবে। অর্থনৈতিক তত্ত্বে বাস্তবে এমন অনেক অনুমানও আছে, যা মুক্তবাজারে 'বাজার ব্যর্থতার' সর্বব্যাপী প্রপঞ্চের কথা বলে। অবশ্য এসবের অধিকাংশই উন্নয়নশীল অর্থনীতির বেলায় প্রযোজ্য। পুরো উন্নয়নের ইতিহাসে

এমন কোনো সফল উন্নয়ন নমুনা পাওয়া যাবে না, যা উন্নয়ন তথা শিল্পায়নপ্রক্রিয়ায় ব্যাপক প্রণোদনা দাবি করে। বিষয় হলো, বাংলাদেশে বাজার সংস্কার বাস্তবায়িত হলেও তা একটি সমন্বিত প্রণোদনাব্যবস্থার মাধ্যমে শিল্পায়ন এবং রপ্তানির উন্নয়ন ঘটায়নি। বস্তুত শিল্পপ্রক্রিয়ার উন্নয়নে আইএসআই ব্যবস্থা ছিল একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা। যখন বিদ্যমান ব্যবস্থায় সুরক্ষিত শিল্পের উচ্চ লাভযোগ্যতা এবং রাজস্বের যথাযথ প্রয়োগে সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছিল, তখন উচ্চ মুনাফা হারের এই সুরক্ষিত সঞ্চিত সম্পদ প্রত্যক্ষ বিনিয়োগে কাজে লেগেছিল। সমস্যা হলো, এটা অদক্ষতা এবং অসম সুরক্ষায় অপচয়মূলক সম্পদ বণ্টন, রপ্তানি-প্রতিকূল বৈষম্য এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বিযুক্তিকে ত্বরান্বিত করে। আইএসআই ব্যবস্থা বিলোপের অধিকার নিঃসন্দেহে আছে। তবে এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের বিপরীতে বিভ্রান্তি এবং অদক্ষতা এড়াতে একটি অগ্রগতিমূলক পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে।'

অধিকন্তু, এরশাদ কিংবা বিএনপি আমলের প্রথম দিককার 'সংস্কার' তাদের সমর্থকদের দাবির বিপরীতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। ঐতিহাসিক দলিল থেকে প্রতীয়মান হয়, সম্পদ বণ্টনেও যথেষ্ট অদক্ষতা ছিল। কোরনাই (Kornai) দেখিয়েছেন, যদি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অর্থনৈতিকভাবে যৌক্তিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে এজেন্টকে উদারীকৃত মূল্যে সাড়া দিতে উৎসাহ দেয়, তবে মূল্য সংস্কার বিপরীতমুখী ফল নিয়ে আসে, এটাই বোধ হয় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঘটেছে (কোরনাই, ১৯৮০)। এ ক্ষেত্রে নিচের মতটি মনোযোগ দাবি করে :

> তিনি যুক্তি দেখান মূল্য সংস্কার অর্থহীন যখন 'নমনীয় বাজেট বাধা' সর্বব্যাপী ভূমিকায় অর্থনৈতিক অনুঘটককে কার্যকরী হতে বাধা তৈরি করে। যে কেউ তর্ক তুলতে পারে অন্যান্য সংস্কারমূলক উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশে মূল্য সংস্কার এবং প্রণোদনার নির্দেশকগুলো সর্বব্যাপী আবেদন তৈরি করতে পারেনি এবং মৌলিক অনুঘটকের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সূচক তৈরির জন্য সম্পূরক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করতে পারেনি। নামমাত্র সুদ হারের উর্ধ্বমুখী অভিযোজনের একটি উদাহরণ বাজার দামে প্রতিফলিত ক্রেডিটের আসল দাম নিশ্চিত করতে পারে। এ জন্য ক্রেডিট বণ্টনের লক্ষ্যটি অধিকতর কার্যকরী হয়েছিল। অবশ্য ধারকারীর ক্রেডিট দামের দিক থেকে ওই উদ্দেশ্যের ফল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ধার করার প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন ঋণ-বাধ্যবাধকতার সঙ্গে কমপ্লায়েন্সের বিষয়টি নিশ্চিত করে না। প্রায়ই পৌনে শতাব্দীজুড়ে এই রকম বিচ্যুতি শাস্তির আওতায় আসেনি, যদিও পর্যায়ক্রমিক সরকারের আলংকারিক অনুশাসনে এ রকম আচরণে শাস্তির বিধান আছে। সাম্প্রতিক দশকের ইতিহাস প্রমাণ করে, সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা তো নেই, উপরন্তু রাজনৈতিক

ক্ষমতার অধিকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর ইচ্ছায় এটি তৈরি করতে আগ্রহীও নয়। ফলে দাম ও প্রণোদনা সংস্কারের বিষয়টির আইনি দিকগুলো অকার্যকর থেকে যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় সেবায় মূল্য সংস্কারের অন্য উদাহরণ সেবা প্রদান পদ্ধতির সম্পূর্ণ নিঃশেষ অবস্থারই ইঙ্গিত দেয়।

আইএসআই পদ্ধতির বিরুদ্ধে অন্যতম যুক্তি ছিল, এ ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক রাজস্ব আহরণে অভ্যন্তরীণ দাম এবং আন্তর্জাতিক দামের মধ্যে যে সংযোগস্থলটি (wedge) ভূমিকা রেখেছিল সেটি ছিল দুর্নীতি, অদক্ষতা ও উচ্চ লেনদেন খরচের উৎস। আইএসআইয়ের বিলোপ এবং ইচ্ছামূলক বাজারব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ কমানো প্রিমিয়ামের স্বল্পতা এবং অপব্যয়মূলক রাজস্ব আহরণ দূর করেছিল। এর মাধ্যমে বাস্তবে কেবল রাজস্ব আহরণের প্রকৃতিই পরিবর্তিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আমদানি লাইসেন্সের প্রিমিয়াম আত্মসাতের স্থানে ব্যাপক পরিমাণ 'এজেন্সি ফি' আত্মসাতের বিষয়টির কেবল বদল হয়েছে। ফলে, যেখানে সরবরাহকারীদের বিদেশি সহায়তা নির্ভরতার চেয়ে রাষ্ট্রীয় আমদানি দাম নিম্নতম পর্যায়ে রাখার জন্য নিলামে প্রতিযোগিতা করার কথা, সেখানে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতাপুষ্ট স্থানীয় এজেন্টদের কাছে ধরনা দিচ্ছে। অস্বচ্ছ সংগ্রহব্যবস্থা এসব আমদানির ওপর ব্যাপক প্রিমিয়ামস্বল্পতা তৈরি করে। রাষ্ট্রীয় সেবা প্রদানে অসংখ্য সংঘ সৃষ্টি এবং সর্বব্যাপী বিধি আরোপের মাধ্যমেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে পুরো অর্থনীতির ভোক্তা ও বিনিয়োগকারীর ওপর উচ্চ লেনদেন ব্যয় আরোপ করা হয়েছে। একজন বিনিয়োগকারী কার্যক্রমের প্রতিটি স্তরে এসব খরচ প্রদানে বাধ্য : টেলিফোন সংযোগ পেতে, নির্মাণ অনুমতি পেতে, সরকারের ক্ষমতাপুষ্ট মাস্তানদের মাধ্যমে অবৈধভাবে পণ্য পরিবহনে এবং সর্বোপরি উপযোগিতা বিল ও কর প্রদানসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে খরচ প্রদানে বাধ্য হয়। আসলে এই লেনদেন হলো সুপ্ত মুনাফার মোটা রকম অংশ এবং এটিই পুঁজি পাচারের শক্তিশালী নেতিবাচক প্রণোদনা হিসেবে কাজ করে।

যদিও কোনো সযত্ন সংখ্যাতত্ত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব নয়, তবু যে কেউ সুশীল সমাজের সাম্প্রতিক দশকগুলোর বিবর্তিত আলোচনা থেকে এই ধারণা পেতে পারে যে দুর্নীতি বৃদ্ধি ও সুশাসনের অভাবে সেখানে এই রকম লেনদেন ব্যয় ব্যাপক পরিমাণ বেড়ে গেছে। এই সমস্যার সারসত্তা হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যা মুনাফা অর্জনে ক্ষমতার ইচ্ছামূলক চর্চাকে অনুমতি দেয়। আইএসআইয়ের অধীনে এটা আমদানি লাইসেন্স এবং বণ্টন পারমিটসহ প্রিমিয়াম আত্মসাতের ধরনে রূপ নেয়। এখন যে অর্থনৈতিক সংস্কার সাধিত হয়েছে, সেটাও 'গতানুগতিক' প্রিমিয়াম ধরনের মাধ্যমে নতুন আবিষ্কৃত পন্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে আরও ব্যাপক হারে রাজস্ব আত্মসাৎ করে। এই পদ্ধতি

আইএসআই পদ্ধতির চেয়ে অধিকতর লুণ্ঠনমূলক। উল্লিখিত সব অদক্ষতা সত্ত্বেও আইএসআইয়ের অধীনে রাজস্ব আত্মসাতের পদ্ধতি, যা আসলে রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে পুষ্ট করে, এর বিপরীতে সুরক্ষিত অভ্যন্তরীণ শিল্প-কারখানায় বিনিয়োগের শক্তিশালী প্রণোদনা দেয়, এমন উদ্যোক্তাও আছে। আজকের রাজস্ব আত্মসাতের সর্বব্যাপী পদ্ধতি বিনিয়োগকারীদের ওপর ব্যাপক পরিমাণ লেনদেন ব্যয় আরোপ করে এবং অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের পুঁজি পাচারে শক্তিশালী প্রণোদনা সৃষ্টি করে। আমি দুর্নীতির বিশালত্বের চেয়ে এই প্রবৃদ্ধি-প্রতিকূল দুর্নীতির ওপর বেশি জোর দিতে চাই।

শিক্ষা এই যে রাজস্ব আত্মসাৎ, দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নেতিবাচক দিকগুলো আপনা-আপনি আসে না। বরং সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও লক্ষ্যাভিমুখী পরিকল্পনার অভাবে এই প্রবণতাগুলো তৈরি হয়। আইএসআইয়ের অধীনে এই কল্পনাসাধ্য রাজস্ব আত্মসাৎকারী ব্যবস্থা সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে আমদানি লাইসেন্সের নিলাম এবং বাজার-উদ্দীপক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কমানো সম্ভব। বিপরীতক্রমে, উদারনৈতিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও আবশ্যিকভাবে রাজস্ব আত্মসাৎ এবং দুর্নীতি কমাতে পারে না। এমনকি যদি সরকার প্রিমিয়াম আত্মসাতের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং বাজারবহির্ভূত পদ্ধতিতে এটার প্রবেশ অব্যাহত রাখে, তবে কোনোভাবে রাজস্ব আত্মসাৎ এবং দুর্নীতি কমানো যাবে না। অভিজ্ঞতা বলে, এ রকম সুযোগ-সুবিধা অশেষ। সুরক্ষিত প্রতিরক্ষায় বিষয়টি ব্যাখ্যা করলে অদক্ষতা ও অসমতার মতো অসংখ্য যৌক্তিক পাটাতনে আইএসআই পদ্ধতি সহজেই বাতিলযোগ্য। যদিও আইএসআইয়ের পরিবর্তে উদার বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আপনা-আপনি প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি এবং রাজস্ব আত্মসাৎ ও দুর্নীতির সমাপ্তি ঘটবে, এমন ভাবাটাও খুব বোকামো হবে।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, সংস্কারের ব্যর্থতা কেবল দ্রুত শিল্পায়নকে প্রবর্তন করেনি বরং বর্ধিত অসমতাবিশেষ ব্যাপক রাজস্ব আত্মসাতের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে পূর্ব এশীয় নীতিগুলোর তুলনামূলক আলোচনায় অসম প্রবৃদ্ধির অধিকতর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। পূর্ব এশীয় দেশগুলোর মতো বাংলাদেশে প্রাথমিক ভূমি পুনর্বণ্টন হয়নি। যে কেউ এই ভুলের ন্যায্যতার মুখোমুখি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তি দেওয়া হয়, পূর্ব এশীয় দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের শর্তাবলি অনুকূলে নয়। যখন এই যুক্তি যথেষ্ট সত্যতা অর্জন করতে পারে, তখন বাংলাদেশের কোনোভাবেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমি সংস্কারের সুযোগটি এড়িয়ে যাওয়া উচিত ছিল না। ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে যুক্তি প্রচলন আছে, দেশে ভূমির স্বল্পতা বিশেষত পুনর্বণ্টিত জমি এত কম যে তা ভূমি

সংস্কারের জন্য খুবই অপ্রতুল। সে সময়ে বাংলাদেশের মতো কোরিয়া, তাইওয়ান ও চীনে জমিস্বল্পতা থাকলেও সেসব দেশ ভূমি সংস্কার অব্যাহত রেখেছে। জমির পর্যাপ্ততার তুলনায় যেখানে জমির স্বল্পতা বিদ্যমান, সেখানে সমতাভিত্তিক জমি বণ্টন খুবই জরুরি। এ কারণে জমিস্বল্পতা জমির সমানাধিকারের ক্ষেত্রে শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। এ অবস্থায় অসম জমি বণ্টন কৃষিভিত্তিক আয়ের অসম বণ্টনেরই ইঙ্গিত দেয়। ভূমি সংস্কারের দ্বিতীয় যুক্তি, যেটি বাংলাদেশের জন্য বেশি উপযোগী তা হলো, কোরিয়ায় যেমন পূর্বতন জাপানি মালিকানার সম্পদ ও জমিগুলো রাষ্ট্রীয়ভাবে অধিগ্রহণ করে জনগণের মাঝে সমভাবে বণ্টন করা হয়েছিল, সে পথে বাংলাদেশেরও যাওয়া উচিত। এখানে বাংলাদেশ কোরিয়া কিংবা তাইওয়ানসহ অন্য দেশগুলোর চেয়ে খুব বেশি সুবিধা পায় না। স্বাধীনতার সময়ে বাংলাদেশ পূর্বতন পাকিস্তানি মালিকানার একটা বিরাট অংশ রাষ্ট্রীয়ভাবে অধিগ্রহণ করেছিল। এই সম্পদগুলো পূর্ব এশিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে বণ্টিত হলে দেশের অর্থনীতিতে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারত। এই সম্পদ লুণ্ঠন এবং জাতীয়করণের নামে ব্যাপক অব্যবস্থাপনায় পতিত হয়।

বাংলাদেশে ভূমি বণ্টন চরম অসমভাবে চলমান। কিন্তু নব্বইয়ের দশকে বর্গাজমির বৃহত্তর সমতা ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এর ফলে প্রত্যক্ষ খামার আয় ব্যাপকভাবে উন্নীত হয়, যদিও অসম রাজস্ব আয়ের কারণে এর মোট আয়ের বড় অংশই নিম্নমুখী হয়।

নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান এবং স্বচ্ছন্দ কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টিতে বাধা তৈরি করে। খানের ভাষায়, 'অসমতা সৃষ্টিতে অন্য অনুঘটক হলো কারখানা ও আধুনিক উচ্চতর কাজের ব্যাপক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যর্থতা। আগেই আলোচনা করা হয়েছে, মজুরি হলো আয়ের কতিপয় উপাদানের অন্যতম, যা বাংলাদেশে আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে সমতামূলক প্রভাব রাখে। এখানে কেবল শিল্প খাতে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হয় তা নয়, বরং এটি কর্মসংস্থান-বৈরী পরিবেশ তৈরিকেও ত্বরান্বিত করে। সংস্কারের মাধ্যমে মুক্তবাণিজ্য সৃষ্টির পর শিল্প প্রবৃদ্ধিতে কর্মসংস্থাপন-বৈরিতা তৈরি হওয়ার বিষয়টি শ্রমঘন অর্থনীতির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির অর্থনৈতিক তত্ত্বের বিপরীতে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? মনে হয়, অতীতের রাষ্ট্রীয় মালিকানার সময়কার শিল্প খাতের প্রাথমিক শর্তের মধ্যেই এর ব্যাখ্যা লুকিয়ে আছে, যখন দক্ষতার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল। ১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯৯-২০০০ সালের জনশক্তিসম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট জরিপে উৎপাদন খাতে কর্মসংস্থানের ব্যাপক হ্রাসে পুরো কর্মসংস্থানপ্রক্রিয়ায় নিম্নতম প্রবৃদ্ধির বিষয়টি তুলে ধরে। এটা সর্বতোভাবে পূর্বেকার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উদ্বৃত্ত-শ্রমের ছায়ার কারণে হয়েছিল। এই সংস্কারের

প্রতিকূল বণ্টনগত প্রভাব পরিবর্তনে সযত্ন-ক্ষতিপূরণমূলক নীতি প্রণয়ন জরুরি ছিল। কিন্তু সেখানে এ রকম তেমন কোনো নীতিই গৃহীত হয়নি। শিল্প খাতে নিম্ন কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধির প্রধান কারণ হলো নিম্ন শিল্প প্রবৃদ্ধি। শিল্প খাত যদি ব্যাপক পরিমাণে গড়ে ওঠে তবে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানে উদ্বৃত্ত ব্যক্তিগত সামগ্রিক বেতনের রূপান্তর সমস্যা দূর করা সহজতর হবে। পূর্ব এশীয় দেশগুলো এবং বাংলাদেশের বণ্টনগত নীতির অন্য পার্থক্য হলো, মানবপুঁজির সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিতে দুর্বল সক্ষমতা। নিঃসন্দেহে এটা বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে প্রধান বাধা।'

সুশাসন সম্পর্কে বিশ্বব্যাংক এবং অন্য সংস্থাগুলো অনেক কথা বলে। নিঃসন্দেহে সুশাসন জরুরি। কিন্তু বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের চ্যালেঞ্জ হলো উত্তম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তবসম্মত দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। অনেক কিছুই করা বাকি থাকলেও বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনৈতিকভাবে সচেতন নবপ্রজন্ম সামাজিক ন্যায়বিচার, অবকাঠামো উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষা এবং বিদেশনির্ভরতা কাটাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। উচ্চপর্যায়ে দুর্নীতিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কৃষকদের যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে সমতাভিত্তিক উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ দেশকে সংহত রাজনৈতিক অর্থনীতি গঠনে বহুদূর নিয়ে যাবে। শহরে মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী শ্রেণী এবং গ্রামীণ কৃষক ও জমি-ধনের অধিকারী দেশপ্রেমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তি গঠনে অবশ্যই নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে। এসব শ্রেণীর সার্বিক সহযোগিতায় সক্ষমতা বৃদ্ধির উন্নয়ন প্রবণতা ব্যাপকতর ও গভীরতর করা জরুরি। জাতি গঠনের জন্য সমাজ থেকে জনবিরোধী উপাদান দূর করে বিদ্যমান দেশপ্রেমিক ও ত্যাগী নেতৃত্বের সঙ্গে একদল তরুণ নেতৃত্ব গঠন মুক্তিসংগ্রামে শহীদদের কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা গঠন সম্ভবপর করবে।

অনুবাদ : হুমায়ুন কবির

গ্রন্থপঞ্জি

Bangladesh Bureau of Statistics, *National Accounts Statistics (Gross Domestic Product, 2000-2001)*, Dhaka June 2001.

Bruton, 1998. Bruton, Henry J., "A Reconsideration of Import Substitution", *Journal of Economic Literature*, Vol. 36, No.2.

Chang, 2002. Chang, Ha-Joon, *Kicking Away the Ladder:*

Development Strategy in Historical Perspective, London, Anthem Press.

Chang, H.-J. ed.(2007) Institutional Change and Economic Development, UNU press, Tokyo.

Cline, William R. (1982). "Can the East Asian Export Model of Development Be Generalized?", *World Development*, Vol.10, no.2 pp.81-90.

Emmerij, 1987. Emmerij, Louis (Editor), *Development Policies and the Crisis of the 1980s*, OECD, Paris 1987.

Fields, 2001. Fields, Gary S., *Distribution and Development*, *a New Look at the Developing World,* The MIT Press, Cambridge.

Government of Bangladesh, Ministry of Finance (GOB, MOF), *Bangladesh Economic Survey,* 2000, 2003 and 2007.

GOB, MOF, 2003. GOB, MOF (Economic Relations Division), *Bangladesh: A National Strategy for Economic Growth, Poverty Reduction and Social Development,* Dhaka, March 2003.

Griffin, Khan and Ickowitz, 2002. Griffin, Keith, A. R. Khan and A. Ickowitz, "Poverty and Distribution of Land", *Journal of Agrarian Change,* July 2002.

Griffin, Khan and Ickowitz, 2004. Griffin, Keith, A. R. Khan and A. Ickowitz, "In Defence of Neo-Classical Neo-Populism", *Journal of Agrarian Change*, July 2004.

Islam, 2007. Islam, Rizwanul, "What Kind of Economic Growth is Bangladesh Attaining?", ILO, Geneva.

Jomo K. S. ed. (2007). *Malaysian Industrial Policy.* Singapore University Press, Singapore, and University of Hawaii Press, Honolulu.

Jomo K. S., Chang Y. T., Khoo K. J. with others (2004). *Deforesting Malaysia: The Political Economy and Social Ecology of Agricultural Expansion and Commercial Logging*. Zed Books, London.

Jomo K. S. ed. (1995). *Privatizing Malaysia: Rents, Rhetoric, Realities*. Westview Press, Boulder.

Jomo K. S. with Shyamala Nagaraj eds. (2001). *Globalization Versus Development: Heterodox Perspectives*. Palgrave, Houndmills.

Jomo, K.S. and Wee (2008) "Lessons From Post-Colonial Malaysian Economic Development",
paper prepared for WIDER conference on Country Role Models for Development Success, June13-14, Helsinki

Khan, 1988. A. R. Khan, "Population Growth and Access to Land", in Lee, Ronald D. et. al. (editors), *Population, Food, and Rural Development,* Clarendon Press, Oxford.

Khan and Hossain, 1989. Khan, A. R. and M. Hossain, *The Strategy of Development in Bangladesh,* Macmillan and OECD Development Centre, London.

Khan and Riskin, 2001. Khan, A. R. and Carl Riskin, *Inequality and Poverty in China in the Age of Globalization*, Oxford University Press, New York.

Khan and Sen, 2001, Khan, A. R. and Binayak Sen, "Inequality and Its Sources in Bangladesh, 1991/92 to 1995/96: An Analysis Based on Household Expenditure Surveys", *The Bangladesh Development Studies*, March 2001. 30

Khan and Sen, 2006. Khan, A. R. and Binayak Sen, "The Structure and Distribution of Personal Income and Poverty Reduction: A Case Sudy of Bangladesh during the 1990s",
in Boyce, James et al. (editors), *Human Development in the Era of Globalization, Essays in Honor of Keith Griffin,* Edward Elgar, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA.

Keynes, J. M.(1971-79), *The Collected Writings of John Maynard Keynes,* 29 vols., ed., D. E. Moggridge for the Royal Economic Society, London: Macmillan.

Khan HA (2008a). "Building an Innovative Economy through Managed Creative Destruction: A Theory with Applications to South Korea". Accessed April 2008 at:
http://econpapers.repec.org/paper/pramprapa/7713.htm

Khan ,H.A. (2008b) "Making Globalization Work: Towards Global

Economic Justice", Cosmopolis, May 2008
http://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/7864.html

Khan,H. A. (2008c) "China's Development Strategy and Energy Security", WIDER research Paper http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/research-papers/2008/en_GB/research_papers_2008/

Khan, H. A. 2005, "Case Studies in Globalization, Convergence, and Superconvergence of Emerging Technologies", presentation at the International Workshop on Emerging Technologies: The Global Challenges of Convergence, Bangkok,14-15 Dec.2005. http://www.apecforesight.org/emerging_tech/docs/HaiderPresentation_Dec05.ppt

Khan, H. A (2002) "Innovation and Growth in a Schumpeterian Model", *Oxford Development Studies*, Vol. 30, no. 3, 2002: 289-306.

Khan HA (2004a). *Innovation and Growth in East Asia: The Future of Miracles.* Houndsmills and New York: Macmillan/Palgrave.

Khan HA (2004b). *Global Markets and Financial Crisis in Asia: Towards a Theory for the Twenty First Century*. Houndsmills and New York:Macmillan/Palgrave.

Khan HA (2003a). "Technology and Modernity: Creating Social Capabilities in a POLIS," In Misa T ed. *Technology and Modernity*, Cambridge: The MIT Press, Chapter12.
———-(2003b) "What can the African Countries Learn from the Macroeconomics of Foreign Aid in Southeast Asia?", Aryeetey, E., Court, J., Nissanke, M. and Weder, B., *Asia and Africa in the Global Economy*, Tokyo, UNU Press.

Khan HA (1998). *Technology, Development and Democracy: Limits to National Innovation Systems in the Age of Postmodernism*. Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar.

Khan HA (1997). *Technology, Energy and Development: The South Korean Transition*. Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar.

Khan HA(1983) "Technology, Energy, Distribution and Balance of Payments:A Macroeconomic Framework", Unpublished dissertation, Cornell University, Ithaca, New York.

Kornai, 1980. Kornai, J., *Economics of Shortage*, New York, North-Holland.

Lee, Keun (2008) "Can Korea be a Role Model for Development? A "Capability-based View" on Korea", paper prepared for WIDER Conference on Country Role Models for Development Success, June13-14, Helsinki

Lee, Keun, 2006, "The Washington Consensus and East Asian Sequencing : Understanding Reform in East and South Asia," in J. Fanelli and G. McMahon, eds. *Understanding Market Reforms* Vol. 2: Palgrave, 2006 .

Lee, Keun A., 2006, "Understanding Reform in 6 Asian Countries: Washington Consensus vs. East Asian Sequencing," J. Fanelli and G. McMahon, eds. *Understanding Market Reforms* Vol. 2: Palgrave.

Lee, K., Hanh D., and Yifu Lin J., 2002, "Is China following the East Asian Model? A Comparative Institutional Analysis Perspective", *China Review* 2: no.1.

Lee K., 2006 b , "China's Economic Catch-up: Washington Consensus or the Bejing Consensus", Selected Papers from the 2nd World Forum on China Studies (Abstracts), Panel 2, Exploration into the Theory and Practice of the Mode of China's Development, in http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN024930.pdf
Li-Hua R., 2008,, China's science and technology capacity building: global perspective and challenging issues (book review), Journal: *Journal of Technology Management in China*
Vol : 3 Issue: 1

Li-Hua R. and Simon D., 2007, Benchmarking China firm competitiveness: a strategic framework, *Journal of Technology Management in China*. Bradford: 2007. Vol. 2, Iss. 2.

Mahajan, 2007. Mahajan, Sandeep, *Bangladesh: Strategy for Sustained Growth*, World Bank (web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/SOUTHASIAEXT/O)
Rahman, 2007. Rahman, Rushidan Islam, "Pro-Poor Growth: Recent Evidence from HIES Data", Preliminary Draft, BIDS, Dhaka.

Razmi, Arslan and Robert Blecker (2006). "Developing Country

Exports of Manufactures:moving up the export ladder to escape the fallacy of composition?", *Journal of Development Studies*, Vol.44, No.1, January:21-48.

Thoburn, J.T. (2008), "Viet Nam", paper prepared for WIDER conference on Country Role Models for Development Success, June13-14, Helsinki.

Thoburn, J.T., K. Sutherland and Nguyen Thi Hoa (2007), "Globalisation and restructuring in the textiles sector on households in Vietnam: impacts on households?*" Journal of the Asia Pacific Economy*, vol.12, no.3, August,: 345-366

Warr, Peter (2008) "Thailand's Development Strategy and Growth Performance", paper prepared for WIDER conference on Country Role Models for Development Success, June13-14, Helsinki

Warr, Peter (1993), "The Thai Economy," in Peter Warr (ed.) *The Thai Economy in Transition,* Cambridge University Press, Cambridge, 1-80.

Warr, Peter (1999). 'What Happened to Thailand?', *The World Economy*, 22 (July), 631-650.

Warr, Peter (2005), "Boom, Bust and Beyond," in Peter Warr (ed.) *Thailand Beyond the Crisis*, Routledge, London, 3-65.

Weiss, John and H. A. Khan eds.(2006) *Poverty Strategies in Asia: A Growth Plus Approach,* Cheltenham: Edward Elgar and ADBI.

World Bank, 2006. "Poverty trends and patterns: preliminary results from the HIES 2005", August 13, 2006 (Transcript of Powerpoint presentation).

World Bank, 2007. *World Development Indicator*, 2007.

খাতি অর্থনীতি চিন্তা

বাংলাদেশের পোশাক খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা এবং সামাজিক অগ্রগতির একটি বিশ্লেষণ

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম
ফারজানা সেহরীন

সারসংক্ষেপ

আন্তর্জাতিক উৎপাদন চেইনে বাংলাদেশের পোশাক খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শ্রমিকসম্পর্কিত সামাজিক বিষয়ের অগ্রগতি হয়নি। ক্রেতানির্দেশিত উৎপাদন চেইনে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে প্রক্রিয়াগত এবং উৎপাদনগত উন্নয়নপ্রক্রিয়ায়। এ উন্নয়নে মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে উন্নত বিশ্বের বাজারসুবিধা এবং সরকারি বিভিন্ন সুবিধা, যা উদ্যোক্তাকে বিনিয়োগের দীর্ঘমেয়াদি দিকনির্দেশনা দিয়েছে। স্বল্প খরচে পোশাকশ্রমিকের প্রাপ্যতাও এ ক্ষেত্রে শ্রমনির্ভর উৎপাদনপ্রক্রিয়া বিস্তারে সহায়তা করেছে। কিন্তু শ্রমিকসম্পর্কিত সামাজিক এবং ভৌত কমপ্লায়েন্সের অগ্রগতি যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক ছিল না। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বিতর্ক, ওভারটাইম ভাতা প্রদান সমস্যা এবং অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা ইত্যাদি সমস্যা রয়েছে। দুর্বল কর্মপরিবেশ এখন পোশাক খাতের বড় প্রশ্ন। দ্রুত বর্ধনশীল এ খাতে যথাযথ নিরাপত্তার মান না মানা এ জন্য দায়ী। এ ক্ষেত্রে তদারককারী সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষের সুশাসনগত দুর্বলতা দায়ী। বর্তমানে কর্মপরিবেশের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম চলছে। যথাযথভাবে নির্দিষ্ট সময়ে এসব সংস্কার কার্যক্রম শেষ করা শ্রমিকের কর্মপরিবেশের নিরাপত্তার জন্য জরুরি। দীর্ঘ মেয়াদে তৈরি পোশাক খাতের উৎপাদন চেইনের জন্য এমন নীতিকাঠামো প্রয়োজন, যেখানে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে পর্যাপ্ত সামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : উৎপাদন চেইন, পোশাক খাত, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা, কমপ্লায়েন্স, শ্রমিক অধিকার, সামাজিক ইস্যু।

১. প্রারম্ভিক কথা

আন্তর্জাতিক উৎপাদন চেইনে স্বল্পোন্নত দেশের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। এর মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে অংশগ্রহণ আরও কম। বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। এ দেশের রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাত শুধু আন্তর্জাতিক উৎপাদন চেইনে অংশ নিচ্ছে তা নয়, এ খাত প্রতিযোগিতা সক্ষম এবং এর উত্তরোত্তর উন্নতি হয়েছে। আন্তর্জাতিক উৎপাদন চেইনে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে বিশ্ব পোশাক রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশের অংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ, যা তৃতীয় সর্বোচ্চ। তবে বিগত তিন দশকে পোশাক খাতের উৎপাদন চেইনে পণ্য উৎপাদনে গুণগত ও পরিমাণগত প্রবৃদ্ধি হলেও শ্রমিকসম্পর্কিত সামাজিক ইস্যুর অগ্রগতি বেশ কম (ভট্টাচার্য ও মোয়াজ্জেম, ২০১৩)। এ চিত্র শুধু বাংলাদেশের নয়, বরং স্বল্পোন্নত দেশের শিল্প খাতের অধিকাংশ উৎপাদন চেইনে প্রায়ই সামাজিক ইস্যুর ক্ষেত্রে একই অবস্থা বিদ্যমান।

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প হিসেবে রপ্তানিমুখী পোশাকশিল্পের অর্জিত অগ্রগতি এবং এর অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও সম্ভাবনা সার্বিকভাবে জাতীয় আয়, শিল্প খাতের প্রসার ও প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রভাব ফেলে। বর্তমানে এ শিল্পের মাধ্যমে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের ৪০ শতাংশ মূল্য সংযোজন, রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশ অর্জন এবং শিল্প খাতের প্রায় ৪০ শতাংশ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। রপ্তানিতে কতিপয় পোশাকপণ্যের প্রাধান্য থাকলেও বাড়ছে পণ্যবৈচিত্র্য, ব্যবহৃত কাঁচামালের বৈচিত্র্য, পরিবর্তন হচ্ছে উৎপাদন কৌশল এবং সার্বিকভাবে উন্নত হচ্ছে পণ্যের গুণগত মান। উল্লিখিত পরিবর্তনসমূহ দেশের পোশাকশিল্পের প্রক্রিয়াগত ও উৎপাদগত পর্যায়ে ধারাবাহিক উন্নতি নির্দেশ করে।

অন্যদিকে, পোশাক খাতের উৎপাদন চেইনে সামাজিক ইস্যুতে অগ্রগতি তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। সামাজিক কমপ্লায়েন্সের কোনো কোনো ক্ষেত্রে উন্নতি হলেও শ্রমিকদের কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা, শ্রম অধিকার এবং মজুরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেশ পিছিয়ে। দুর্ঘটনাজনিত কারণে প্রায়ই শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, বিশেষত সাম্প্রতিক কালে তাজরীন গার্মেন্টসে অগ্নিকাণ্ডে ১১২ জন এবং রানা প্লাজা ধসে এক হাজার ১৩৪ জন শ্রমিকের মৃত্যুর পর পোশাক কারখানার কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে উৎপাদন চেইনের অভ্যন্তরীণ শাসনকাঠামোর দুর্বলতা নিয়ে, বিশেষত দেশীয় আইনের দুর্বলতা, তার প্রয়োগে শিথিলতা, আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের নির্দেশকৃত নীতিকাঠামোর (কোড অব কনডাক্ট) ঘাটতি এবং দুর্বলতা নিয়ে। একটি আন্তর্জাতিক মানের উৎপাদন চেইনে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা এবং সামাজিক অগ্রগতির মধ্যকার টানাপোড়েন অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ইঙ্গিত করে।

আলোচ্য প্রবন্ধে পোশাক খাতের সার্বিক অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে শ্রমিকসংক্রান্ত বিষয়ের সামাজিক অগ্রগতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেকশন ২-এ আন্তর্জাতিক উৎপাদন চেইনে সামাজিক ইস্যুর অবস্থানের একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। সেকশন ৩-এ পোশাক খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেকশন ৪-এ পোশাক খাতের উৎপাদন চেইনে উন্নয়নের বিচ্ছিন্ন পর্যায় আলোচিত হয়েছে। সেকশন ৫-এ প্রতিযোগিতা সক্ষমতার চ্যালেঞ্জের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। সেকশন ৬-এ পোশাক খাতের সামাজিক অগ্রগতির বিভিন্ন ইস্যু, বিশেষত সামাজিক এবং ভৌত কমপ্লায়েন্স নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেকশন ৬-এ শ্রমিকসংক্রান্ত সামাজিক ইস্যুতে বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে সেকশন ৭-এ ক্রেতা, উদ্যোক্তা এবং শ্রমিকসম্পর্ক বিশ্লেষণ করে পোশাক খাতের টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে পরামর্শমূলক মন্তব্য করা হয়েছে।

২. আন্তর্জাতিক উৎপাদন চেইনে সামাজিক ইস্যুর অবস্থান : তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

আন্তর্জাতিক উৎপাদন চেইনে দক্ষতা বিচার করা হয় অর্থনৈতিক সক্ষমতার দিক থেকে। এ ক্ষেত্রে মূল বিচার্য বিষয়গুলো হলো : মূল্য সংযোজন, মূল্য বিভাজন এবং মূল্য অর্জন; যার সৃষ্টি হয় উৎপাদন, বিতরণ এবং খুচরা বিক্রয় পর্যায়ে (বেয়ার, ২০০৯; জেরেফি, ২০০৫; জেরেফি এবং ক্যাপলিন্স্কি, ২০০১)। উৎপাদন চেইনের দক্ষতাসম্পর্কিত প্রাথমিক পর্যায়ের গবেষণায় শুধু অর্থনৈতিক সক্ষমতার উক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হতো (ব্যারিয়েনটোস, দোলান ও টালেনিটাইর, ২০০৩; কাম্বারস, নাটিভেল ও রাউটলেজ, ২০০৮)। প্রাথমিক পর্যায়ে কারখানা পর্যায়ের দক্ষতাকে মূল বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করা হতো—শ্রমিকের 'শ্রম' যেখানে শুধু উৎপাদনের একটি অন্তর্গত উপকরণ হিসেবে গণ্য হতো। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক পণ্য উৎপাদনে শ্রমিকের সংখ্যা, শ্রম উৎপাদনশীলতা এবং শ্রমিকসম্পর্কিত ব্যয় বিবেচিত হতো। শ্রমিকের সামাজিক ইস্যু, বিশেষত কর্মস্থলে নিরাপত্তা, আইনি অধিকার, মজুরি ইত্যাদি বিষয় উৎপাদনকারী দেশের আইনি সুরক্ষার আওতায় হওয়ার কথা। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী দেশের আইনি দুর্বলতা এবং আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের গাফিলতিতে তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। অন্য কথায় প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হলেই সামাজিক ইস্যুর ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সক্ষমতা অর্জিত হবে, এমন নয়। এ প্রেক্ষাপটে শ্রমিকের সামাজিক ইস্যুগুলো আলাদাভাবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

শ্রমিককে সামাজিক এজেন্ট হিসেবে বিবেচনার ক্ষেত্রে শ্রমিকের সামাজিক ইস্যুগুলো বিবেচনায় নিতে হবে তাদের সক্ষমতা এবং প্রয়োজনের নিরিখে (সেন,

১৯৯৯, ২০০০)। প্রথমত, শ্রমিকের ভালো-মন্দ নির্ভর করে উৎপাদন চেইনে তার যে অধিকার রয়েছে, তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে দেশীয় আইনে বর্ণিত শ্রম অধিকার এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) নির্দেশিত আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো বিবেচনায় নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, আন্তর্জাতিক উৎপাদন চেইনে শ্রমিকের প্রয়োজন নির্ধারিত হয় শ্রমিকের গুণগত মান এবং প্রাপ্যতার ওপর; শ্রমিকের সামাজিক ইস্যু মেনে চলার ক্ষেত্রেও এর প্রভাব রয়েছে (মিলবার্গ এবং উইনকার, ২০০৮)। এ ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক উৎপাদন চেইনে যে ধরনের শ্রমিক ও দক্ষতা বিবেচনায় নেওয়া হয়, তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শ্রমিকের প্রাপ্য মজুরি এবং অধিকার প্রদান করা দেশীয় শ্রমবাজারের প্রেক্ষাপটে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

সার্বিকভাবে সামাজিক ইস্যুর অগ্রগতি এককভাবে পোশাক খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার দিক দিয়ে বিবেচনার সুযোগ নেই। সামাজিক ইস্যুর ক্ষেত্রে আলাদাভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

৩. বাংলাদেশের পোশাক খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা

৩.১ বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির পরিস্থিতি

রপ্তানি চিত্র : আশির দশক থেকে বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী পোশাক খাতের ধারাবাহিক অগ্রগতি ঘটেছে। বিজিএমইএর প্রকাশিত তথ্যমতে, সে সময় তিন শতাধিক কারখানার মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১১৬ মিলিয়ন ডলার, যা ছিল দেশের মোট রপ্তানির মাত্র ১২ দশমিক ৪ শতাংশ। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে কারখানার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৮৩৪টি এবং রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৮৬৬ মিলিয়ন ডলার, যা ছিল দেশের মোট রপ্তানির প্রায় অর্ধেক। এ ধারাবাহিকতায় ২০০০-এর শুরুতে তিন হাজার ৪৮০টি কারখানায় মোট রপ্তানি হয়েছে চার হাজার ৮৫৯ মিলিয়ন ডলার। সর্বশেষ ২০১২-১৩ অর্থবছর শেষে পাঁচ হাজার ৬০০ কারখানায় মোট রপ্তানি হয়েছে ২২ বিলিয়ন ডলার। বিগত তিন দশকে এ খাতে শ্রম নিয়োজন বেড়েছে বহুগুণ—আশির দশকের শুরুতে শ্রমিকসংখ্যা ছিল মাত্র এক লাখ ২০ হাজার, যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ লাখ এবং এর প্রায় ৭০ শতাংশ নারী শ্রমিক।

পোশাক খাতের এ প্রবৃদ্ধি হয়েছে অনুভূমিক ও উল্লম্বভাবে। আশির দশকের শুরুতে কারখানা এবং শ্রমিকপ্রতি উৎপাদন ছিল যথাক্রমে শূন্য দশমিক ৩০ মিলিয়ন ডলার এবং ৯৬৮ ডলার; নব্বইয়ের দশকের শুরুতে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক শূন্য ৪ মিলিয়ন ডলার এবং দুই হাজার ১৬৭ ডলার; ২০০০-এর শুরুতে তা ছিল ১ দশমিক ৩৯ মিলিয়ন ডলার এবং দুই হাজার ৬৯৯ ডলার। ২০১২-১৩ অর্থবছর শেষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ৮৪ মিলিয়ন ডলার এবং পাঁচ হাজার ৩৭৮ দশমিক ৯ ডলার। আগের দশকগুলোর তুলনায় ২০০০-পরবর্তী সময়কালে কারখানাপ্রতি এবং শ্রমিকপ্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। এ অগ্রগতির পেছনে অভ্যন্তরীণ এবং বহিস্থ বিভিন্ন নিয়ামক কাজ করেছে, যা পরবর্তী সেকশনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পণ্যবৈচিত্র্য : পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ২০১২ সালে নিট ও ওভেন পোশাক মিলিয়ে সর্বমোট ২২১টি ক্যাটাগরির পণ্য রপ্তানি হয়েছে; যা এইচএস ৬ ডিজিটের মোট ক্যাটাগরির ১১ দশমিক ৭ শতাংশ (২০০৪ সালে এর সংখ্যা ছিল ২৩০টি)। এ সময়কালে ১৪টি নতুন পণ্য রপ্তানি খাতে সংযোজিত হয়েছে (যেমন ১২টি নিট এবং দুটি ওভেন) এবং ২৫টি পণ্য বিয়োজিত হয়েছে (যেমন ১৯টি নিট এবং ছয়টি ওভেন)। পণ্য রপ্তানিতে একদিকে যেমন ১২২টি পণ্যে ১০ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে, অন্যদিকে ১১০টি পণ্যে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধিও ঘটেছে। সার্বিকভাবে এ খাতের পণ্যতালিকায় পরিবর্তন হচ্ছে এবং পণ্য রপ্তানিতে নতুন নতুন পণ্য সংযোজিত হচ্ছে বলে ধারণা করা যায়। তবে পোশাক খাতের রপ্তানিতে এখনো পাঁচ-সাতটি পণ্যের প্রাধান্য বিদ্যমান।

কাঁচামাল ব্যবহার : কাঁচামাল ব্যবহারের দিক থেকেও পরিবর্তন ঘটেছে এ শিল্পে। কাঁচা তুলা আমদানি করে দেশীয় পর্যায়ে পশ্চাৎ সংযোজন প্রক্রিয়ায় সুতা এবং পোশাক উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় ভিন্নতা এসেছে। ২০০৪ সালে পোশাক খাতের আমদানি করা কাঁচামালের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশই ছিল কাঁচা তুলা, ১২ শতাংশ কাপড় এবং মাত্র ১ শতাংশ সুতা। ২০১১ সালে এসে আমদানি করা কাঁচামালের এ বিন্যাসের পরিবর্তন হয়েছে—যার মধ্যে ১৯ শতাংশ কাঁচা তুলা, ৫৩ শতাংশ কাপড় এবং ১০ শতাংশ সুতা। অর্থাৎ আমদানির ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াকৃত কাঁচামালের আমদানি বাড়ছে। এর পাশাপাশি পোশাকশিল্পের কাঁচামাল হিসেবে কৃত্রিম তন্তুজাত সুতা ও কাপড়ের ব্যবহার বাড়ছে। কাঁচামালের বহুধাকরণ শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিলেও বিভিন্ন ধরনের দাহ্য কাঁচামাল ব্যবহারের কারণে কর্মকালীন নিরাপত্তাঝুঁকি বাড়ছে। এসব কাঁচামাল যথাযথভাবে সংরক্ষণ না হলে অগ্নিকাণ্ডজনিত দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে, যা সাম্প্রতিক সময়ে দেখা গেছে (মোয়াজ্জেম, ২০১৩)।

অন্যান্য প্রতিযোগী-সক্ষম দেশের রপ্তানি পরিস্থিতি

বিশ্বের পোশাক রপ্তানির উৎস ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হলো পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ পণ্য সরবরাহ করার সক্ষমতা অনেক পোশাক রপ্তানিকারক দেশের না থাকা। এ প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে ২০০৫ সালে মাল্টিফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্টের

(এমএফএ) আওতায় কোটাপ্রথা বিলুপ্তির পর রপ্তানি উৎসের বাজার উন্মুক্ত হওয়ার কারণে। সারণি-১ প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, পোশাক খাতের মূল রপ্তানি উৎস চীন উত্তরোত্তর তার অবস্থান সংহত করেছে। অন্যদিকে, বেশ কিছু দেশ যেমন তুরস্ক ও থাইল্যান্ড তাদের আগের অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি। অন্যদিকে, বেশ কিছু দেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে এগিয়েছে, যেমন : বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া ইত্যাদি। সার্বিকভাবে বাংলাদেশ অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের তুলনায় ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করেছে।

সারণি ১ : পোশাক রপ্তানিকারক দেশের তুলনামূলক অবস্থান : ২০০৪ ও ২০১১

সূত্র : COMTRADE, 2013

৩.২ রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়ক নিয়ামকসমূহ

বাজারসুবিধা : পোশাক খাতে উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও পণ্য উৎপাদনে বিভিন্ন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের বাজারে অগ্রাধিকারমূলক বাজারসুবিধাপ্রাপ্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৫ সালের আগ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে এমএফএর আওতায় কোটাসুবিধা, ২০০১ সাল থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে EUEBA[১]-এর আওতায় অনুন্নত দেশের জন্য অগ্রাধিকারমূলক বাজারসুবিধা এবং ২০০২ সাল থেকে জিএসপির আওতায় কানাডার বাজারে শুল্কমুক্ত বাজারসুবিধা বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির বাজারকে

সম্প্রসারিত করেছে। এ ছাড়া বিশ্বের অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ তাদের জিএসপির আওতায় বাংলাদেশকে কতিপয় পণ্যে বাজারসুবিধা দিয়ে থাকে, যার মধ্যে তৈরি পোশাক আংশিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। যেমন : অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, জাপান, ভারত ইত্যাদি। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার—মোট রপ্তানির প্রায় ৫৯ দশমিক ৭০ (২০১২) শতাংশ ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে রপ্তানি হয় এবং প্রতিবছর এর অংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা, যা উৎস নীতি (রুলস অব অরিজিন) নামে পরিচিত, বাংলাদেশি রপ্তানি পণ্যের বিভিন্নতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। ২০০৫ সাল পর্যন্ত প্রচলিত কোটাব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে নির্দিষ্ট হারে পণ্য রপ্তানির সুযোগ করে দিয়েছিল। ২০০১ সাল থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নে স্বল্পোন্নত দেশের প্রচলিত অগ্রাধিকারমূলক বাজারসুবিধার উৎসনীতিতে দ্বিস্তরে কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণের বাধ্যবাধকতা বাংলাদেশের নিট পোশাক উৎপাদনের সুতা ও কাপড় উৎপাদনকে উৎসাহিত করেছে। ২০১১ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন উৎসনীতিতে পরিবর্তন আনে এবং এক স্তরবিশিষ্ট কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। এর ফলে আমদানি করা কাপড় ব্যবহারের মাধ্যমে রপ্তানিমুখী ওভেন পোশাক উৎপাদন প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

কাঁচামাল হিসেবে পণ্য উৎপাদনে তুলা এবং জাতীয় মধ্যবর্তী পণ্যের প্রাধান্য রয়েছে। ২০০১-২০১১ সাল পর্যন্ত ইউরোপের বাজারে উৎসনীতিতে দ্বিস্তরবিশিষ্ট উৎপাদনকাঠামো বজায় থাকার কারণে তুলাজাতীয় কাঁচামাল ব্যবহারের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। ২০১১ সালে উৎসনীতিতে শিথিলতা আনার কারণে আমদানি করা কৃত্রিম তন্তুজাত কাপড়ের মাধ্যমে পণ্য রপ্তানির প্রবণতা বেড়েছে। কাঁচামালের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে যে পরিবর্তন ঘটছে, এর সঙ্গে উৎপাদনপ্রক্রিয়া দুর্ঘটনামুক্ত রাখার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত তুলাবহির্ভূত কাঁচামাল বিশেষত সিনথেটিক, পলিয়েস্টার সুতা বা বিভিন্ন কেমিক্যাল পদার্থ দাহ্য হয়। দুর্ঘটনা থেকে সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ডের কারণে এসব দাহ্য কাঁচামালে সৃষ্ট ধোঁয়া শ্রমিকের জন্য জীবনঘাতী হওয়ার আশঙ্কা থাকে (মোয়াজ্জেম, ২০১৩)।

শ্রমিকের প্রাপ্যতা এবং নিম্ন শ্রম ব্যয় : শ্রমঘন শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয় শ্রমিকের প্রাপ্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের নারী ও পুরুষ শ্রমিক এবং সাম্প্রতিক কালে শহরাঞ্চলের শ্রমিকের সরবরাহ এ খাতের সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। একই সঙ্গে নিম্ন মজুরিজনিত ব্যয় অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের চেয়ে নিচে রয়েছে। এ কারণে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখা সহজতর হয়েছে।

সরকারের নীতি সহায়তা : রপ্তানিমুখী পোশাক খাতকে সরকারের পক্ষ থেকে অব্যাহত নীতি সহায়তা প্রদান এ খাতের সক্ষমতা ধরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আশি ও নব্বইয়ের দশকে রপ্তানিমুখী পোশাক খাতের জন্য ডিউটি ড্রব্যাক সুবিধা, বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা এবং পশ্চাৎসহযোগ শিল্প হিসেবে টেক্সটাইল খাতকে ক্যাশ ইনসেনটিভ প্রদান ইত্যাদি পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের রপ্তানি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তীকালে এ সুবিধা অব্যাহত থাকে হ্রাসকৃত হারে রপ্তানিঋণ প্রদান, অপ্রচলিত বাজারে রপ্তানি সুবিধা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। আমদানি করা কাঁচামাল, মধ্যবর্তী পণ্য ও মূলধনি যন্ত্রপাতিতে শূন্য শুল্ক বিদ্যমান থাকা এ খাতকে বিশেষ সুবিধা দিয়েছে। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে রপ্তানিকারকেরা বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত হন—প্লট, অবকাঠামোগত সুবিধা, কেন্দ্রীয় বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা ইত্যাদির মাধ্যমে। সার্বিকভাবে তৈরি পোশাক খাতে সরকারের অব্যাহত নীতিসহায়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি : রপ্তানি বৃদ্ধির কারণে পোশাক খাতের ভৌত অবকাঠামোতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল যেমন: আশুলিয়া, টঙ্গী, গাজীপুর, সাভার, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ঢাকা ইপিজেড ইত্যাদি এলাকায় নতুন কারখানা গড়ে উঠেছে। তবে এসব শিল্পাঞ্চলে কারখানা স্থাপনের পর্যাপ্ত সুবিধা নিশ্চিত করা যায়নি। জমির স্বল্পতা এবং জমির উচ্চমূল্যের কারণে অনেক সময়ে কারখানা উল্লম্বভাবে বর্ধিত করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি বহুতল ভবনে অন্যান্য কারখানা বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পোশাক কারখানা গড়ে উঠছে। এসব উল্লম্ব অবকাঠামোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন অনুসরণ না করা হলে দুর্ঘটনায় শ্রমিকের আহত বা নিহত হওয়ার বেশি আশঙ্কা থাকে। দুঃখজনক হলো, এ খাতের প্রবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানসম্পন্ন কারখানা পর্যাপ্তভাবে গড়ে ওঠেনি।

৪. পোশাক খাতের প্রক্রিয়াগত ও উৎপাদগত উন্নয়ন

উৎপাদন চেইনের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা এবং তার উন্নয়নের পেছনে সাধারণত তিন ধরনের পরিবর্তন ও উন্নয়ন জড়িত। এগুলো হলো প্রক্রিয়াগত উন্নয়ন, উৎপাদগত উন্নয়ন ও কার্যক্রমগত উন্নয়ন। এ ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয় উৎপাদন চেইন কোন ধরনের অভ্যন্তরীণ নীতিকাঠামোতে পরিচালিত হচ্ছে তার ওপর। সাধারণত ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উৎপাদন চেইনে তিন ধরনের নীতিকাঠামোর প্রচলন দেখা যায়: ১. স্তরপরম্পরা, ২. আংশিক স্তরপরম্পরা, ৩. নেটওয়ার্ক ও ৪. বাজার। তত্ত্বীয়ভাবে বলা হয়, একটি স্তরপরম্পরা কাঠামোতে ক্রেতানির্দেশনা পূর্ণাঙ্গভাবে বিক্রেতাকে পালন করতে হয় বলে উৎপাদনপ্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটানোর সম্ভাবনা সীমিত থাকে। অপরদিকে, একটি প্রতিযোগিতামূলক নীতিকাঠামোতে ক্রেতার নির্দেশনা খুব সীমিত পর্যায়ে থাকে বলে উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় বিভিন্নমুখী উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে।

বাংলাদেশের উৎপাদন চেইন স্তরপরম্পরা এবং বাজারকাঠামোর মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করছে। বাংলাদেশে পোশাক খাত শুরুর দিকের স্তরপরম্পরা থেকে ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করে বর্তমানে নেটওয়ার্ক পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ পর্যায়ে একজন ক্রেতা উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বহুলাংশে স্বাধীনতা ভোগ করেন—এর মধ্যে রয়েছে কাঁচামালের উৎস নির্বাচন এবং তা ক্রয়ের স্বাধীনতা, পণ্য রপ্তানিতে ক্রেতার দায়ভার বৃদ্ধি (এফওবি ব্যবহার), পণ্যের স্যাম্পল ও ডিজাইন তৈরির ক্ষেত্রে সীমিত স্বাধীনতা ইত্যাদি। এসব কারণে বাংলাদেশে পণ্য উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়াগত ও উৎপাদগত বিষয়ে বিশেষ উন্নতি অর্জিত হয়েছে।

৪.১ প্রক্রিয়াগত উন্নতি

সাধারণভাবে প্রক্রিয়াগত উন্নয়ন বলতে বোঝায় উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় উন্নত এবং বিভিন্নমুখী ব্যবহার উপযোগী যন্ত্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার, শ্রম নিয়োজনপ্রক্রিয়ায় নিবিড়তা বৃদ্ধি, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন কৌশলে ধারাবাহিক পরিবর্তন ইত্যাদি। ২০১২ সালে সিপিডি পরিচালিত ২২টি বড় ও মাঝারি কারখানার ওপর জরিপে দেখা যায়, ২০০৫ ও ২০১১ সালের মধ্যে কারখানাপ্রতি রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে ২০ শতাংশের বেশি (সারণি ২)। এ প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে কারখানার স্কেল অব অপারেশন বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন কারখানার ফ্লোর স্পেস বেড়েছে ৫-৯ শতাংশ, লাইন সংখ্যা বেড়েছে ৬-১১ শতাংশ এবং কারখানাপ্রতি শ্রমিক বেড়েছে ৫ শতাংশের মতো। এর পাশাপাশি প্রক্রিয়াগত বিষয়ে গুণগত পরিবর্তনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। স্বয়ংক্রিয় মেশিন যেমন সুইং ও নিটিং মেশিন ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় উৎপাদনশীলতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া পণ্য জাহাজীকরণ-প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন (সিঅ্যান্ডএফ থেকে এফওবিভিত্তিক) করার মাধ্যমে বেশি মাত্রায় সরাসরি খুচরা ক্রেতাদের সঙ্গে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং ক্রেতাদের রপ্তানি আদেশদান-প্রক্রিয়ার পরিবর্তন এসেছে। এসবের ফলে উৎপাদন সময়, উৎপাদন ব্যয় এবং পণ্যপ্রতি উদ্যোক্তার সময় বেড়েছে। উৎপাদনশীলতার উন্নতি বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় লাইনপ্রতি ঘণ্টায় উৎপাদন, শ্রমিকপ্রতি উৎপাদন এবং মেশিন লাইন অনুপাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

সারণি ২ : নমুনা কারখানায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি : ২০০৫-২০১১

বিবরণ

সূত্র : মোয়াজ্জেম এবং সেহরীন (২০১৩)

প্রক্রিয়াগত উন্নতি আরও দেখা যায় কাঁচামাল ব্যবহারে অপচয় কমানোর ক্ষেত্রে। কাঁচামাল আমদানি উৎসের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক উৎস বিশেষত ভারত, পাকিস্তান ও চীনের ওপর নির্ভরতা বাড়ছে। শ্রমিকপ্রতি ফ্লোর স্পেস ব্যবহার নিট কারখানায় ২০ শতাংশ বাড়লেও ওভেন কারখানায় ১৪ শতাংশ কমেছে (সারণি ৩)। লাইনপ্রতি শ্রমিকের সংখ্যা নিট ও ওভেন উভয় ক্ষেত্রেই ১০ শতাংশের মতো কমেছে। লাইনপ্রতি শ্রমিকের উৎপাদন বেড়েছে ২০ থেকে ৫০ শতাংশ। এ প্রক্রিয়াগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশেষায়িত কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে যেমন : মানবসম্পদ উন্নয়ন, শ্রমিকের সম্পর্ক উন্নয়ন, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, শিল্প প্রকৌশল ইত্যাদি। প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে আইটির ব্যবহার বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষত কাজের অর্ডার নেওয়া, উৎস নির্ধারণ, স্যাম্পল নিশ্চিতকরণ, রপ্তানি নিশ্চিতকরণ, সার্বিক যোগাযোগ ইত্যাদি। এসব প্রক্রিয়াগত উন্নয়নের ফলে কারখানার সার্বিক উৎপাদনশীলতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৩ : নমুনা কারখানায় শ্রম উৎপাদনশীলতার পরিবর্তন

বিবরণ

সূত্র : মোয়াজ্জেম এবং সেহরীন (২০১৩)

৪.২ উৎপাদগত উন্নয়ন

উৎপাদগত উন্নয়ন বলতে উৎপাদিত পণ্যের বহুধাকরণ, পণ্যমান ও গুণাগুণ, পণ্যমূল্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নতির বিষয়টিকে বোঝানো হয়। সিপিডি পরিচালিত জরিপকৃত কারখানাগুলোতে দেখা গেছে, সিংহভাগ কারখানা এখনো নিম্নাঙ্গের পোশাক প্রস্তুত করে। তবে ধীরে ধীরে উর্ধ্বাঙ্গের ও শিশুদের পোশাক উৎপাদন বাড়ছে এবং সার্বিকভাবে গুণ ও মানে বৈচিত্র্য আসছে। পণ্য ডিজাইনের বৈচিত্র্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। নিট ও ওভেন দুই ধরনের পোশাকেই ডিজাইনে পরিবর্তন এবং একই সঙ্গে ফ্যান্সি পণ্যের উৎপাদন বাড়ছে। সার্বিকভাবে কারখানাগুলোতে সাধারণ, মধ্যম ও উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদন বেড়েছে। ২০০৪ সালে নিট পোশাকের রপ্তানিতে সাধারণ, মধ্যম এবং উচ্চমানের পণ্যের অংশ ছিল যথাক্রমে ৫২, ৪৭ ও ১৬ শতাংশ; ২০১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩৭, ২৮ ও ২২ শতাংশ (সারণি ৩)। একইভাবে ওভেন পোশাকেও এ পরিবর্তন লক্ষণীয়। পোশাকের পণ্যমূল্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে (সারণি ৪)। ২০০৪ সালের তুলনায় ২০১১ সালে নিট পোশাকে পণ্যমূল্যে বেসিক ও উচ্চমানের পোশাকের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে ২৭ দশমিক ৩ ও ৪০ দশমিক ৬ শতাংশের মতো। একইভাবে

২০১১ সালে ওভেন পোশাকে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৫৯ দশমিক শূন্য ও ৪৯ দশমিক ২ শতাংশ।

৪.৩ কার্যক্রমগত উন্নয়ন

কার্যক্রমগত উন্নয়ন বলতে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ডিজাইন, সরবরাহব্যবস্থা, ব্র্যান্ডিং সক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়কে বোঝায়। বাংলাদেশের পোশাক খাতে এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অগ্রগতি হয়নি। দেখা গেছে, খুব কমসংখ্যক কারখানায় নিজস্ব ডিজাইন ক্ষমতা রয়েছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কারখানাগুলো ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানের সরবরাহকৃত ডিজাইন নিয়ে কাজ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে ২০০৫ সালের পরবর্তী সময়ে খুব উন্নতি হয়নি। নিট কারখানায় নিজস্ব ডিজাইন ক্ষমতায় পরিবর্তন হয়নি বললেই চলে। অন্যদিকে, ২০১১ সালে ওভেন কারখানায় নিজস্ব ডিজাইন ক্ষমতায় পরিবর্তন হয়েছে এমন কারখানার সংখ্যা ১ দশমিক ২ শতাংশের মতো, যা খুব সামান্য। তবে স্যাম্পল ডিজাইন প্রস্তুতিতে প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে। নিজস্ব ব্র্যান্ডিংয়ে পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত অনেক ব্যয়সাধ্য। এ ক্ষেত্রে বাজারের ঝুঁকির পুরোটাই সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে বহন করতে হয়।

৫. পোশাক খাতের বহিস্থ চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশের পোশাক খাতের ধারাবাহিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ অব্যাহতভাবে মোকাবিলা করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত দুর্বলতা বিশেষত গ্যাস ও বিদ্যুতের সংকট, যোগাযোগের দুর্বলতা, পরিবহনসংকট ইত্যাদি রয়েছে। এর পাশাপাশি আমদানি-রপ্তানি ক্ষেত্রে সমুদ্রবন্দর, বিশেষত চট্টগ্রাম শহরের বন্দর অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ ব্যবস্থাপনা, উচ্চ পরিবহন ব্যয় ইত্যাদিও রপ্তানির ক্ষেত্রে অন্যতম চ্যালেঞ্জ। ব্যাংকঋণের ক্ষেত্রে রপ্তানি ঋণের সুদের হার কম হলেও বিনিয়োগ ঋণের সুদের হার বেশ উচ্চ। আবার ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমানের ওঠানামাও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নমুখী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এসব সংকট ও চ্যালেঞ্জে সৃষ্ট বাড়তি ব্যয় এবং ঝুঁকি পোশাক খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। আশার কথা হলো, বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো পোশাক খাতকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের আওতামুক্ত রাখার ব্যাপারে একধরনের অনানুষ্ঠানিক মতৈক্য মেনে চলে। এর ফলে পোশাক কারখানাগুলো রাজনৈতিক কার্যক্রম, বিশেষত ধর্মঘট, হরতাল ইত্যাদি কার্যক্রমের মধ্যেও অংশত চালু থাকে। তবে নির্বাচনী বছরে রাজনৈতিক অসহযোগিতামূলক

কার্যক্রম বেড়ে যাওয়ার কারণে উৎপাদন ও রপ্তানি কার্যক্রমে এর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ঘটে। ২০১৩ সালজুড়ে নির্বাচনী সংকটে সৃষ্ট অনিশ্চয়তায়, ৫৫ দিন হরতাল এবং ১৫ দিন অবরোধ কার্যক্রম চলার ফলে, তৈরি পোশাক খাতে এর বিভিন্নমুখী নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। ২০১৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধের রাজনৈতিক সংকটে সৃষ্ট ক্ষতির পরিমাপ করতে গিয়ে বিজিএমইএ ৪২টি কারখানার ওপর জরিপ চালায়। এতে প্রায় ২৬ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ ক্ষতির প্রাথমিক হিসাব পাওয়া যায়। এসব ক্ষতির মধ্যে রয়েছে অর্ডার বাতিল হওয়া, কম মূল্যে পণ্য রপ্তানি, আকাশপথে পণ্য পরিবহন, পণ্য প্রেরণে দেরি হওয়া, ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমে ক্ষতি, বাড়তি পরিবহন ব্যয় ইত্যাদি।

তবে বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জের পরও পোশাক খাতের প্রক্রিয়াগত, উৎপাদগত ও কার্যক্রমগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নীতিসহায়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ সুবিধা উদ্যোক্তাকে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে পরিষ্কার পথরেখা দিয়েছে। এর ফলে উদ্যোক্তারা স্টেট অব আর্ট প্রযুক্তি ব্যবহার, প্রযুক্তিতে বিভিন্নতা আনা, প্রযুক্তি নিবিড়তা বৃদ্ধি, শ্রম নিয়োজনে কার্যক্রম গ্রহণ এবং ব্যয়বহুল কিন্তু উৎপাদনশীল প্রযুক্তি ব্যবহার ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করেছে। পাশাপাশি এ খাতের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও বিনিয়োগ করেছে। স্বল্প খরচে শ্রম নিয়োজন এবং শ্রমের প্রাপ্যতা থাকায় উৎপাদনবহুল নিম্ন মূল্যের পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে শীর্ষে উঠে এসেছে।

৬. পোশাক খাতে সামাজিক অগ্রগতি

উন্নয়নশীল দেশের উৎপাদন চেইনে পণ্য উৎপাদনপ্রক্রিয়ার উন্নয়নের সঙ্গে সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কম সম্পর্কিত দেখা যায়। উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় উদ্যোক্তা এবং বিদেশি ক্রেতার কাছে শ্রমিকের অধিকার, চাহিদা বা দাবির বিষয়টি প্রতিযোগিতা সক্ষমতার অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়নি। শ্রম অধিকার, কর্মপরিবেশ, নিরাপত্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ন্যূনতম অগ্রগতি হয়েছে সংশ্লিষ্ট দেশের আইনের কাঠামোর ভিত্তিতে। এসবের বাস্তবায়নে সরকারি উদ্যোগ, ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিকাঠামোর পাশাপাশি শ্রমিকের অব্যাহত দাবি এবং ভোক্তা বা ভোক্তাসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সামাজিক অগ্রগতি বিবেচনা করা হয় সাধারণত দুই ধরনের কমপ্লায়েন্স ইস্যুতে অগ্রগতি বিবেচনা করে : এক, সামাজিক কমপ্লায়েন্স, অন্যটি ভৌত অবকাঠামোগত কমপ্লায়েন্স। সামাজিক কমপ্লায়েন্সের ইস্যুগুলো শ্রমিকের আইনি অধিকার, সামাজিক সুবিধা ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত। অন্যদিকে, ভৌত অবকাঠামোগত

কমপ্লায়েন্সের ইস্যুগুলো শ্রমিকের কর্মকালীন পরিবেশের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত। আশির দশকে পোশাকশিল্পের শুরুর দিকে সামাজিক ইস্যু তেমন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়নি। এ খাতের উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভোক্তা পর্যায়ে এবং শ্রমিক পর্যায়ে দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক কমপ্লায়েন্সের বিষয়টি ধীরে ধীরে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হতে থাকে। অন্যদিকে, ভৌত অবকাঠামোগত কমপ্লায়েন্সের বিষয়টি গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে সাম্প্রতিক কালে।

৬.১ সামাজিক কমপ্লায়েন্স

সামাজিক কমপ্লায়েন্স বলতে শ্রমিকের কর্মকালীন আইনিভাবে প্রাপ্য এবং সামাজিকভাবে প্রদেয় বিভিন্ন সুবিধা বোঝানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আইনানুযায়ী পূর্ণ মজুরি প্রাপ্তি এবং তা যথাসময়ে প্রদান, সুনির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা বজায় রাখা, সাপ্তাহিক ছুটির সুবিধা, নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন সুবিধা, শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার, ক্যানটিন সুবিধা ইত্যাদি। এসব সূচকের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় উন্নতি হয়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে। ২০০৬ সালে সিপিডি পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, প্রায় ৫০ শতাংশ কারখানা প্রথম সপ্তাহে এবং ৪৫ শতাংশ কারখানা দ্বিতীয় সপ্তাহে শ্রমিকদের মজুরি প্রদান করত। বিভিন্ন প্রকাশিত তথ্য ও সংবাদের ভিত্তিতে বলা যায়, সাম্প্রতিক কালে প্রায় সব কারখানাই মূল মজুরি প্রথম সপ্তাহে প্রদান করে। মজুরি সময়মতো প্রদানের ক্ষেত্রে ছোট কারখানাগুলোতেও উন্নতি হচ্ছে। শ্রমিকদের কর্মকালীন সময় ২০০৬ সালে ছিল দৈনিক আট ঘণ্টা এবং অতিরিক্ত সময়ের কর্মঘণ্টা ছিল ২ দশমিক ৩ ঘণ্টা এবং সর্বমোট ১০ দশমিক ৩ ঘণ্টা। বর্তমানে কারখানাগুলোতে অতিরিক্ত সময়ে কাজের চাপ বেড়েছে, শ্রমিকদের মোট কর্মঘণ্টা বেড়ে গেছে। আপাতদৃষ্টিতে শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময়ে কাজের ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখা যায় বাড়তি আয়ে সংসারের ব্যয় নির্বাহের চেষ্টা থেকেই। সাপ্তাহিক ছুটি প্রদানের ক্ষেত্রে আশি বা নব্বইয়ের দশকের চেয়ে পরিস্থিতি এখন পুরোপুরি ভিন্ন। বর্তমানে শ্রমিকেরা সাপ্তাহিক ছুটি পাচ্ছেন। মাতৃত্বকালীন ছুটি নেওয়ার সুবিধা বর্তমানে বেড়েছে—২০০৫ সালে ৫০ থেকে ৮০ ভাগ কারখানায় শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটির সুবিধা প্রদান করা হতো বলে সিপিডি (২০০৮) গবেষণায় দেখা যায়। ৫০ থেকে ৮০ শতাংশ কারখানাতে ২০০৫ সালে ডে-কেয়ার সেন্টার এবং ক্যানটিন সুবিধা ছিল। এ ক্ষেত্রেও উন্নতি হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এ ধরনের সুবিধা শ্রমিকদের দেওয়ার কারণে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় বলে গবেষণায় দেখা যায়। সিপিডি (২০০৮) গবেষণায় দেখা গেছে, সামাজিক কমপ্লায়েন্সসম্পন্ন কারখানাগুলোতে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা অপেক্ষাকৃত কম কমপ্লায়েন্সসম্পন্ন কারখানা থেকে বেশি (সারণি ৪)।

সারণি ৪ : শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা (বছরপ্রতি ডলারে)

বিবরণ	নিট	ওভেন	সোয়েটার	শার্ট
কম কমপ্লায়েন্সসম্পন্ন কারখানা	১৮৬৯	৯৯১	১৩৯৭	১৪১১
মধ্যম কমপ্লায়েন্সসম্পন্ন কারখানা	২২৯১	১০৬৩	১৫৫১	১৩৪২
উচ্চ কমপ্লায়েন্সসম্পন্ন কারখানা	২২৪৬	২৪২৯	১০৬৭	২২১৩

সূত্র : মোয়াজ্জেম এবং সেহরীন (২০১৩)

৬.২ অবকাঠামোগত কমপ্লায়েন্স

অবকাঠামোগত কমপ্লায়েন্স বলতে বোঝায় জরুরি বহির্গমনব্যবস্থা থাকার সুবিধা, অগ্নিনির্বাপণসুবিধা, কারখানার কাঠামোগত সুবিধা ইত্যাদি। এসব কমপ্লায়েন্সকে শ্রমিকের কর্মকালীন নিরাপত্তাসুবিধা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অবকাঠামোগত সুবিধা দেওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে কারখানার কাঠামোগত অবস্থার ওপর। বাংলাদেশে সাধারণত তিন ধরনের কাঠামোতে কারখানাগুলো স্থাপন করতে দেখা যায় : ক. ভাড়াকৃত স্পেস, খ. ব্যবসায়িক স্পেস এবং গ. নিজস্ব জমির ওপর তৈরি কাঠামো। আশি ও নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশে অধিকাংশ কারখানা গড়ে উঠেছিল ভাড়াকৃত স্পেসে। এসব কাঠামোর অধিকাংশই শিল্প কাঠামো নির্মাণের উপযোগী ছিল না। এসব দুর্বল অবকাঠামোতে দুর্ঘটনার কারণে অনেক শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। পরবর্তী সময়ে আইনি বাধ্যবাধকতা এবং ক্রেতাদের চাপে উদ্যোক্তারা শিল্প স্থাপনে সঠিক কাঠামোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রমিকদের জরুরি বহির্গমন সিঁড়ি নির্মাণ। পরবর্তীকালে শিল্পের কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কারখানাগুলো ব্যবসায়িকভাবে নির্মিত কাঠামোতে গড়ে ওঠে। এসব কাঠামোতে বৃহত্তর স্পেসে শ্রমিকদের জন্য কিছুটা ভালো সুবিধা নিশ্চিত করা গেলেও আইনিভাবে প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ কাঠামো নিশ্চিত করা যায়নি। নব্বইয়ের দশক থেকে ধীরে ধীরে এবং ২০০০-পরবর্তীকালে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে নিজস্ব জমিতে পর্যাপ্ত সুবিধা দিয়ে কারখানা কাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ দেখা যায়। কিন্তু দেখা গেছে, প্রায়ই এসব কাঠামো ত্রুটিপূর্ণভাবে নির্মিত।

সবচেয়ে বড় কথা, শ্রমিকদের কর্মপরিবেশের নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ অবকাঠামো এখনো যথেষ্টসংখ্যক গড়ে ওঠেনি। কারখানায় জরুরি বহির্গমনব্যবস্থার সুবিধা অনেক বেড়েছে, বিশেষত শিল্পাঞ্চল এলাকাগুলোতে তৈরি নতুন কাঠামোগুলোতে এ সুবিধা রয়েছে। তবে ভাড়াকৃত কাঠামো এবং শহরাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত কাঠামোতে এ সুবিধা পর্যাপ্ত নয়। আবার ত্রুটিপূর্ণ কাঠামো নির্মাণের কারণে দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। তাজরীন ফ্যাশনসের বিল্ডিং এবং রানা প্লাজা ত্রুটিপূর্ণ কাঠামো, অপর্যাপ্ত বহির্গমনব্যবস্থা এবং অপ্রয়োজনীয়

অগ্নিনির্বাপণব্যবস্থা শ্রমিকের প্রাণহানি ঘটানোর জন্য দায়ী।

ভাড়াকৃত এবং কমার্শিয়াল স্পেসে কারখানা নির্মাণ বর্তমানে নতুন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়তি উৎপাদন চাহিদা মেটাতে দ্রুততম সময়ে কারখানা স্থাপনের কারণে অনেক সময় কমপ্লায়েন্সসংক্রান্ত বিষয়ে পর্যাপ্ত নজর না দিয়ে কারখানার উল্লম্বভাবে বৃদ্ধি ঘটছে। এসব উল্লম্ব অবকাঠামোগুলোতে ত্রুটি থাকায় কারখানায় সব দুর্ঘটনায় মৃত্যুঝুঁকি অনেক বেড়েছে। এ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বিকল্প সিঁড়ি না থাকা, অগ্নিনির্বাপণব্যবস্থায় ত্রুটি, দাহ্য পদার্থ থেকে সৃষ্ট ধোঁয়ার কারণে অতি দ্রুত মৃত্যুবরণ এবং অবকাঠামো ধ্বংসের মতো কারণ জড়িত।

কারখানার সামাজিক কমপ্লায়েন্স এবং অবকাঠামোগত কমপ্লায়েন্সের উন্নতির জন্য পর্যাপ্ত আইন থাকলেও তা বাস্তবায়নে দুর্বলতা দুর্ঘটনা এবং শ্রমিক মৃত্যুর জন্য অনেকাংশে দায়ী। দেশে বর্তমানে প্রচলিত শ্রম আইন, ২০০৬, সংশোধিত শ্রম আইন ২০১৩, অগ্নিনির্বাপণ আইন, ২০০১ এবং জাতীয় বিল্ডিং কোড, ২০০৬ ইত্যাদি বহাল রয়েছে। কিন্তু আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের প্রায় প্রতিটিতে পর্যাপ্ত লোকবলের স্বল্পতা রয়েছে। কারখানা পরিদর্শন কর্তৃপক্ষের ঢাকা বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শকসংখ্যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। সাম্প্রতিক সময়ে কারখানা পরিদর্শন কর্তৃপক্ষকে উন্নীত করে প্রয়োজনীয় লোকবল বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অগ্নিনির্বাপণ কর্তৃপক্ষের জনবল ও যন্ত্রপাতি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কারখানায় সামাজিক ও অবকাঠামোগত কমপ্লায়েন্স না মানার পেছনে প্রায়ই পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে।

কারখানা পর্যায়ে অগ্নিকাণ্ড বা অন্যান্য কারণে শ্রমিকের মৃত্যু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত নয়। এসব মৃত্যুর পেছনে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থার অভাব, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় ত্রুটি এবং কারখানার বিল্ডিংয়ে বিল্ডিং কোডের ব্যত্যয় ঘটিয়ে সম্প্রসারণ ঘটানো ইত্যাদি দায়ী বলে বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ পেয়েছে। দুঃখজনক হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তদন্ত প্রতিবেদনে এসব শৈথিল্যজনিত মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের আড়াল করার চেষ্টা থাকে। সর্বশেষ তাজরীন অগ্নিকাণ্ড এবং রানা প্লাজা দুর্ঘটনার জন্য অন্যান্যের সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা হয়েছে। দুঃখজনক হলো, অবকাঠামোগত কমপ্লায়েন্স মানসম্পন্ন রাখার জন্য কারখানাগুলোর যে বাড়তি বিনিয়োগ প্রয়োজন, তা খুব বেশি না। মোয়াজ্জেম (২০১৩) এ দেখা গেছে, একটি কারখানার অবকাঠামোগতভাবে কমপ্লায়েন্সে উন্নীত করার জন্য যে বাড়তি বিনিয়োগ প্রয়োজন, তা খুব বেশি নয়।

৬.৩ শ্রমিকের মজুরি

শ্রমিকের মজুরি তার সার্বিক ও প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার

কথা থাকলেও পোশাক খাতে মজুরি-উৎপাদনশীলতার মধ্যে সম্পর্ক সামান্যই। সিপিডি (২০০৮) এ দেখা গেছে, একজন শ্রমিক তাঁর উৎপাদনশীলতার মাত্র ৪৭ শতাংশ মজুরি হিসেবে পান। কমপ্লায়েন্সসমৃদ্ধ বৃহৎ কারখানার শ্রমিক বেশি মজুরি পেলেও এসব কারখানায় উৎপাদনশীলতা-মজুরির বৈষম্যও বেশি। দুর্ভাগ্যজনক হলো, শ্রমিকের ভিত্তি মজুরি এখনো ঠিক করা যায়নি, এর কারণ ন্যূনতম মজুরি নিয়ে এখনো বিতর্ক চলছে।

পোশাক খাতে এখনো ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হয়। মজুরি নির্ধারণে ন্যূনতম মজুরির নিম্নমাত্রা বিবেচিত হয় বলে উৎপাদনশীলতার বিচারে পর্যাপ্ত মজুরিপ্রাপ্তি থেকে শ্রমিকেরা বঞ্চিত হন। ন্যূনতম মজুরি বোর্ড শ্রম আইন অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের আলোকে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে। বিগত সাড়ে তিন দশকে পোশাক খাতে ন্যূনতম মজুরি সমন্বয় হয়েছে মাত্র চারবার। সপ্তম গ্রেডে ন্যূনতম মজুরি ১৯৮২ সালে ৬২০ টাকা, ১৯৯৩ সালে ৯৩০ টাকা, ২০০৬ সালে ১১৬২ দশমিক ৫ টাকা এবং ২০১০ সালে তিন হাজার টাকা। দীর্ঘ এ বিরতিতে মজুরি সমন্বয় করতে গিয়ে শ্রম আইন অনুযায়ী নির্ধারিত বিভিন্ন বিষয় যেমন: ন্যূনতম মূল্যস্ফীতি, দেশজ আয় প্রবৃদ্ধি, শ্রমিকের জীবন ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ে পর্যাপ্তভাবে নজর দেওয়া হয়নি। সর্বশেষ ২০১৩ সালের জুন মাসে গঠিত ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠিত হয়। নভেম্বর ২০১৩-এ সপ্তম গ্রেড পাঁচ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরিসহ অন্যান্য গ্রেডে নতুন মজুরি ধরা হয় (সারণি ৫)।

সারণি ৫ : মজুরি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি

সূত্র : দৈনিক পত্রিকা, ২০১৩

দেশের প্রচলিত আইনে (সংশোধিত শ্রম আইন, ২০১৩) শ্রম মজুরি সংজ্ঞায়িত করা হলেও ন্যূনতম মজুরির কোনো সংজ্ঞা নেই। অবশ্য ন্যূনতম

মজুরির ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলোর কথা আইনে বলা হয়েছে। যেমন: মূল্যস্ফীতি, কারখানার সক্ষমতা, শ্রমিকের জীবনযাত্রার ব্যয় ও মান, পণ্যমূল্য এবং অন্যান্য প্রতিযোগী সক্ষম খাতের পরিস্থিতি ইত্যাদি। অথচ এসব বিষয়ের পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত জাতীয় পর্যায়ে নেই। ফলে ন্যূনতম মজুরিসংক্রান্ত দর-কষাকষি মালিক ও শ্রমিকপক্ষের উত্থাপিত নিজস্ব তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে হয়। এসব তথ্য-উপাত্ত বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়।

শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে কোন কোন নিয়ামক বিবেচনা করা উচিত, তা নিয়ে তাত্ত্বিক পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। তবে মতভিন্নতার বড় উৎস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি এবং বাজারভিত্তিক মজুরির সংজ্ঞাগত পার্থক্য। বাজারভিত্তিক মজুরির ধারণায় মজুরি নির্ধারণে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে, শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরির সঙ্গে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার সম্পর্ক কম। ন্যূনতম মজুরি বাজারভিত্তিক মজুরির বেশ নিচে অবস্থান করে। দেখা গেছে, বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ন্যূনতম মজুরি বাজারভিত্তিক মজুরির চেয়ে বেশ কম। বাংলাদেশে প্রচলিত ন্যূনতম মজুরিকাঠামোতে বিভিন্ন গ্রেডের জন্য আলাদাভাবে মজুরি নির্ধারণ করে দেওয়ার কারণে এটা মূলত 'ন্যূনতম' ও 'বাজারভিত্তিক' মজুরির একটি মিশ্রিত রূপ হিসেবে রয়েছে।

মোয়াজ্জেম ও সাইফা (২০১৩) তে আইএলওর ন্যূনতম মজুরিসংক্রান্ত ১৩১ নম্বর কনভেনশনের আলোকে ন্যূনতম মজুরির সংজ্ঞা সুপারিশ করা হয়েছে। ওই সংজ্ঞায় শ্রমিকদের পরিবারকে তাঁদের পরিবারের ইউনিট হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি দিয়ে ভাগ করার কথা বলা হয়েছে। এ হিসেবে ন্যূনতম মজুরির সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

$$\text{শ্রমিকের মাসিক ন্যূনতম মজুরি} = \frac{\text{শ্রমিকের/পরিবারের মাসিক ব্যয় + নির্ধারিত হারে সঞ্চয়}}{\text{শ্রমিকের পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা}}$$

এ সংজ্ঞা অনুসারে মাসিক ব্যয়ের তথ্যের ভিত্তিতে একজন শ্রমিকের পরিবারের ন্যূনতম জীবনযাত্রার ব্যয় দাঁড়ায় আট হাজার ৩০০ টাকা। সার্বিক সক্ষমতার কথা বিবেচনা করে মোয়াজ্জেম ও সাইফা (২০১৩) ছয় হাজার ৫০০ টাকা ন্যূনতম মজুরি সুপারিশ করেছে।

মজুরি নির্ধারণে কারখানার সক্ষমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। সক্ষমতা বিচারের ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয় হলো কারখানার পরিচালন ব্যয় ও মুনাফা অর্জন। মজুরি পুনর্নির্ধারণের কারণে কারখানার আয় যদি কারখানার পরিচালন

ব্যয় মেটাতে ব্যর্থ হয়, তবে বোঝা যাবে ঘোষিত মজুরির কারণে কারখানা অলাভজনক হতে পারে। তবে এ ধরনের পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণের জন্য পর্যাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ঘাটতি রয়েছে। ফলে কোন ধরনের কারখানার ওপর পুনর্নির্ধারিত মজুরির চাপ কেমন, তা বিশ্লেষণ করা দুরূহ। সিপিডি (২০০৮) এ দেখা গেছে, ছোট কারখানাগুলোর লাভ বা আয়ের পরিমাণ বড় কারখানাগুলোর প্রায় ৮৫ শতাংশ। এ থেকে অনুমিত হয়, নতুন ব্যয় সমন্বয়ের কারণে ছোট কারখানা, বিশেষত সাব-কন্ট্রাক্টিং কারখানার সক্ষমতার ওপর একটা চাপ সৃষ্টি হতে পারে। তবে মজুরি পুনর্নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যয় সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষত কারখানাগুলোর উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় মেশিন ব্যবহার, শ্রমিক ব্যবহারে অনেক অদক্ষতা রয়েছে, যা উন্নতি করার মাধ্যমে বাড়তি উৎপাদন ব্যয়ের চাপ কমানো সম্ভব। শ্রমিকের মজুরি সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাড়তি মজুরি সমন্বয়ের জন্য ক্রেতাপ্রদত্ত মূল্য, যা কাটিং অ্যান্ড মেকিং (সিএম) ফি হিসেবে পরিচিত তা বাড়ানো প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা ও ক্রেতার যৌথভাবে এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

আইনিভাবে মজুরিকাঠামোর বাস্তবায়ন জানুয়ারি ২০১৪ থেকে শুরু হয়েছে। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, কারখানা পর্যায়ে মজুরি বাস্তবায়ন বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। বিজিএমইএর হিসাবমতে, জানুয়ারি ২০১৪-এর মজুরি প্রদান করেছে ৬৬ শতাংশ কারখানা। এর মধ্যে সমস্যাসংকুল আশুলিয়া এলাকায় মজুরিকাঠামোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি ভালো। অন্যদিকে, ঢাকার বাইরে, বিশেষত চট্টগ্রামে এর বাস্তবায়ন পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত শ্লথ। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির কারখানাগুলো তখনো পিছিয়ে রয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

৬.৪ শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার

পোশাক খাতে কারখানা পর্যায়ে শ্রমিক সংগঠন করার বিষয়টি দীর্ঘদিন তেমন এগোতে পারেনি। এ কারণে শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত সুবিধাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা যায়নি বিগত দশকগুলোতে। কারখানা পর্যায়ে শ্রমিকদের জন্য ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার কমিটি (ডব্লিউডব্লিউসি) গঠন করা হয়েছিল, যা মূলত অরাজনৈতিক একটি কল্যাণমূলক প্ল্যাটফর্ম। কিন্তু এসব ডব্লিউডব্লিউসি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্যকর ছিল না মূলত মালিকপক্ষের হস্তক্ষেপের কারণে। কার্যকরী ডব্লিউডব্লিউসির মাধ্যমেও শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি, বিশেষত সামাজিক কমপ্লায়েন্স ও কাঠামোগত কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে উন্নতি করার সুযোগ ছিল। বাস্তবিক পক্ষে, এসব কমিটির অকার্যকারিতায় তা সম্ভব হয়নি।

শ্রম আইন, ২০০৬-এ সংগঠিত হওয়ার কথা বলা হলেও কারখানা পর্যায়ে তার বাস্তবায়নে জটিলতা ছিল। এ আইনের আওতায় সংগঠন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মালিকের অবগতির বিধান থাকায় কারখানা পর্যায়েই এ ধরনের সংগঠনের উদ্যোগ বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। মালিকপক্ষের অনীহা এ ক্ষেত্রে মূল বাধা। তবে শ্রমিকদের অধিকার উপেক্ষিত থাকা এবং কর্মনিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকি সৃষ্টি হওয়ার কারণে তাদের সংগঠিত হওয়ার দাবিটি উত্তরোত্তর জোরালো হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সংশোধিত শ্রম আইন, ২০১৩-এ শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দূর করার প্রচেষ্টা দেখা যায়।

৭. উৎপাদন চেইনে শ্রমিকসংক্রান্ত সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকা

উৎপাদন চেইনে শ্রমিকসংক্রান্ত সামাজিক ইস্যুর উন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্রেতা ও সরবরাহকারী মূল ভূমিকা পালন করে। এ ক্ষেত্রে দেশীয় আইনকে প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও সামাজিক ইস্যুসংক্রান্ত আইনের ভিত্তিতে দুর্বলতা রয়েছে। বাংলাদেশে শ্রমিকের উৎপাদনপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্তি উত্তরোত্তর বাড়ার পাশাপাশি আইনি কাঠামোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন হয়নি। আইন প্রয়োগের দুর্বলতা আরেকটি ঘাটতির বিষয়। পর্যাপ্ত লোকবলের অভাব, সুশাসনের দুর্বলতা এবং সীমিত আকারে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রায়ণের জন্য আইনের বাস্তবায়ন পুরোপুরি সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ফলে সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি প্রায় পুরোপুরি নির্ভর করেছে ক্রেতাদের প্রয়োজনের নিরিখে।

উৎপাদন চেইনে উন্নয়নশীল দেশের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভোক্তা গ্রুপগুলোর কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনগুলো উন্নয়নশীল দেশের শ্রমিকদের অধিকারের ব্যাপারে জোরালো অবস্থান নিতে শুরু করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ক্রেতারা শ্রমিকের সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপারে সচেতন হয়েছে। ক্রেতারা কোড অব কনডাক্টে উত্তরোত্তর সামাজিক বিষয়গুলোর গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে।

সামাজিক ইস্যুর ক্ষেত্রে ক্রেতারা তৃতীয় পক্ষীয় অডিট করে থাকে। এসব অডিটে নির্দিষ্ট চেকলিস্টের ভিত্তিতে কারখানার সামাজিক কমপ্লায়েন্স পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু এসব অডিটের ক্ষেত্রে কারখানায় কার্যকরভাবে তা বাস্তবায়নের বিষয়টি সব সময় নিশ্চিত করা যায় না। দেখা গেছে, বিজিএমইএ নির্দেশিত সামাজিক ও অবকাঠামোগত কমপ্লায়েন্স গাইডলাইন ১৯টি নির্দিষ্ট ইস্যু পর্যবেক্ষণে সীমিত থাকে। যে ১৯টি নির্দিষ্ট ইস্যু পর্যবেক্ষণ করা হয়, তা হলো ১. ন্যূনতম মজুরি ২. নিয়োগপত্র ৩. পরিচয়পত্র ৪. সময়মতো মজুরি ৫. ওভারটাইম ভাতা ৬. সাপ্তাহিক ছুটি ৭. নৈমিত্তিক ছুটি ৮. অসুস্থতার ছুটি ৯. উৎসব ছুটি ১০. বার্ষিক ছুটি ১১. পার্টিসিপেশন কমিটি গঠন ১২. ওয়েলফেয়ার কমিটি গঠন ১৩. শিশু শ্রমিক ১৪. বিকল্প সিঁড়ি/ফটক ১৫. শ্রমিকদের সার্ভিস বুক রক্ষণাবেক্ষণ ১৬. প্রয়োজনীয় অগ্নিনির্বাপকযন্ত্র ১৭. শিশু কক্ষ/ডে-কেয়ার সেন্টার ১৮. প্রাথমিক চিকিৎসাব্যবস্থা ও ১৯. মহিলা-পুরুষদের আলাদা টয়লেট। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব কার্যকরভাবে পরিপালনের চেয়ে 'চেকলিস্ট' পূরণের মতো বিষয়ে পরিণত হয়।

শ্রমিক ইস্যুর উন্নয়নের ক্ষেত্রে কারখানা পর্যায়ে দুর্বল শ্রমিক সংগঠনের উপস্থিতি অন্যতম কারণ। শ্রমিক কল্যাণ কমিটি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলো শ্রমিকস্বার্থ পর্যাপ্তভাবে সংরক্ষণে কাজ করতে পারছে না। এ ক্ষেত্রে এসব কমিটিতে মালিকপক্ষের অতিমাত্রায় হস্তক্ষেপকে দায়ী করা হয়। তবে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন এবং ট্রেড ইউনিয়ন পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে ক্রমান্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। তবে পোশাক খাতের শ্রমিকদের একটা বিশাল অংশের শ্রমিক নিজেদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সাংগঠনিক কাঠামোর বাইরে গিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে।

সামাজিক উন্নয়নের শ্লথগতির পেছনে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অর্থনীতিও রয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতিতে অন্যান্য উদ্যোক্তাদের সংগঠনের চেয়ে পোশাক খাতের উদ্যোক্তা সংগঠনের প্রভাব অনেক বেশি। ফলে কারখানার দুর্ঘটনাজনিত কারণে শ্রমিকের মৃত্যুর বিষয়ে যথাযথ তদন্ত চালানো, তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ এবং তদন্তে দোষীদের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা দেখা যায়। কারখানা পর্যায়ে শ্রমিকের কর্মকালীন নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত এবং অন্যান্য সামাজিক সুবিধা পালনে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ আটকে যায় আইনি মারপ্যাঁচে।

সাম্প্রতিক সময়কালে সংঘটিত তাজরীন গার্মেন্টসে অগ্নিকাণ্ড এবং রানা প্লাজা ধ্বংসের ঘটনার পর বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান তদন্তকাজ সম্পন্ন করেছে। তবে তদন্ত রিপোর্টগুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়সারা গোছের এবং অপরাধী চিহ্নিতকরণে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করা হয়েছে (মোয়াজ্জেম, ২০১৩)। তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যার মধ্যে কতিপয় উদ্যোক্তাও অন্তর্ভুক্ত। তবে পরবর্তীকালে আইনি কার্যক্রমের অগ্রগতিতে দীর্ঘসূত্রতা দেখা যাচ্ছে।

রানা প্লাজার ঘটনার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের পোশাক খাতের কর্মপরিবেশ এবং কর্মনিরাপত্তা নিয়ে কাজ করতে উৎসাহী হয়েছে। এর ফলে ইউরোপভিত্তিক অ্যাকর্ড এবং উত্তর আমেরিকাভিত্তিক অ্যালায়েন্স নামে ক্রেতাদের দুটি সংগঠন কারখানার দুর্বল কাঠামো, অগ্নিনির্বাপক ও বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনাব্যবস্থার ত্রুটি নিরূপণ এবং তা সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে।

ইতিমধ্যে অ্যাকর্ডের অধীনে এক হাজার ৫৬৬টি এবং অ্যালায়েন্সের অধীনে ৬৮৬টি কারখানা চিহ্নিত করা হয়েছে পর্যবেক্ষণের জন্য। এর বাইরে আইএলও নিজস্ব উদ্যোগে এক হাজার ৫০০ কারখানা পর্যবেক্ষণ করবে। একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে পোশাক খাতের বিভিন্নমুখী সংস্কার কার্যক্রমসংক্রান্ত। ক্রেতাদের এ উদ্যোগ প্রশংসিত হলেও এর সময়োপযোগী বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এসব উদ্যোগের বাইরেও প্রায় এক হাজার ৫০০ কারখানা রয়ে গেছে, আইএলও এসব কারখানার ত্রুটি অনুসন্ধান এবং ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে। তবে এসব কার্যক্রম সময়সাপেক্ষ এবং এর জন্য পর্যাপ্ত সময় ও অর্থ ব্যবহারের প্রয়োজন।

সাম্প্রতিক কালে রাজনৈতিক অস্থিরতায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং নতুন মজুরিজনিত ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ার কারণে রপ্তানিমুখী খাত, বিশেষত পোশাক খাতের জন্য সরকার বিভিন্ন সহায়তা ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে উৎসে কর হ্রাস, রেয়াতি সুদে রপ্তানি ঋণ প্রদান, ঋণ তফসিলীকরণের সুবিধা ইত্যাদি। রপ্তানি খাতগুলোকে সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এক্সপোর্ট ডেভেলপড ফান্ড থেকে ১ দশমিক ২ শতাংশ হারে এক কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। পোশাক ও টেক্সটাইল খাতের জন্য সরকার উৎসে করও ৮ থেকে শূন্য দশমিক ৩ শতাংশে হ্রাস করেছে। এই সুবিধা ২০১৫ সাল পর্যন্ত থাকবে। সরকার পোশাক রপ্তানিকারকদের জন্য অ্যাডভান্স টেলিগ্রাফ ট্রান্সফারের (টিটি) বিপরীতে নগদ প্রণোদনা গ্রহণ অনুমোদন করেছে। এই সুবিধার আওতায় নিট ও ওভেন পোশাক রপ্তানিকারকেরা পণ্য জাহাজীকরণের আগে অ্যাডভান্স টেলিগ্রাফ ট্রান্সফারের (টিটি) বিপরীতে বর্তমানে বিদ্যমান শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ হারে নগদ প্রণোদনা পাবে। বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারকে রপ্তানি ঋণের ওপর ৩ শতাংশ হারে ভর্তুকি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। রপ্তানি খাতে নগদ প্রণোদনা বর্তমানের ৫ থেকে ৬ শতাংশে বৃদ্ধি করার বিষয়ে সরকার চিন্তাভাবনা করছে। চলতি অর্থবছরে বিভিন্ন রপ্তানিমুখী খাতে সরকার সর্বমোট ২৫ দশমিক ৫২ বিলিয়ন টাকা নগদ প্রণোদনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এসব সুবিধা সরাসরি রপ্তানিতে জড়িত কারখানাগুলোর আয় বাড়িয়ে এবং ব্যয় কমিয়ে ঝুঁকিজনিত এবং ব্যয় বৃদ্ধিজনিত বাড়তি চাপ মেটাতে বিশেষ সহায়তা করবে। তবে এ সুবিধা রপ্তানিতে সরাসরি জড়িত নয় অর্থাৎ সাব-কন্ট্রাক্টিং কারখানাগুলোর জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, এসব কারখানায় একই ধরনের সুবিধা নিশ্চিত করতে দেশীয় মূল উদ্যোক্তা কারখানাগুলোকে উদ্যোগ নিতে হবে। মূল উদ্যোক্তা কারখানাগুলোকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সাব-কন্ট্রাক্টিং কারখানায় মার্জিন বাড়িয়ে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. উপসংহার : শ্রমিকদের সামাজিক উন্নয়নে কতিপয় সুপারিশ

উন্নয়নশীল দেশের উৎপাদন চেইনে শ্রমিকের সামাজিক উন্নয়ন প্রায়ই উপেক্ষিত থাকে। কখনো কখনো উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় উন্নয়নের মধ্যেই সামাজিক উন্নয়নের দুর্বলতা লুকিয়ে থাকে। উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্রেতা ও উদ্যোক্তার সঙ্গে শ্রমিককে উৎপাদন চেইনের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা দরকার। শ্রমিককে উৎপাদন চেইনে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে তাঁর জন্য সামাজিক কমপ্লায়েন্স এবং অবকাঠামোগত কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা আবশ্যকীয় হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা ও উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ এবং ব্যয় নির্বাহ করতে প্রস্তুত থাকবে। শ্রমিকের কর্মপরিবেশের সামাজিক ও অবকাঠামোগত কমপ্লায়েন্সের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়কে মূল পরিচালনা ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করার পর ক্রেতা ও উদ্যোক্তা নিজেদের মার্জিন হিসাব করবে। এ ব্যয়ের কারণে খুচরা পর্যায়ে পণ্যমূল্যের সমন্বয় প্রয়োজন হলে ক্রেতা তা করবে।

উদ্যোক্তা/উদ্যোক্তা সংগঠন : উদ্যোক্তা/উদ্যোক্তা সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন দরকার। সময় বাঁচানো, মেশিনভিত্তিক, শ্রম-উৎপাদনশীল উৎপাদন কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসা উচিত, শ্রমবান্ধব কর্মপরিবেশ স্থাপনে জোর দেওয়া দরকার। উদ্যোক্তা সংগঠনের সদস্যপদপ্রাপ্তির নিয়মকানুন মানার ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন দরকার। কারখানাসংক্রান্ত নিয়মকানুন না মানা হলে সদস্যপদ প্রাপ্তি/নবায়নের ক্ষেত্রে ইউডি ইস্যু বন্ধ করা বা কারখানা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। উদ্যোক্তা/উদ্যোক্তা সংগঠনের জিরো টলারেন্স নীতিমালা গ্রহণ করা উচিত। উদ্যোক্তা সংগঠন যেমন বিজিএমইএর কমপ্লায়েন্স সেলের দুটো আলাদা ভাগ থাকা দরকার—সামাজিক কমপ্লায়েন্স এবং কারখানা কমপ্লায়েন্স। এসব টিম আলাদাভাবে কাজ করতে পারে। বিজিএমইএর কমপ্লায়েন্সের গাইডলাইন পরিমার্জন করা দরকার এবং এর আওতা আরও বাড়ানো দরকার। এটিকে সংশ্লিষ্ট আইনের সঙ্গে পুরোপুরি মিলিয়ে দেখা দরকার।

সরকার : সরকারের উচিত শ্রমবান্ধব পোশাক খাত গড়ার লক্ষ্যে মালিক ও শ্রমিককে সমান গুরুত্ব দিয়ে একসঙ্গে কাজ করা। বেটার ওয়ার্ক প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে নেওয়া উচিত। কারখানা পর্যায়ে নিরাপত্তাঝুঁকি কমাতে ট্রেড ইউনিয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সরকার-শ্রমিক-মালিক মিলে এর কাঠামোগত রূপরেখা ঠিক করা দরকার। কারখানা পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম গ্রহণে শ্রম মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের (যেমন ডিওএল) গতিশীল ভূমিকা প্রয়োজন। কারখানা পর্যায়ে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার স্বার্থে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে শিল্পসম্পর্ক আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে। এ আইনের

আলোকে শ্রমিক তাঁর কাজের নিশ্চয়তা পাবেন, মালিক তাঁর কারখানা চালু রাখতে পারবেন, শ্রমিকেরা তাঁদের ন্যূনতম অধিকার আদায়ের দাবি করতে পারবেন। এর প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আইএলওর শ্রমনিরাপত্তার কাঠামোগত রূপরেখাসংক্রান্ত কনভেনশন স্বাক্ষরের ব্যাপারে সরকারের সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

কারখানা পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ বিশেষায়িত জ্ঞানের দক্ষ লোকের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। এটি যেন শ্রম মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য বিভাগের (যেমন ডিওএল) নিয়োগের ক্ষেত্রে পরিণত না হয়। প্রস্তাব অনুযায়ী কারখানা পরিদর্শন কার্যালয়কে ডাইরেক্টরেটে উন্নীত করা হলেও বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন। কারখানা কর্তৃপক্ষের বিকেন্দ্রায়ণের উদ্যোগ হিসেবে ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে অফিস খোলার মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের কার্যকর বাস্তবায়ন দরকার। একই সঙ্গে পর্যাপ্ত লোকবল নিয়োগ প্রয়োজন। জেলা পর্যায়ে কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রকল্প হাতে নেওয়া দরকার। কারখানা পরিদর্শন কর্তৃপক্ষের দুর্ঘটনাস্থলে যানবাহনের ব্যবস্থা থাকা, কর্মস্থল আধুনিকায়ন, টিএ-ডিএ বাড়ানো, উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, কম্পিউটার বেইজড তথ্য সংরক্ষণব্যবস্থা তৈরি, জনবল বৃদ্ধি। সব কারখানার পরিদর্শন ডেটাবেইস তৈরি। কারখানা পরিদর্শন আইন যুগোপযোগী করা। কর্তৃপক্ষের আইনি ক্ষমতা বাড়ানো। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের অগ্নিনির্বাপণসংক্রান্ত গাইডলাইন দেখা যেতে পারে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের বাজেট বাড়ানো দরকার। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে শ্রম মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করে কারখানা পরিদর্শনে পরিদর্শক বৃদ্ধি, কারখানা পরিদর্শন কার্যক্রম বাড়ানো, শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র সংস্কার, নতুন কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি পদক্ষেপ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। বরাদ্দ অনুমোদনহীন প্রকল্প বছরের পর বছর না ঝুলিয়ে বরাদ্দ দিয়ে তা নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়ন করা। সম্মিলিত কমপ্লায়েন্সের কাঠামোগত রূপরেখা তৈরি করা দরকার। শ্রম মন্ত্রণালয়, বিশেষত কারখানা পরিদর্শন কর্তৃপক্ষের স্বাধীন কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করার সক্ষমতা অর্জন করা দরকার।

অগ্নিনির্বাপণ কর্তৃপক্ষের জনবল ও অর্থবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। নিয়মিত কারখানা পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি আকস্মিক পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত। অগ্নিনির্বাপণ কর্তৃপক্ষের ভূমিকা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনবোধে আইন সংস্কার করা যেতে পারে। সব পোশাক কারখানার অগ্নিনির্বাপণব্যবস্থার তথ্য প্রকাশ করা উচিত।

ক্রেতা : ক্রেতাদের কোড অব কনডাক্টে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও সংস্কার দরকার। ক্রেতাদের সরাসরি বা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে কারখানার কমপ্লায়েন্স উন্নীত করতে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা দরকার। এ ক্ষেত্রে সরকারি আইনকানুন মানার বিষয়টিও বিশেষ নজরে রাখা জরুরি। ক্রেতাদের উচিত হবে ত্রুটিপূর্ণ কমপ্লায়েন্স অডিট-প্রক্রিয়ায় জড়িত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মূল্যায়ন করা।

তৃতীয়পক্ষীয় কমপ্লায়েন্স অডিট হলে তাদের দুর্বলতা থাকলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

অ্যাকর্ড এবং অ্যালায়েন্সের মাধ্যমে গৃহীত উদ্যোগে কারখানার দুর্বল কাঠামোগত, অগ্নিনির্বাপকব্যবস্থাগত ত্রুটি নিরূপণ এবং তা সংশোধনের কার্যক্রম যথাসময়ে শেষ করা প্রয়োজন। তবে এসব কার্যক্রম সময়সাপেক্ষ এবং এর জন্য পর্যাপ্ত সময় ও অর্থ ব্যবহারের প্রয়োজন। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে ক্রেতা সংগঠন, সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন করা জরুরি এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

টীকা

১. EUEBA: European Union Everything But Arms উদ্যোগ, যা স্বল্পোন্নত দেশের পণ্যকে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা দেওয়ার জন্য প্রবর্তিত হয় ২০০৩ সালে।

তথ্যসূত্র

Bair, J. 2009. 'Global Commodity Chains: Genealogy and Review.'pp. 1-34 in Jennifer Bair (ed.), *Frontiers of Commodity Chain Research*. Stanford, CA: Stanford University Press.

Barrientos, S. C. Dolan and A. Tallontire. 2003. 'A Gendered Value Chain Approach to Codes of Conduct in African Horticulture.' *World Development*. 31(9):1511-1526.

Bhattacharya, D and K.G. Moazzem. 2012. 'Least Developed Countries (LDCs) in the Global Value Chain (GVC): Trends, Determinants and Challenges.' *CPD Working Paper* 104. Dhaka: Centre for Policy Dialogue (CPD).

Cumbers, A., C. Nativel and P. Routledge. 2008. 'Labour Agency and Union Positionalities in Global Production Networks.' *Journal of Economic Geography* 8 (3): 369–87.

Gereffi, G. 2005. 'The Global Economy: Organization, Governance and Development.' pp. 160-182 in Neil J. Smelser and Richard Swedberg (eds.), *Handbook of Economic Sociology*, 2nd ed. Princeton, NJ: Princeton University Press and Russell Sage Foundation.

Gereffi, G. and R. Kaplinsky (eds.). 2001. 'The Value of Value Chains: Spreading the Gains from Globalisation.' Special issue of the *IDS Bulletin* 32 (3), July.

Moazzem, K.G. and F. Sehrin, (Mimeo). 'An Exploratory Study on Technological Upgradation in Bangladesh's Apparels Sector in the Dynamics and Changes of Global and Regional Value Chains.' Report submitted to India

Council for Research on International Economic Relations (ICRIER), New Delhi.

Moazzem, K.G. and F. Sehrin. 2013b. 'পোশাক শিল্প শ্রমিকের কর্মকালীন নিরাপত্তা ঝুঁকি : কারণ ও করণীয়.' Paper presented at a CPD dialogue on 'পোশাকশিল্প শ্রমিকের কর্মকালীন নিরাপত্তা ঝুঁকি : কারণ ও করণীয়.' 26 January, Dhaka, Bangladesh.

Moazzem, K.G . and R. Saifa. 2013. 'Revision of the Minimum Wage in the RMG Sector in 2013: Proposals as regards Definition, Method of Determination and Levels.' Paper presented at a CPD dialogue on 'Revision of the Minimum Wage in the RMG Sector in 2013 Proposals as regards Definition, Method of Determination and Levels.' 24 September, Dhaka, Bangladesh.

Milberg, W. and D. Winkler. 2008. 'Measuring Economic and Social Upgrading in Global Production Networks.' Concept note prepared for the workshop 'Capturing the Gains: Economics and Social Upgrading in Global Production Networks.' December 8-12, 2008. Manchester, UK.

Rahman, M., D. Bhattacharya and K.G. Moazzem. 2008. *Bangladesh's Apparels Sector in Post-MFA Period*. Dhaka: Centre for Policy Dialogue (CPD).

Sen, A. 1999. *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.

Sen, A. 2000. 'Work and Rights.' *International Labour Review* 139 (2):119-128.

শান্তিরক্ষা

আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের দুই দশক : একটি মূল্যায়ন

রাশেদ উজ জামান ও নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস

সারসংক্ষেপ

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের একটি মূল্যায়ন, তার পটভূমি, সিদ্ধান্ত প্রণয়ন-প্রক্রিয়া, যৌক্তিকতা, প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনার একটি নির্মোহ আলোচনা এ প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিগত দুই দশক ধরে শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বাংলাদেশের শান্তিরক্ষা মিশনে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও সেনা প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়া বিষয়ে সঠিক নীতি-সিদ্ধান্তের ওপর এ খাতের উন্নয়ন নির্ভরশীল। বাংলাদেশের জন্য শান্তিরক্ষা মিশনটি একই সঙ্গে রাজনৈতিক, নিরাপত্তাসম্পর্কিত, অর্থনৈতিক এবং সামরিক বাহিনীর মাননির্ধারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক যৌক্তিকতার সঙ্গে জড়িত। শান্তিরক্ষা মিশনে সেনা প্রেরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য দেশীয় ও বৈশ্বিক কী ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তা বিশ্লেষণের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকটি আলোকপাত করা হয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন, শান্তিরক্ষা মিশনে সেনা ও পুলিশ, সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি

প্রারম্ভিক কথা

বাংলাদেশ গত দুই দশকের অধিক সময়কাল ধরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আসছে। এর মাধ্যমে দেশটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। এটি এ দেশের আগের যে নেতিবাচক রূপ, যা বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দারিদ্র্যের কশাঘাতে প্রভাবিত, তা অনেকখানি কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে বাংলাদেশ প্রকৃত অর্থে জাতিসংঘের সর্ববৃহৎ সেনা প্রদায়ক দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা

করেছে। এটি নিঃসন্দেহে আমাদের দেশের জন্য গর্বের বিষয়। কীভাবে বাংলাদেশ এ রকম একটি নেতৃস্থানীয় অবস্থান অধিকারে সমর্থ হলো, তা আরও গভীর বিশ্লেষণের দাবি রাখে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের কারণসমূহ কী? জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের ধরনে যে আবশ্যিক পরিবর্তন সামনের সময়ে দৃশ্যমান, এমতাবস্থায় বাংলাদেশের সামনে চ্যালেঞ্জগুলো কী ধরনের হতে পারে তা বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন। এই প্রবন্ধ বহুমুখী এই চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নীতিতে এই অংশগ্রহণের ভবিষ্যৎ তাৎপর্য বিস্তারিত বিশ্লেষণের একটি প্রয়াস রেখেছে।

স্বাধীনতার ১৭ বছরের মধ্যে ১৯৮৮ সালে ইউএন ইরান-ইরাক মিলিটারি অবজারভেশন গ্রুপ (ইউনিমগ) মিশনে ১৫ জন সেনা পর্যবেক্ষক প্রেরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু। তার পরের বছর, ১৯৮৯ সালে, ২৫ জন সেনা ও ৩৪ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক ইউনাইটেড নেশনস ট্রানজিশন্স অ্যাসিস্ট্যান্স গ্রুপ ইন নামিবিয়া মিশনে প্রেরণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ তার দীর্ঘমেয়াদি অংশগ্রহণের সংকল্প ব্যক্ত করেন। এ ছাড়া ১৯৯০-৯১ সালে প্রথম আরব উপসাগরীয় যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে কোয়ালিশন বাহিনীতে বাংলাদেশের ২১৯৩ জন সেনা সদস্য অংশগ্রহণ করে। সেটিই ছিল জাতিসংঘের বাইরে কোনো একক দেশের নেতৃত্বে শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের প্রথম অংশগ্রহণ। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের কম্বোডিয়া মিশনে প্রথমবারের মতো এক ব্যাটালিয়ন সেনা প্রেরণ করে। বাংলাদেশি সেনাদের পেশাদারি দক্ষতা, আন্তরিকতা ও পক্ষপাতশূন্যতা অল্পদিনের মধ্যেই এ দেশকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিতে সক্ষম হয়েছে। এই বাস্তবতায় বাংলাদেশ জাতিসংঘ মিশনে আরও বেশি মাত্রায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়।

জাতিসংঘ মিশনে প্রথম দশক

১৯৯০-এর দশকে বাংলাদেশ জাতিসংঘের বেশ কয়েকটি মিশনে অংশ নেয়। কম্বোডিয়া, রুয়ান্ডা, মোজাম্বিক, সোমালিয়া, হাইতি, অ্যাঙ্গোলা, সিয়েরা লিওন, কঙ্গো, পূর্ব তিমুর ও সাবেক যুগোস্লাভিয়ায় পরিচালিত মিশনগুলো এর মধ্যে উল্লেখ্য। ১৯৯০-২০০০ স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী প্রথম দশকে বাংলাদেশ খুব গুরুত্বপূর্ণ তিনটি মিশনে অংশ নেয়। এগুলো হলো রুয়ান্ডা (অক্টোবর ১৯৯৩-ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪), মোজাম্বিক (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩-ডিসেম্বর ১৯৯৪) এবং সোমালিয়া (জুলাই ১৯৯৩-ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫)।[১] সোমালিয়া মিশনে বাংলাদেশের ১,৯৬৭ জন সেনা সদস্য অংশ নেন এবং তাঁরা সেখানে কৃতিত্বের সঙ্গে স্থানীয়দের সব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে একধরনের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হন।[২] সোমালিয়া মিশনে বাংলাদেশকে কোনো বড় ধরনের কৌশলগত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু রুয়ান্ডা মিশনে বাংলাদেশি সেনাদের কিছু কার্যক্রম আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেশ কিছু সমালোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। রুয়ান্ডায় জাতিসংঘ মিশনে কানাডিয়ান বংশোদ্ভূত জেনারেল ডালায়ার বাংলাদেশ কন্টিনজেন্টের সেনাদের বিরুদ্ধে তাঁর আদেশ অমান্য করার গুরুতর অভিযোগ আনেন। জেনারেল ডালায়ার বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনীর সদর দপ্তর ও নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের চিঠি দিয়ে জানান যে বাংলাদেশি সেনারা অবিরতভাবে রুয়ান্ডার সাধারণ জনগণকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁর আদেশকে অবজ্ঞা করে এসেছে।[৩] এই প্রসঙ্গটি বাংলাদেশের ভাবমূর্তিতে একটি সাময়িক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। বিষয়টি জাতিসংঘ মিশনে বহুজাতিক সেনা দলগুলোতে চেইন অব কমান্ড নিয়ে নতুন করে চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তার অবতারণা ঘটিয়েছিল।

১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সিয়েরা লিওনে অবস্থিত জাতিসংঘ মিশনে (ইউএনএএমএসআইএল) অংশ নেয়। সিয়েরা লিওনের ভয়ানক পরিস্থিতিতে যখন অনেক রাষ্ট্র মিশন পরিত্যাগ করে দায়িত্বে চরম অবহেলার পরিচয় দেয়, বাংলাদেশ তখন সেখানে অল্প সময়ের নোটিশে এক ব্রিগেড সেনা দক্ষতার সঙ্গে মোতায়েন করে। বাংলাদেশি সেনা ব্রিগেড অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে গেরিলা-নিয়ন্ত্রিত জায়গাগুলো পুনরুদ্ধারে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৪] বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের এই ভূমিকায় মুগ্ধ সিয়েরা লিওন সরকার বাংলাকে সে দেশের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ২০০৩ সালে এক সরকারি সফরে সিয়েরা লিওনের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশে আসেন এবং তাঁর দেশের শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশিদের ভূমিকা গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন।[৫] এভাবে জাতিসংঘ মিশনের প্রথম দশকটিতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের গতিধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এটি চড়াই-উতরাইয়ে পরিপূর্ণ ছিল। তবে নিঃসন্দেহে প্রথম দশকের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশকে এর পরবর্তী দশকে অর্পিত দায়িত্ব পালনে আরও সমৃদ্ধ করেছিল।

সক্রিয় সশস্ত্র বাহিনী[৬]	**হেলিকপ্টার**	**প্রতিরক্ষা** বাজেট[৭]	**জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী**	**জাতিসংঘে অবদান** (বিস্তারিত)	**অন্যান্য মিশনে অবদান**
১,৫৭,০৫৩	সর্বমোট-২৩ মাল্টিরোল ১৪	২০০৯-১০$ ১.২১ বি.	৮৮৪৩ (নারী ২২৪)	MINUSTAH ৩১৯	নেই
বিশ্ব র‍্যাংকিং (আকার) ৩৪	এমএসই-১৭ এইচআইপি ১২	২০১০-১১$ ১.৪৮ বি. (১.৫% জিডিপি)	[৩০ এপ্রিল ২০১৩ পর্যন্ত] সশস্ত্র ৭৮%	UNMIL- ১৪০৮	

সক্রিয় সশস্ত্র বাহিনী[৬]	হেলিকপ্টার	প্রতিরক্ষা বাজেট[৭]	জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী	জাতিসংঘে অবদান (বিস্তারিত)	অন্যান্য মিশনে অবদান
সেনা-১,২৬,১৫৩ নৌ-১৬,৯০০ বিমান-১৪,০০০	এমআই-১৭ ওয়ান ডি (VIP) ২	২০১১-১২৮ ১.৬ বি.(জিডিপির ১.৫%)	পুলিশ ২১% বিশেষজ্ঞ পরিদর্শক ১% র‍্যাংকিং-১ম		
প্যারামিলিটারি ৬৩৯০০	ট্রান্সপোর্ট-৯ এমআই-১৭১ এসএইচ ৩ লাইট রেঞ্জ-৬ ২ বেল ২০৬-এল (লংরেঞ্জ) ৪ বেল ২১২				

সশস্ত্র খাতে ব্যয়/সেন্যসংখ্যা[৮]- ইউএস ডলার ৯৫০০ (বৈশ্বিক গড় ব্যয় ইউএস ডলার ৬৮,০০০)

শান্তিরক্ষা মিশনে দ্বিতীয় দশক

বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অন্যতম অগ্রগামী সেনা প্রেরক দেশ হিসেবে ইতিমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। স্নায়ুযুদ্ধ-উত্তর জাতিসংঘ শান্তি মিশনের দ্বিতীয় দশকে বাংলাদেশের অবদান সেনা ও পুলিশ প্রদায়ক রাষ্ট্র হিসেবে সমগ্র অংশের আনুমানিক ১০ শতাংশ। বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের মধ্যে ৯০ শতাংশ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মিশনগুলোতে কর্মরত এবং এর মধ্যে আইভরি কোস্ট ও লাইবেরিয়ায় সর্বাধিকসংখ্যক বাংলাদেশি সেনা কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৮ সালে প্রথম সেনা প্রেরণের সময় থেকে ২০১৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশ সর্বমোট ৪০টি দেশের ৫২টি মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৬,৯২১ জন সেনা সদস্য ও সেনাবিশেষজ্ঞ এবং পুলিশ বাহিনীর ১,৮৫১ জন সদস্য জাতিসংঘ পরিচালিত বিভিন্ন শান্তি মিশনে কৃতিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন।[৯] ২০০০ সাল-পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের দ্বিতীয় প্রজন্মের এক দশকে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ২৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিসংখ্যানে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ৯৩ শতাংশ এবং পুলিশ বাহিনী ৭ শতাংশ অবদান রেখেছে। এই সময়কালে মিশনগুলোতে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় ১১০ জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সদস্য মৃত্যুবরণ করেছেন।

টেবিল-১ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ (৪০টি দেশে ৫২টি মিশন)[১০]

বিবরণ	সেনা	নৌ	বিমান	পুলিশ	মোট
মিশন সম্পন্নকারী সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যা	৯৪,৭৬৮	২,০৩৯	৩,২০৭	৭,৪১৫	১,০৭,৪২৯
মিশনে মৃত্যুবরণকারী সদস্য[১৩]	৯১	১	৪	১৪	১১০

১৯৮৯ সালে নামিবিয়ায় পরিচালিত ইউএন ট্রানজিশন অ্যাসিস্ট্যান্স গ্রুপে (ইউএনটিএজি) সদস্য প্রেরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশ জাতিসংঘ মিশনে তার যাত্রা শুরু করে। আজ অবধি সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে বাংলাদেশ পুলিশ অধিক গুরুত্বপূর্ণ জাতিসংঘের প্রায় সব মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় প্রজন্মের দশকে মিশনগুলোতে পুলিশের অংশগ্রহণ বেড়েছে ৯৬৮ শতাংশ, ২০১১-এ যা ২০০০ সংখ্যা অতিক্রম করে। বাংলাদেশ পুলিশ আইভরি কোস্ট, সুদান, দক্ষিণ সুদান, পূর্ব তিমুর, ডিআর কঙ্গো, হাইতি ইত্যাদি দেশে পরিচালিত মিশনগুলোতে বিশেষজ্ঞ ও ফর্মড পুলিশ ইউনিট (এফপিইউ) উভয় ক্যাটাগরিতে সদস্য প্রেরণ করেছে। বাংলাদেশ এখন অবধি সর্বাধিক বেশি সংখ্যায় নারী পুলিশ সদস্য প্রেরণে সক্ষম হয়েছে[১২] এবং তাঁরা দক্ষতার সঙ্গে মিশনগুলোতে দায়িত্ব পালন করছেন।

২০১০ সালের মে মাসে হাইতিতে বাংলাদেশ থেকে একটি মহিলা ফর্মড পুলিশ ইউনিট (এফপিইউ) প্রেরণ করা হয়। যেকোনো মুসলিমপ্রধান জনগোষ্ঠীর দেশ থেকে এ ধরনের উদ্যোগ প্রথম এবং এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এর আগে শুধু ভারত থেকে ২০০৭ সালে এ রকম একটি মহিলা ফর্মড পুলিশ ইউনিট লাইবেরিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। বাংলাদেশের নারী পুলিশ সদস্যরা হাইতিতে ভূমিকম্প-পরবর্তী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হন। এ ছাড়া এই শান্তিরক্ষীর দলটি হাইতিতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচারণা, স্বাস্থ্যসেবার কাঠামো উন্নয়ন এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এর ফলে এই দলটিকে ২০১২ সালে ইউনাইটেড নেশনস মেডেল প্রদান করার মাধ্যমে MINUSTAH-এ তাদের অবদানকে বিশেষ সম্মাননা জানানো হয়।[১৩]

২০১১ সালের মে মাসে একটি নেভি ফ্রিগেট ও একটি বহিঃসমুদ্র পেট্রল নৌযানের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম দলটি জাতিসংঘ পরিচালিত ইন্টেরিম ফোর্সেস ইন লেবানন (ইউএনএফআইএল) মিশনে অংশগ্রহণ করে। এভাবে বাংলাদেশের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে আরেকটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়।

মিশনে সেনা প্রেরণের সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ-প্রক্রিয়া

২০০৭ সালে জাতিসংঘ স্ট্যান্ডবাই অ্যারেঞ্জমেন্ট সিস্টেমের (ইউএনএসএএস) আওতায় একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার মাধ্যমে বাংলাদেশ ও জাতিসংঘের মধ্যে বর্তমান কাঠামোয় সেনা ও পুলিশ সদস্য প্রেরণ করা শুরু হয়। বাংলাদেশ সরকার অথবা এর বাহিনীসমূহের, অর্থাৎ সশস্ত্র বা পুলিশ—নির্দিষ্টভাবে লিখিত সেনা প্রেরণ নীতিমালা নেই। মূলত নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘ সদর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত অনুরোধের ওপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশ থেকে সেনা প্রেরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই পুরো প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেনা সদর দপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ (এএফডি), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পুলিশ মূল কর্মকের ভূমিকা নিয়ে থাকে। বাস্তবে দেখা যায়, সেনা প্রেরণের সিদ্ধান্তসমূহ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এবং এ বিষয়ে জনপ্রশাসন থেকে প্রকাশ্য কোনো বিরোধের সূত্রপাত হতে দেখা যায়নি।

প্রথমত, জাতিসংঘ থেকে নিউইয়র্কে অবস্থিত বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে সেনা প্রেরণের অনুরোধ জানানো হয়ে থাকে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন অনুরোধটি পাওয়ার পর বাংলাদেশের সামগ্রিক পররাষ্ট্রনীতির এবং দেশটির অন্যান্য আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের আলোকে এর প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই করে থাকে। স্থায়ী মিশনের প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা (ডিফেন্স অ্যাটাশে) মূলত এই অনুরোধপত্র নিয়ে যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন করেন এবং তা বাংলাদেশে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করেন। সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর নিয়ন্ত্রণকারী অধিদপ্তর হিসেবে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ (এএফডি) সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য প্রেরণসংক্রান্ত যেকোনো ধরনের বিষয়াদি নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। ঢাকায় অবস্থিত সেনা সদর দপ্তরের ওভারসিজ অপারেশন ডিরেক্টরেট এ বিষয়টির যাবতীয় বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে।[১৪] একইভাবে নৌ ও বিমানবাহিনীর জন্য নির্ধারিত অনুরোধসমূহ নিজ নিজ সদর দপ্তরে এএফডি থেকে প্রেরণ করা হয় এবং তারা তখন তাদের বাহিনী-সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। মূলত এএফডি এবং ওভারসিজ অপারেশন ডিরেক্টরেট এই পুরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে থাকে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়ার মধ্যে সেনাসদস্য নির্ধারণ, তাঁদের প্রশিক্ষণ, সরঞ্জাম এবং যাবতীয় লজিস্টিকস-সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

পুলিশ সদস্য প্রেরণসংক্রান্ত যেকোনো অনুরোধ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন থেকে সরাসরি বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রাথমিক তদারকির পর এটি ঢাকায় অবস্থিত পুলিশ হেডকোয়ার্টারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করে থাকে। এভাবে একটি কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীতে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে সদস্য প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হয়ে থাকে।

জাতিসংঘ শান্তি মিশনগুলোতে সেনা প্রেরণসংক্রান্ত প্রায়োগিক সিদ্ধান্ত প্রণয়নের বিষয়াদি ছাড়াও বাংলাদেশের কূটনীতিকেরা বৈশ্বিক পর্যায়ে জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থায় নীতিনির্ধারণী ভূমিকা রাখতে পেরেছেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে শান্তিরক্ষা মিশন সংক্রান্ত সব সভায় বাংলাদেশি কূটনীতিকদের সরব উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশ জাতিসংঘের পিস বিল্ডিং কমিশনের সভাপতির গুরুদায়িত্ব পালন করেছে এবং এ দায়িত্বের অংশ হিসেবে দুটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি, Review of Peace Building Architecture 2010 এবং Review of International Civilian Capacity 2010 প্রণয়নে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ অন্যান্য দেশের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের মতো তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়গুলোকে এই নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে লেখকদ্বয়ের আলোচনায় বাংলাদেশের আরও কিছু কূটনৈতিক সাফল্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। বাংলাদেশ ২০০১-০২ সালের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বিভিন্ন সাংগঠনিক এবং বাজেট সভাগুলোতে সক্রিয় ভূমিকা রাখার মাধ্যমে একজন শান্তিরক্ষীর মাসিক বেতন এক হাজার ২৮ ডলারে উন্নীত করতে সক্ষম হয়।[১৫] জি-৭৭সহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন-সম্পর্কিত নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে বাংলাদেশকে অব্যাহতভাবে অবদান রাখার অনুপ্রেরণা জোগায়।

বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত সেনা ও পুলিশ সাধারণত দুই ধরনের কাজে নিযুক্ত হয়ে থাকে—বর্তমানে চলছে এ রকম কোনো মিশনে পর্যায়ক্রমিক পদায়ন এবং একেবারে নতুন শুরু হওয়া মিশনে প্রথমবারের মতো পদায়ন। এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই সশস্ত্র ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের নিবিড় প্রশিক্ষণ এবং মিশন সংশ্লিষ্ট প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ভবিষ্যতে মিশনে সব সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী সেনা ও পুলিশ সদস্যকে মিশনের প্রাথমিক অগ্রগামী দলের উপদেশ অনুসারে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই মিশন সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ মিশনের বিশেষ চাহিদার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। যেকোনো বিদ্যমান মিশনে পর্যায়ক্রমিক পদায়ন অপেক্ষা নতুন জায়গায় সেনা প্রেরণ সব সময় চ্যালেঞ্জিং এবং এ উপলক্ষে প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রস্তুতি সময়সাপেক্ষ ও কঠিন একটি প্রক্রিয়া। বাংলাদেশ বিগত বছরগুলোতে কৃতিত্বের সঙ্গে এই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন অ্যান্ড ট্রেনিং (বিপসট)

ভবিষ্যৎ শান্তিরক্ষীদের এ-সংক্রান্ত বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ আর্মড ফোর্সেসের পরিচালনায় পিস কিপিং অপারেশনস অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিকেওটিসি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু। ২০০২ সালে নতুন সামর্থ্য ও সম্পদ নিয়ে এই স্টেট অব দ্য আর্ট প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান নামে যাত্রা শুরু করে। বিপসট নিয়মিতভাবে শান্তিরক্ষী প্রদান-পূর্ববর্তী প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এ ছাড়া মিলিটারি অবজারভারদের জন্য রয়েছে বিশেষ প্রশিক্ষণ। বিপসট বিভিন্ন ধরনের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে, যাতে বর্তমান সময়ের শান্তিরক্ষা মিশনের চাহিদার প্রতিফলন রয়েছে। এখন পর্যন্ত বিশ্বমানের এই ট্রেনিং ইনস্টিটিউট পাঁচ সহস্রাধিক শান্তিরক্ষীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, যাতে ২৫টি দেশের নয় শতাধিক বিদেশি প্রশিক্ষণার্থীও রয়েছেন।[১৬]

পুলিশ সদস্যরাও বিপসটে বিশেষ প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন। তবে সারদায় অবস্থিত পুলিশ ট্রেনিং একাডেমিতে দুই সপ্তাহব্যাপী প্রবেশিকা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুলিশ সদস্যরা শান্তিরক্ষা মিশনে তাঁদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন। বহুমুখী এই প্রশিক্ষণে পুলিশ সদস্যদের মিশন দেশগুলোর ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা, শান্তিরক্ষা-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কৌশল—যেমন মধ্যস্থতা ও আলোচনা, যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে পুনর্বাসন ও জনমানুষের নিরাপত্তা প্রদানসংক্রান্ত নানা বিষয়ে সম্যক জ্ঞান প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ পুলিশ সম্ভাব্য শান্তিরক্ষীদের প্রশিক্ষণ প্রদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পুলিশ একটি পরিপূর্ণ ও আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণকেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। এই লক্ষ্যে পুলিশ অদূর ভবিষ্যতে একটি স্টেট অব দ্য আর্ট প্রশিক্ষণকেন্দ্র নির্মাণ করতে আগ্রহী।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ উভয় বাহিনীর সদস্যকে আরও বেশি উপযুক্ত করে তুলতে বিদেশি বন্ধুরাষ্ট্র ও তাদের দাতা সংস্থাগুলো বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে একযোগে কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ইউএসএআইডি এবং যুক্তরাজ্যের ইউকেএআইডি (ডিএফআইডি) শান্তিরক্ষীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। যদিও সিভিল সোসাইটির সদস্যদের এবং এ ধরনের সংস্থাগুলোর অনুপস্থিতি এই প্রক্রিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় সিভিল সোসাইটির অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনযোগ্য।

শান্তিরক্ষা মিশনে সেনা/পুলিশ প্রেরণের যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের সংঘাতময় রাজনৈতিক ইতিহাস এবং এর সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পথে নিয়ত চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনা করলে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে এ ধরনের দীর্ঘমেয়াদি ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব। আপাতত সাধারণ পর্যালোচনায়

বাংলাদেশের শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের একটি ত্রিমুখী কারণ আলোচনা করা যেতে পারে। এগুলো হলো নিম্নরূপ :

ক. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করে তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছে এবং একই সঙ্গে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে পেরেছে।

খ. বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর জন্য এ রকম একটি বহুজাতিক পরিবেশে কাজ করার সুযোগ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ এ ধরনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামরিক খাতে বৈশ্বিক অগ্রগতির কারণে সংগঠিত সব নীতি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রত্যক্ষ অংশীদার হতে পারছে। এতে বাহিনীগুলোর পেশাগত দক্ষতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ. বাংলাদেশের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক প্রণোদনা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ। মিশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত অর্থসম্পদ এ দেশের অর্থনীতিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এ ছাড়া জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিবেচনায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর জন্য নতুন সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই চলমান প্রক্রিয়া বাহিনীসমূহের আধুনিকায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। এটি হলো বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রসূত হুমকি বা প্রথাগত নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। বাংলাদেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মূলত অভ্যন্তরীণ হুমকিগুলো মুখ্য এবং এগুলো জাতিসংঘে সেনা প্রেরণের ক্ষেত্রে কোনো বাধার সৃষ্টি করেনি। তবে বিগত দুই দশকেরও বেশি সময় জাতিসংঘ মিশনগুলোতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখে চলায় এক প্রকার কেন্দ্রাতিগ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক যৌক্তিকতার অবতারণা ঘটেছে। এই যৌক্তিক বাস্তবতা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংঘটিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধারাবাহিক ঘটনাবলির সংমিশ্রণে উৎপন্ন এবং তা বর্তমানে জাতিসংঘে সেনা প্রেরণের ক্ষেত্রে বহির্মুখী বলপ্রয়োগে সচেষ্ট।

রাজনৈতিকভাবে গত দুই দশকের অধিককাল ধরে গণতান্ত্রিক শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকায় সেনাবাহিনী তার পেশাগত দায়িত্ব পালনে অধিক মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। এই সময়ে একটি পেশাদার সশস্ত্র বাহিনী হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘ মিশনে অংশগ্রহণ এবং কৃতিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। তা ছাড়া ব্যক্তিগত পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নতি মিশন সম্পর্কে সশস্ত্র/পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এভাবে অর্থনৈতিক ও পেশাগত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জাতিসংঘ মিশনে অংশগ্রহণের

মাধ্যমে বাহিনীসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের অপার সম্ভাবনার সুযোগ তৈরি হয়েছে। সুতরাং বর্তমান সশস্ত্র বাহিনীর ধরন ও প্রকৃতি নব্বইয়ের দশকের পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় অনেকটাই ভিন্ন। এখানে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের পরিবর্তে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রণোদনা সশস্ত্র বাহিনীর প্রকৃতি ও ধরনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে।

নিম্নরূপ আলোচনায় আরও বিশদভাবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা আলোচনা করা হয়েছে।

রাজনীতিক এবং নিরাপত্তা যুক্তিসমূহ

বাংলাদেশের সংঘাতময় রাজনৈতিক ইতিহাস জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে অংশগ্রহণের পেছনে একটি বড় ভূমিকা পালন করে। ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ফলে যে সেনাবাহিনীর জন্ম হয় তা স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন ছিল। এই রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে সেনাবাহিনী ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০—এই দীর্ঘ ১৫ বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে রাখে এবং ১৯৯০ সালে গিয়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্রের পুনঃ আবির্ভাবের অর্থ এই নয় যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়েছে। সত্যি বলতে, আজও বাংলাদেশের রাজনীতিতে সশস্ত্র বাহিনী একটি শক্তিশালী নিয়ামক। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহ সশস্ত্র বাহিনীর শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে অংশগ্রহণকে স্বাগত জানিয়েছে। কারণ, তারা বিশ্বাস করে এই ধরনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ফলে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হবে, যা বাংলাদেশে গণতন্ত্র সুসংগঠিত করতে সহায়তা করবে। উপরন্তু, বৃহৎ শক্তিসমূহ যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সক্রিয় সহায়তায় শান্তি মিশনসমূহে অংশগ্রহণের ফলে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ফোরামগুলোতে বাংলাদেশের পরিচিতি বৃদ্ধি পায়।

অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা

বাংলাদেশ একটি নিম্ন আয়ের উন্নয়নশীল দেশ, যার স্থূল জাতীয় মাথাপিছু আয় ৭০০ মার্কিন ডলার (২০০৭ থেকে ২০১১-এর মধ্যে)।[১৭] গত দুই দশকে যথেষ্ট অর্থনৈতিক অগ্রগতি সত্ত্বেও দেশটি উচ্চ জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং সীমিত অর্থনৈতিক সম্পদের ফলে এখনো কাঙ্ক্ষিত সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারেনি। এই অবস্থায় বাংলাদেশ সরকার বহির্বিশ্বে অর্থনৈতিক সুযোগ সন্ধান করার ব্যাপারে তৎপর এবং স্বাভাবিকভাবেই জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের বেতন-ভাতা এবং ক্ষতিপূরণের হার বাংলাদেশি সেনা এবং পুলিশদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এই শান্তিরক্ষীদের দ্বারা

অর্জিত আর্থিক সুবিধা দেশের অর্থনীতিকে চাঙা রাখতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকারি সূত্র মতে, ২০০১-১০ সময়ে বাংলাদেশ সেনা মোতায়েন, কন্টিনজেন্টের মালিকানাধীন সরঞ্জাম এবং অন্যান্য খাত বরাবর জাতিসংঘ থেকে ১.২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে।[১৮] জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে অংশগ্রহণের ফলে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় এবং ব্যবহার, সেনাসদস্যদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে, যা স্বাভাবিক অবস্থায় তাদের প্রদান করা সম্ভব হতো না। শান্তিরক্ষা মিশনসমূহ বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য পরোক্ষ আর্থিক সুবিধাও তৈরি করেছে, বিশেষ করে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য কৃষি ও ওষুধ খাতগুলোতে নতুন বাজার সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে কৃষিজমি লিজ নিয়ে খামার স্থাপন করা, যা বাংলাদেশ এবং হোস্ট দেশ উভয়ের খাদ্যচাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

মাননির্ধারক যৌক্তিকতা

বাংলাদেশ সব সময় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণসহ জাতিসংঘের নীতির প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে এসেছে। জাতিসংঘে শান্তিরক্ষী প্রদান করে বাংলাদেশ বিদেশে দেশের ইতিবাচক ইমেজ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। ২০১১ সালে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা দিবসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করার জন্য শান্তিরক্ষীদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।[১৯] একই সুরে কথা বলেন জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন।[২০] লন্ডন থেকে প্রকাশিত স্বনামধন্য সাপ্তাহিক *দি ইকোনমিস্ট* ২০০৭ সালে এই প্রসঙ্গে বলে, শান্তিরক্ষীদের নীল হেলমেট পরিধান করে বাংলাদেশিরা বিশ্বের কাছে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাজনীতি এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বাইরেও যে বাংলাদেশের একটি পরিচিতি আছে তা তুলে ধরার সুযোগ করে দিয়েছে।[২১]

প্রাতিষ্ঠানিক যৌক্তিকতা

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামরিক বাহিনী বড় ভূমিকা পালন করে এবং এই সহযোগিতা দেওয়ার পেছনে সেনাবাহিনীর শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশি সেনারা বিদেশি সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ পান এবং নিজেদের পেশাদারি দক্ষতার উন্নয়ন করার সুযোগ পান। দ্বিতীয়ত, শান্তিরক্ষার ফলে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সরঞ্জাম এবং অস্ত্র প্ল্যাটফর্ম ক্রয় করা সম্ভব হয়েছে, যা অন্যথায় বাংলাদেশের ক্রয়ের নাগালের বাইরে থাকত।

তৃতীয়ত, শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত সেনাসদস্যরা কর্মসূত্রে বিদেশি সেনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগ পান। এর ফলে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের ভাষাগত উন্নতি, সামরিক পেশাদারি দক্ষতা এবং আন্তব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। সর্বশেষে প্রশিক্ষিত শান্তিরক্ষীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং (বিপসট) স্থাপন করেছে।[২২] এই মর্যাদাপূর্ণ ইনস্টিটিউটে বিদেশি ও বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিপসট প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করার পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমা রাষ্ট্র সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। এই রকম মর্যাদাপূর্ণ ও বিশ্বমানের একটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে সেনাবাহিনীর পেশাদারি ভাবমূর্তি বিশ্বে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মিশনে সেনা প্রেরণের 'সম্ভাব্য' বাধাসমূহ

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির অস্থিতিশীলতা এ দেশে প্রকৃত গণতন্ত্রায়ণের পথে নিঃসন্দেহে একটি বাধা, কিন্তু এখনো পর্যন্ত এই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় বাংলাদেশের শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ কোনো বড় ধরনের হুমকির সম্মুখীন হয়নি। জাতীয় ও স্থানীয় রাজনীতির বহু বিষয়ে মতানৈক্য থাকলেও দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জাতিসংঘ শান্তি মিশনে অংশগ্রহণে এক ধরনের নিরঙ্কুশ সমর্থন ব্যক্ত করেছে। এমনকি সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী বাম দলগুলো যেখানে পশ্চিমা বিশ্বের আগ্রাসন ও বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে তাদের 'নব্য সাম্রাজ্যবাদী' আচরণের বড় সমালোচক, সেখানে জাতিসংঘের মিশনগুলোতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে তাদের কখনো সমালোচনামুখর হতে দেখা যায়নি।

তবে জাতিসংঘে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের যে বিষয়টি লক্ষ রাখতে হয় তা হলো, এমন কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়া যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠীর সমর্থন না থাকে বা তাদের অনুভূতিতে আঘাত হানে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ২০০৩-এর ইরাক দখল-পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘের ম্যান্ডেট থাকা সত্ত্বেও ইরাক শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করেনি। এ সিদ্ধান্তের পেছনে জনমত একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ, গবেষক ও বুদ্ধিজীবী মহল জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন এবং এতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে গভীর চিন্তালব্ধ জ্ঞানপ্রসূত রচনা ও প্রকাশনায় কখনোই মনোনিবেশ করেনি। এখনো পর্যন্ত সীমিত সংখ্যক নিবন্ধ আন্তর্জাতিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে, যা এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেছে এবং রাজনীতিতে এই মিশনের প্রভাব ও সামরিক-বেসামরিক

সম্পর্কে এর ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে।[২৩] তবে জাতীয় পর্যায়ে কিছু জার্নালে এবং পত্রিকায় বেশ কিছু লেখা প্রকাশ করা হয়েছে, যেগুলো পুরো বাস্তবতাকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়নি। এই ক্ষেত্রে জ্ঞান বিস্তারের অপ্রতুলতা ভবিষ্যতে সঠিক ও সময়োপযোগী অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা হতে পারে।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর শক্তিশালী অবস্থান ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হওয়ায় জাতিসংঘ মিশনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এই বাহিনীর একচ্ছত্র আধিপত্য এখনো পর্যন্ত কোনো বাধার সম্মুখীন হয়নি। রাজনীতিবিদেরাও মনে করেন এই মিশনসমূহে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর যে সুখ্যাতি তৈরি হয়েছে তা তাদের ভবিষ্যতে দেশ পরিচালনা বা রাজনীতিবিদদের নিয়ন্ত্রণের দুরভিসন্ধি থেকে দূরে রাখবে।

চ্যালেঞ্জ এবং ইস্যুসমূহ

অভ্যন্তরীণ ইস্যুসমূহ: বাংলাদেশের সামরিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহ প্রচণ্ড রকম প্রভাব রেখেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং ডিসকোর্সে আজ শান্তিভিত্তিক মডিউল এবং যুদ্ধোত্তর রাষ্ট্রকাঠামো তৈরির বিষয়সমূহ স্থান করে নিয়েছে। প্রকৃতিগতভাবে এই বিষয়গুলো সাধারণ 'জাতীয়' নিরাপত্তা এবং যুদ্ধের প্রস্তুতির ধারণা থেকে 'মানব নিরাপত্তা' ধারণার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। এই বিষয়সমূহ স্বাভাবিকভাবে সেনাবাহিনীর প্রচলিত ধ্যান-ধারণা এবং কর্মপদ্ধতির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।[২৪] ফলে অনেকে আজ মনে করেন পঁচিশ বছর একটানা শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে অংশগ্রহণের পর বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ঐতিহ্যগত জাতীয় প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ও শান্তিরক্ষা—এই দুই ভূমিকার মধ্যে একটি ভারসাম্য আনা প্রয়োজন।[২৫] দুঃখজনক হলেও সত্য যে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সাধারণ যুদ্ধকালীন দায়িত্বের ওপর শান্তিরক্ষা মিশনসমূহের প্রভাব কেমন তা নিয়ে এখন পর্যন্ত অতি সামান্য কিংবা একেবারেই কোনো চিন্তাভাবনা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

শান্তিরক্ষার বিষয়টি প্রতিরক্ষা বাজেট তৈরি এবং সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়-প্রক্রিয়ার ওপর প্রভাব রেখেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার রাশিয়ার সঙ্গে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের একটি অস্ত্র ক্রয় চুক্তি সম্পন্ন করেছে। এই চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ রাশিয়ার কাছ থেকে বৃহদাকার এমআই-১৭ হেলিকপ্টার, যুদ্ধ প্রশিক্ষক বিমান, পন্টুন সেতু, ব্যক্তিগত সাঁজোয়া বাহক এবং ট্যাংক-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ক্রয় করবে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এই ক্রয়কে বাংলাদেশের

শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করে[২৬] এবং আরও জানায় যে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে তার শান্তিরক্ষীদের জন্য আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র কেনার প্রস্তাব দিয়েছে। এই প্রস্তাবের পেছনে মূল কারণ হিসেবে বলা হয় যে বিশ্বের যেসব সংঘাতময় এলাকায় শান্তিরক্ষীরা কাজ করছেন, সেখানে বিবদমান সশস্ত্র দল কিংবা জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো প্রায়ই যেসব অস্ত্র ব্যবহার করে তা বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের ব্যবহৃত অস্ত্রের তুলনায় বেশি আধুনিক।

নিঃসন্দেহে এই নতুন অধিগ্রহণের কিছু জাতিসংঘ মিশনগুলোতে নিয়োজিত বাংলাদেশি কন্টিনজেন্টদের প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। তথাপি এই ধরনের ক্রয় সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের জন্য উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। মনে রাখা প্রয়োজন যে বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে প্রতিরক্ষা ক্রয়সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার অভাব ও দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে। এ ধরনের অভিযোগের পুনরাবৃত্তি জাতিসংঘ মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণকে প্রশ্নের সম্মুখীন করবে ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল সম্প্রতি এক সমীক্ষায় প্রতিরক্ষা ক্রয়ে দুর্নীতি হতে পারে এমন উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন ১৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশকেও চিহ্নিত করেছে।[২৭] উপরন্তু, অস্ত্র চুক্তির জন্য আত্মপক্ষ সমর্থন হিসেবে যদিও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহকে যুক্ত করা হয়েছে, কয়েকজন বিশ্লেষক[২৮] মনে করেন রুশ অস্ত্র ক্রয়ের জন্য জাতিসংঘের প্রয়োজনীয়তা একটি বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি নয়, বরং অন্যান্য জটিল সমীকরণ এর পেছনে কাজ করছে। এ ছাড়া প্রতিরক্ষা খাতে অতিরিক্ত ব্যয় দেশের অন্যান্য অগ্রাধিকারমূলক খাতে ব্যয়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং তা বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। সর্বশেষে, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে ব্যবহারের পরে এসব দামি সরঞ্জামের ভবিষ্যৎ ব্যবহার কী তার সঠিক দিকনির্দেশনাও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক নির্দেশিত হয়নি।

যদিও বাংলাদেশে একটি ব্যাপক মতৈক্য বিদ্যমান যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে অংশগ্রহণের ফলে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা হ্রাস পাবে, এই মত সর্বগ্রহণযোগ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৭ সালে সেনাবাহিনী পরোক্ষভাবে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সরিয়ে তার পছন্দসই বিকল্প অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় স্থাপন করে। ওই সময় সেনাবাহিনী সক্রিয়ভাবে একটি অরাজনৈতিক মন্ত্রিসভা গঠনে সহায়তা প্রদান করে, যার মূল লক্ষ্য ছিল সব রাজনৈতিক দলের জন্য একটি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করা। এই পুরো প্রক্রিয়াতে সেনাবাহিনী নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয় এবং সম্পূর্ণ

অধ্যায়টি বাংলাদেশে বেসামরিক শাসনের ভঙ্গুর অবস্থার একটি নিদর্শন ছিল।[২৯] যদিও ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি ২০০৭-২০০৮ সালে সেনাবাহিনীর ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে ওঠে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা এবং প্রভাব সম্পর্কে নতুন বিতর্কের জন্ম দেয়। সামরিক বাহিনীর ওপর জনপ্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণও হ্রাস পাচ্ছে, যার উদাহরণস্বরূপ প্রতিরক্ষা বিষয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির নিষ্ক্রিয় ভূমিকাকে উল্লেখ করা যায়।[৩০] উপরন্তু, বেসামরিক প্রশাসন এবং কার্যক্রমে সামরিক ব্যক্তিদের উপস্থিতি ১৯৭৫-৯০ সালের সামরিক স্বৈরাচারী যুগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়নি। এসবের ফলে বাংলাদেশে সামরিক ও বেসামরিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ঐতিহ্যগত বিভাজন ক্রমাগতভাবে এক ধরনের অস্পষ্টতায় আচ্ছাদিত হয়ে পড়ছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (ভিডিপি) এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যদের অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা এখন পর্যন্ত অমীমাংসিত রয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে এই দুই বাহিনীর অফিসার ও সদস্যরা শান্তি মিশনগুলোতে অংশগ্রহণে আগ্রহী, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁদের এসব কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অনুমতি বাংলাদেশ সরকার প্রদান করেনি। প্রশ্ন জাগে, যদিও এই দুই বাহিনীর সদস্যরা অত্যন্ত দক্ষ ও সুশৃঙ্খল, তবু সরকারের এই অবস্থান ভবিষ্যতে হয়তো এই দুই বাহিনীর মনোবল ও কর্মক্ষমতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

আর্থিক বিষয় অন্যভাবেও বাংলাদেশি শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের ওপর প্রভাব ফেলতে থাকবে। ব্যষ্টিক পর্যায়ে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়াই সেনাবাহিনীতে যোগদানের প্রাথমিক কারণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এর ফলে অনেক দক্ষ মানবসম্পদ (বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) সামরিক বাহিনীর প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে, যারা হয়তোবা সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে পারত। আবার সামরিক বাহিনীর ভেতরে শান্তিরক্ষা মিশনের অংশগ্রহণ অন্য যেকোনো দায়িত্বের তুলনায় অধিক লাভজনক হিসেবে পরিগণিত হয় এবং বেশ অধিকসংখ্যক অফিসার শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে অংশগ্রহণের পর চাকরি ছেড়ে যান অথবা অতি দ্রুত অবসরের জন্য আবেদন করেন, যা সশস্ত্র বাহিনীতে একধরনের দক্ষ জনবলের অভাবের আবহ তৈরি করে। শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে অর্জিত অর্থ দেশের বিদ্যমান বৈদেশিক অর্থের প্রবাহে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং দেশীয় অর্থনীতিকে একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর স্থাপন করে। এতৎসত্ত্বেও জাতীয় অর্থনীতিতে শান্তিরক্ষা মিশনের প্রভাব সঠিকভাবে চিহ্নিত করা বেশ দুরূহ। সাবেক শান্তিরক্ষীদের সঙ্গে আলোচনা করে জানা যায়, মিশনসমূহ

থেকে প্রাপ্ত অর্থ অনেক সময় অর্থনৈতিকভাবে অনুৎপাদনশীল খাত যেমন : বিলাসী ভোগ্যপণ্য ক্রয়, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং উচ্চ মুনাফার আশায় পুঁজিবাজারে লগ্নি করা হয়।

বর্তমানে যদিও বাংলাদেশের শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে অংশগ্রহণের ব্যাপারে দেশের অভ্যন্তরে কোনো ধরনের বিরোধিতা নেই বললেই চলে, তথাপি ভবিষ্যতে এই অবস্থা বিদ্যমান থাকবে কি না তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। সামনের দিনগুলোতে শান্তিরক্ষা মিশনসমূহ আরও অনেক বেশি বিপজ্জনক এবং প্রতিকূল হয়ে উঠলে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যদি শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, সে ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে অংশগ্রহণের ব্যাপারে বাংলাদেশের জনগণ কতটুকু ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করবে তা ভেবে দেখতে হবে। এ ছাড়া বাংলাদেশের ঘরোয়া রাজনীতির মারপ্যাঁচে শান্তিরক্ষা ইস্যু আটকে পড়ার আশঙ্কাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অতিসম্প্রতি দেশের প্রাক্তন প্রধান বিরোধী দল বিএনপি দাবি করে যে তার দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত পুলিশি অভিযানের ফলে জাতিসংঘ মিশনসমূহে বাংলাদেশি পুলিশ সদস্যদের মোতায়েনের ব্যাপারে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।[৩১] অপরপক্ষে বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে এই আশঙ্কা নাকচ করে দিয়ে দাবি করে, প্রকৃতপক্ষে মিশনসমূহে বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যদের সংখ্যা বরং ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৩২] সরকার আরও জানায়, অতিসম্প্রতি জাতিসংঘ বাংলাদেশকে মালিতে ৬০০ সেনা প্রেরণের অনুরোধ জানিয়েছে।[৩৩] এসব দাবি এবং পাল্টা দাবি এই বাস্তবতা প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের সংঘাতময় রাজনৈতিক বাস্তবতার ফলে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে অংশগ্রহণ যেকোনো সময় দলীয় রাজনৈতিক সংকীর্ণতা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

সর্বশেষে, বাংলাদেশ নিরাপত্তা বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য এলাকায় জাতিগত সংখ্যালঘু এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও অন্যদের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকে[৩৪]—এই ধরনের অভিযোগ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল, সেই প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে এবং ভবিষ্যতে শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি অন্তরায় হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে।

এটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা ও তার প্রচারের যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তার অভাব প্রচণ্ড রকমভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার আন্তবিরোধ থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি রাজনৈতিক দল এ বিষয়টিকে জাতীয় গর্বের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-নিয়ন্ত্রিত থিঙ্ক ট্যাংক বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ[৩৫] ২০১০

সালে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে এবং বাংলাদেশের অংশগ্রহণের ওপর বেশ কিছু সেমিনার পেপার বিতরণ করে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এটি একটি নিয়মিত ইভেন্টে পরিণত হতে পারেনি।

বাংলাদেশে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বর্তমান উত্থান নিঃসন্দেহে একটি বড় বিবেচনার বিষয়। এই মিডিয়াগুলোকে প্রায়ই বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যুতে সমালোচনামুখর হতে দেখা যায়। আশ্চর্যজনকভাবে এই একটি বিষয়ে মিডিয়াগুলোকে কখনোই তেমন সমালোচকের ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যায় না। তবে নিয়মিতভাবে এই মিডিয়াতে জাতিসংঘে অংশগ্রহণের শুধু ইতিবাচক দিকগুলো গুরুত্বের সঙ্গে প্রচারের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। জাতিসংঘ মিশনে প্রকৃতি পরিবর্তন বা অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় বাংলাদেশের করণীয় সম্পর্কে মিডিয়াগুলোর অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের অভাব রয়েছে।[৩৬]

বৈশ্বিক ইস্যুসমূহ : বিশ্ব রাজনীতিতে পরিবর্তনসমূহ প্রত্যহ রাষ্ট্রসমূহকে নতুন নতুন পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দেয়। শান্তিরক্ষা মিশনসমূহ এ রকম পরিবর্তন দ্বারা প্রায়ই প্রভাবিত হয় এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে নিজেদের অবস্থান নির্ণয় এবং প্রয়োজনবোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করে। বাংলাদেশের সম্মুখে এ রকম কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান।

আঞ্চলিক সংগঠনসমূহের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি এখন বিশ্ব রাজনীতির একটি অত্যাবশ্যকীয় ধারা। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিষয়সমূহে আঞ্চলিক সংগঠনসমূহ ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমরা জানি, বর্তমানে বেশির ভাগ শান্তি মিশন আফ্রিকা মহাদেশে পরিচালিত হয়ে আসছে এবং এই মহাদেশের রাষ্ট্রসমূহ খুব স্বাভাবিকভাবেই চাইছে তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক সংগঠন, বিশেষ করে আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং পশ্চিম আফ্রিকান রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক সংগঠন (ইসিওডব্লিউএএস) এই অঞ্চলের সংঘাতময় পরিস্থিতিতে গঠনমূলক ও প্রধান ভূমিকা পালন করুক। সুদানের দারফুর অঞ্চলে জাতিসংঘ এবং আফ্রিকান ইউনিয়নের যৌথ মিশন (২০০৭) এবং বর্তমানে মালিতে পশ্চিম আফ্রিকান রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক সংগঠনের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া দরকার যে আফ্রিকান আঞ্চলিক সংগঠনসমূহ বিবিধ সমস্যা যথা রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্টতা, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, কাঠামোগত ত্রুটি, আর্থিক স্বল্পতা ও পরিকল্পনা সীমাবদ্ধতা দ্বারা আক্রান্ত। তথাপি ভবিষ্যতে আমরা আফ্রিকা ও অন্যান্য সংঘাতময় এলাকায় আঞ্চলিক সংগঠনসমূহের কার্যক্রম বৃদ্ধি হতে দেখব এবং শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে এ রকম ব্যবস্থা আরও বৃহত্তর ভূমিকা পালন করবে। আমাদের নীতিনির্ধারকদের প্রশ্ন করতে হবে, এ রকম পরিস্থিতিতে

বাংলাদেশের করণীয় কী হতে পারে এবং এ ধরনের হাইব্রিড মিশনসমূহে বাংলাদেশের কতটুকু দেওয়ার আছে।

জাতিসংঘ ক্রমেই শান্তিরক্ষাসংক্রান্ত বহুবিধ বিষয় বেসরকারি খাত, বিশেষ করে বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থা বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তর করছে।[৩৭] এ কথা অনস্বীকার্য যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ অদূর ভবিষ্যতে শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে রাষ্ট্রীয় সেনাদলের স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে না রাজনৈতিক ও আইনি কারণে। তবু এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে বেসরকারি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানগুলো মাইন অপসারণ এবং অন্যান্য বিস্ফোরক অপসারণের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। উদাহরণস্বরূপ আরমোর গ্রুপ, রোনকো কনসালটিং এবং ডাইনকর্প ইন্টারন্যাশনাল এই খাতে বড় ভূমিকা পালন করছে। মাইন অপসারণ যেকোনো শান্তিরক্ষা মিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না যে মাইন অপসারণ প্রায় ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ব্যবসা এবং এ রকম লাভজনক খাতের ব্যাপারে বেসরকারি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎসাহ ও অংশগ্রহণ খুব একটা অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয়।[৩৮] এ রকম দক্ষ, অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী ও কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন পশ্চিমা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখা ভবিষ্যতে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে নারীদের অংশগ্রহণ এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সম্প্রতি জাতিসংঘ কর্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাবনা ২১২২-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে জাতিসংঘ শান্তি মিশনসমূহে আরও বেশি সংখ্যক নারী সদস্যের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য, ২০০০ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ প্রস্তাবনা ১৩২৫ পাস করে, যার মাধ্যমে সংঘাতময় পরিস্থিতি উত্তরণের ক্ষেত্রে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বলা হয়।[৩৯] জাতিসংঘ কর্তৃক বারবার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও ২০১৩ সালের মার্চ মাস অবধি শান্তিরক্ষা মিশনসমূহের মধ্যে মাত্র ৪ শতাংশেরও নিচে নারী সদস্য ছিল। প্রস্তাবনা ২১২২-এর ফলে ভবিষ্যৎ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে সচেষ্ট হতে হবে। বাংলাদেশ অবশ্য এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাদেশ হাইতিতে একটি পূর্ণাঙ্গ নারী ফর্মড পুলিশ ইউনিট মোতায়েন করেছে এবং সেনাবাহিনীর নারী সদস্যরাও বিভিন্ন মিশনে অংশগ্রহণ করেছেন। এতৎসত্ত্বেও বাংলাদেশকে আরও বেশি সংখ্যক নারী শান্তিরক্ষী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও মোতায়েনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে, যার প্রভাব সমাজ ও

রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে পড়তে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন, নারী শান্তিরক্ষীদের সংখ্যা বৃদ্ধির অর্থ শুধু সংখ্যার কোনো তারতম্য বা পরিবর্তন নয়, বরং সমাজে বিদ্যমান সামাজিক বিধান ও বৈষম্যগুলো, যা লিঙ্গবৈষম্যকে লালন করে তাদেরও এক যুগান্তকারী পরিবর্তন, যা সহজে অনেকে মেনে নিতে নাও পারে।

সর্বক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে, ভবিষ্যতে শান্তিরক্ষা মিশনসমূহ শুধু শান্তিরক্ষায় সীমিত না থেকে রাষ্ট্রগঠন এবং ভঙ্গুর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হতে পারে। এ রকম পরিস্থিতিতে শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে পুলিশ সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। স্থায়ী শান্তি এবং সমাজে আইনের শাসনের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের মধ্যকার সম্পূরক সম্পর্কটি যত বেশি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তত বেশি পুলিশ সদস্যদের জাতিসংঘের বিভিন্ন মিশনসমূহে এবং পদে নিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য এই পরিস্থিতি একদিকে যেমন এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়, ঠিক তেমনি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবেও আবির্ভূত হতে পারে। সম্ভাবনা এই কারণে যে বাংলাদেশের পুলিশ সদস্যরা ইতিমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ স্থানে নিয়োজিত হয়ে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে দেশের জন্য সুনাম বয়ে এনেছেন। তবে এই সম্ভাবনার জন্য একটি বড় অন্তরায় এই যে বেশির ভাগ রাষ্ট্রই পুলিশ সদস্য নিয়োগের ব্যাপারে কিছুটা গররাজি। কারণ, প্রতিটি রাষ্ট্রই নিজস্ব আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সর্বদা সচেতন থাকে এবং তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে দক্ষ ও পেশাদার পুলিশের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি। এমতাবস্থায় শান্তিরক্ষী সরবরাহকারী রাষ্ট্র অথবা সরকার প্রায়ই মিশনসমূহে দক্ষ পুলিশ সদস্য নিয়োগের ব্যাপারে কিছুটা হলেও দ্বিধান্বিত থাকে। পুলিশ নিয়োগের বিষয়টি যত প্রাধান্য পাবে তত আরও একটি বিষয়ের ব্যাপারে বাংলাদেশকে ভাবতে হবে। বর্তমানে মানবাধিকার বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের যেকোনো সংবাদ খুব দ্রুত পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়তে পারে বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন ও বহুল ব্যবহারের কারণে। এ রকম অবস্থায় বাংলাদেশের পুলিশ ও সরকারকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলো অত্যন্ত দক্ষভাবে এবং দ্রুত মোকাবিলা করতে হবে এবং এই বিষয়গুলো যেন না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। এ বিষয়ে আরও মনে রাখা দরকার, পুলিশ সদস্যদের সেনাসদস্যদের মতো শান্তিরক্ষার বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজন। দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশ এখনো এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিংয়ের (বিপসট) মতো বাংলাদেশের পুলিশ সদস্যদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করা এবং তার মাধ্যমে দক্ষ

প্রশিক্ষণ দেওয়া ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জিং মিশনসমূহে পুলিশের নিয়োগ নিশ্চিত করার বিষয়ে বাংলাদেশকে দ্রুত ও গভীরভাবে ভাবতে হবে।

উপসংহার : ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সূত্রপাত

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর মতো একটি সুশিক্ষিত ও সুশৃঙ্খল বাহিনী যেকোনো জায়গায় জাতিসংঘের ম্যান্ডেটে শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক এবং সক্ষম—এ বিষয়টি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য একটি বড় ক্ষমতা। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রাজনীতিবিদদের ও অন্য সবার নিরঙ্কুশ সহযোগিতা এই সক্ষমতাকে আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ সরকার ও সশস্ত্র বাহিনী জাতিসংঘ মিশনে অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নতুন অস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণসামগ্রী ক্রয়ে সর্বদাই ইচ্ছুক। এই মনোভাব জাতিসংঘ মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ আরও প্রভাবিত করবে।

এতৎসত্ত্বেও বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো আলোচনার দাবি রাখে এবং বাংলাদেশের অংশগ্রহণকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। প্রথমত, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ দুঃসাধ্য। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা, বিশেষ করে এর অস্ত্রভান্ডার ও অন্যান্য উপকরণের বহর হয়তো প্রাচীন নয়। কিন্তু ভবিষ্যতের শান্তিরক্ষা মিশনের প্রকৃতি অনুযায়ী তা প্রস্তুত কি না এ বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত শত্রু মোকাবিলায় শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে এখনো প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। সবশেষে, বাংলাদেশে সেনা প্রেরণসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রণয়ন সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা সর্বাধিক প্রভাবিত। এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে জাতিসংঘ মিশনগুলোতে ক্রমবর্ধমান বহুমুখী কারণে যেভাবে বেসামরিক বিশেষজ্ঞের ব্যবহার বাড়ছে, তা এই সিদ্ধান্ত প্রণয়ন-প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। সর্বোপরি এই পরিবর্তন বাংলাদেশের বর্তমান অংশগ্রহণের প্রকৃতিকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করবে। এই বিষয়ে অতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহকে এখনই এ বিষয়গুলো অতি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। আমাদের তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর প্রতি কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে যেসব দেশে মিশনে অংশগ্রহণ করেছে সেসব দেশে কূটনৈতিক মিশন খোলাসহ সব ধরনের যোগাযোগ রক্ষায় ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পথ খোলার লক্ষ্যে জোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এভাবে বাংলাদেশ আফ্রিকার দেশগুলোতে ব্যবসা-বাণিজ্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অপার সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে। বাংলাদেশ সরকার ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে এই ব্যবসায়িক সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলার জন্য এগিয়ে আসার পথ সুগম করতে হবে। সেই সঙ্গে ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সংগঠনকে (যেমন : এফবিসিসিআই) স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। ওপরে বর্ণিত আলোচনার সূত্র ধরে বাংলাদেশকে ভবিষ্যৎ মিশনের জন্য আরও দক্ষ পুলিশ বাহিনী মোতায়েনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ ছাড়া বেসামরিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে আমাদের সশস্ত্র ও পুলিশ বাহিনীকে সে মোতাবেক দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় বেসামরিক দক্ষতা বাড়াতে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে একটি যৌথ টেকসই প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের উন্নয়ন খাতে এনজিওর অবদান সর্বজনস্বীকৃত এবং আমাদের এই সফলতা আমরা মিশন-পরবর্তী ভঙ্গুর রাষ্ট্র বিনির্মাণে কাজে লাগাতে পারি। সবশেষে সশস্ত্র, পুলিশ বাহিনী ও একাডেমিক গবেষকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি দলকে সর্বদা শান্তিরক্ষা মিশনের অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ-সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করতে হবে এবং এ জন্য সরকারকে ও বেসরকারি খাতকে সম্ভাবনার সব প্রয়াস নিতে হবে। এভাবে বাংলাদেশ বৈশ্বিক শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে এক অনন্য ও যুগোপযোগী অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র

১. Kabilan Krishnasamy, 'Bangladesh and UN Peacekeeping: The Participation of a "Small" State,' *Commonwealth and Comparative Politics*, 41:1 (2003), p. 32.

২. Ilyas Iftekhar Rasul, 'Bangladesh's Contribution to United Nations Peacekeeping Missions in Africa,' paper presented at a seminar on Look Africa: An Emerging Foreign Policy Option for Bangladesh. (Dhaka: Bangladesh Institute of International And Strategic Studies, 2 December 2010), p. 4.

৩. Paul D. Williams, *War and Conflict in Africa* (Cambridge: Polity Press, 2011), pp. 199-200.

৪. Rasul, 'Bangladesh's Contribution to United Nations Peacekeeping Missions in Africa,' p. 4.

৫. 'Freetown seeks investment in garment, textile, President Kabbah leaves today, thanks Dhaka for peacekeeping in Sierra Leone,' The *Daily Star*, 23 October 2003, at http.//www.thedailystar.net/2003/10/23/d3102301022.htm (accessed 19 May 2012).

৬. এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত তথ্যউৎস আইআইএসএস, 'দ্যা মিলিটারি ব্যালেন্স ২০১৩' (লন্ডন : আইআইএসএস/রাউটলেড্‌স, ২০১৩)।

৭. বাজেটের তথ্যউৎস—'Sentinel Security Assessment- South Asia', Jane's Sentinel Country Risk Assessments, 11 April 2012.

৮. সশস্ত্র খাতে গড় ব্যয় (মোট ব্যয়/সেন্যসংখ্যা) হলো সশস্ত্র খাতে সর্বমোট ব্যয়কে সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত সব সেনাসংখ্যা দ্বারা ভাগ করে প্রাপ্ত ফলাফল। সর্বশেষ তথ্যসূত্র IISS, 'The Military Balance 2013'.

৯. See UN DPKO, *UN Mission's Summary Detailed by Country,* at http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2013/apr13_3.pdf (accessed 10 May 2013).

১০. Armed Forces Division, 'Bangladesh in UN Peacekeeping Missions,'at http://www.afd.gov.bd/images/supp/Brochure-UN%20DAY.jpg (accessed 10 May 2013).

১১. Armed Forces Division, 'Special Supplement on International Day of UN Peacekeepers 2011,' 29 May 2011, at http://www.afd.gov.bd/?q=node/56 (accessed 05 April 2013).

১২. See UN Police Magazine, 10th Edition, January 2013, at http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/unpolmag/unpolmag_10.pdf (accessed 10 May 2013).

১৩. 'Bangladeshi Peacekeepers get UN medal in Haiti,' *New Age*, 16 May 2012, at http://www.newagebd.com/detail.php?date=2012-05-16&nid=10477 (accessed 19 May 2012).

১৪. ২০০৫ সালে ওভারসিজ অপারেশনস ডিরেকটরেট স্থাপন করা হয় এবং এ রকম বিশেষায়িত সংস্থা তৈরির মাধ্যমে মিলিটারি অপারেশনস ডিরেকটরেটকে জাতিসংঘে সেনা প্রেরণবিষয়ক অতিরিক্ত দায়িত্ব থেকে মুক্ত করা হয়। লেখকদ্বয়ের ডি পি কে ও অফিসারের সঙ্গে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য।

১৫. ৩ মে, ২০১২ সালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের একজন জ্যেষ্ঠ কূটনীতিকের সঙ্গে ওয়াশিংটন ডিসিতে লেখকদ্বয়ের সাক্ষাৎকার। সেই কূটনীতিক জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১২ সালের মধ্যে সৈন্য প্রেরণকারী দেশগুলোর সঙ্গে ৮৫ মার্কিন ডলারের এককালীন সম্পূরক অর্থ প্রদানের বিধান রেখে একটি আলোচনার ব্যাপারে বাংলাদেশের পক্ষে যারা দরকষাকষি করবেন তাদের নেতৃত্বের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন। See UN General Assembly, A/RES/65/289, 8 September 2011, p.9.

১৬. BIPSOT, Shanti Doot 3 (Dhaka: BIPSOT/GPO/Bangladesh Army/USPACOM, March 2012). At http://www.bipsot.net/download/Magazine_SD3.pdf (accessed 29 April 2012).

১৭. World Bank Country Data, at http://data.worldbank.org/country/bangladesh (accessed 8 May 2013).

১৮. 'Role of BD Armed Forces in UN Peacekeeping Missions', Restricted Bangladesh Army document (no date, anonymous author).

১৯. Prime Minister Sheikh Hasina's message, 'Special Supplement on International Day of UN Peacekeepers 2011,' 29 May 2011, at http://www.afd.gov.bd/?q=node/56 (accessed 05 April 2013).

২০. 'Dhaka, UN for newer areas of partnership', *New Age*, 14 November 2011, at http://newagebd.com/newspaper1/archive_details.php?date=2011-11-14&nid=40076 (accessed 9 May 2013).

২১. 'Supply-side peacekeeping: The UN finds an unusual way to exert influence,' *The Economist*, 21 February 2007, at http://www.economist.com/node/8730316 (accessed 9 May 2012).

২২. See BIPSOT, http://www.bipsot.net/

২৩. Motiar Rahman, 'Blue Beret in the UN Peacekeeping Process: The Case of Bangladesh Police,' *The Indian Journal of Politics* 14, No.1, 2009, 36; Nurul Islam, 'The Army, UN Peacekeeping Mission and Democracy in Bangladesh,' *Economic & Political Weekly*, XLV:29 (17 July 2010), pp.77-85; Shekh Mohammad Altafur Rahman, 'Impact of Human Security Approach in the Post UN Peace Keeping Mission: A Case Study of Bangladesh,' (Paper presented on The 4th International Conference on Human Rights & Human Development Critical Connections: Human Rights, Human Development and Human Security, 18-19 June 2011 Thailand, University of Mahidol, 2011) at http://www.humanrightsmu.org/attachments/article/88/Altaf_Paper.pdf (accessed 28 March 2013); and, Rashed Zaman & Niloy R. Biswas, 'Bangladesh,' in A.J. Bellamy & P.D. Williams (eds.), *Providing Peacekeepers: The Politics, Challenges, and Future of United Nations Peacekeeping Contributions* (Oxford University Press, 2013).

২৪. বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন চাকরিরত কর্মকর্তার সঙ্গে লেখকদ্বয়ের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ২ এপ্রিল, ২০১২।

২৫. Rahman, 'Impact of Human Security Approach in the Post UN Peace Keeping Mission: A Case Study of Bangladesh', p.11.

২৬. 'Arms deal with Russia crucial for UN Peacekeeping: Army' *The Financial Express*, 22 January 2013, at http://www.thefinancialexpress-bd.com /index.php?ref=MjBfMDFfMjJfMTNfMV84OF8xNTc2OTc (accessed 28 March 2013).

২৭. See Transparency International UK, Government Defence Anticorruption Index 2013, at http://government.defenceindex.org

/sites/default/files/documents/GI-exec-summary-english.pdf (accessed 28 March 2013).

২৮. Stephen Blank, 'What Do Russia's Arms Sales to Bangladesh Mean?' *Eurasia Daily Monitor*, Volume: 10 Issue: 17, at http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=40386&tx_ttnews%5bbackPid%5d=228&cHash=fc37665afa0c271fb24ef0e2ee9e6494#.Uc1kn201hMs (accessed 28 March 2013).

২৯. Nurul Islam, 'The Army, UN Peacekeeping Mission and Democracy in Bangladesh', pp.81-2.

৩০. Syed Imtiaz Ahmed, 'Civilian Supremacy in Democracies with 'Fault Lines': The Role of the Parliamentary Standing Committee on Defence in Bangladesh,' *Democratization*, 13:2 (2006), pp.283–302.

৩১. 'Close podium or face Dhaka march, says Khaleda,' *New Age*, 16 March 2013, at http://www.newagebd.com/detail.php?date=2013-03-16&nid=43127#.Uc1l6201hMu (accessed 14 April 2013).

৩২. 'Hasina warns Khaleda against bloodshed,' *Bdnews24.com*, 2013-03-18, at http://bdnews24.com/politics/2013/03/18/hasina-warns-khaleda-against-bloodshed (accessed 14 April 2013).

৩৩. Lovlu Ansar, 'UN increases Bangladeshi peacekeepers,' *bdnews24.com*, 11 May 2013, at http://bdnews24.com/bangladesh/2013/05/11/un-increases-bangladeshi-peacekeepers (accessed 15 May 2013).

৩৪. Hana S. Ahmed, 'Disregarding the Jumma,' *Himal South Asia*, July 2011, at http://www.himalmag.com/component/content/article/4528-disregarding-the-jumma.html (accessed 12 May 2012).

৩৫. BIISS-এর ওয়েবসাইট দেখুন। www.biiss.org

৩৬. See, for example, Ilyas Iftekhar Rasul, 'International Day for UN Peacekeepers,' *The Daily Star*, 29 May 2011; Staff Correspondent, 'Bangladesh to bolster peacekeeping missions, President lauds peacekeepers on Int'l Day,' *The Daily Sun*, 30 May 2012; 'Dhaka largest troops-contributor to UN missions, Int'l Day of UN Peacekeepers today,' *The New Age*, 29 May 2011; and Brig Gen Md. Abdul Hakim Aziz, psc, 'Heroes beyond national frontiers,' *The Daily Star*, 18 June 2011.

৩৭. Ian Richards, 'The UN Must Stop Outsourcing Peacekeepers,' *Huffington Post,* at www.huffingtonpost.com/ian-richards/the-un-must-stop-outsoureing-b.3874641.html.

৩৮. Alex J. Bellamy and Paul D. Williams, *Understanding Peacekeeping*, (Cambridge: Polity Press, 2nd edition, 2010), p.327.

৩৯. 'UN passes new resolution on women's role in peace process,' *The Guardian*, 21 October 2013, at www.theguardian.com/ global-development/2013/oct/21/un-resolution-2122-women-peaceprocess.

বইআলোচনা

মুজিব হত্যায় মার্কিন সংশ্লিষ্টতা : একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

এ এস এম আলী আশরাফ

মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড—মিজানুর রহমান খান, ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে যাদের আগ্রহ আছে, তাদের জন্য মিজানুর রহমান খানের *মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড* একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলৎজ, অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস ও জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক *প্রথম আলো*র সম্পাদক মতিউর রহমান যেসব গবেষণাধর্মী গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন *মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড* সেসব লেখায় প্রাপ্ত অনেক তথ্য, উপাত্ত ও ধারণাকে অনুসমর্থন করেছে। এই বইয়ের প্রথমে লেখক স্পষ্টভাবেই লিখেছেন যে শেখ মুজিব ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা—যাঁর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বগুণে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জন করে এবং বাংলাদেশ নামে এক সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়। স্বাধীনতা লাভের চার বছরের মধ্যে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক সশস্ত্র ও রক্তাক্ত সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্য নিহত হন। এ রকম একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিয়ে লেখক যথার্থই দাবি করেছেন, আরও বস্তুনিষ্ঠ এবং তথ্যনির্ভর গবেষণার প্রয়োজন। তা সত্ত্বেও খুব কম ইতিহাসবিদ ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকই এগিয়ে এসেছেন। সেদিক থেকে চিন্তা করলে মুজিব হত্যাকাণ্ড নিয়ে যে গবেষণাধর্মী প্রকাশনার অভাব রয়েছে, মিজানুর রহমান খানের আলোচ্য গ্রন্থ সে অভাব কিছুটা হলেও পূরণ করতে পারে।

মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড একটু ব্যতিক্রমধর্মী গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করেছে। মুজিব হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্রকাশিত অধিকাংশ লেখা যেখানে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার এবং অনুমাননির্ভর যুক্তি দিয়ে রচিত, মিজানুর রহমান খান সেগুলোর ওপর নির্ভর না করে মার্কিন মহাফেজখানা থেকে অবমুক্ত করা কূটনৈতিক ও গোয়েন্দা প্রতিবেদনের আলোকে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের সামরিক ক্যু-এর কুশীলব এবং এ নিয়ে তৎকালীন পরাশক্তি ও দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক রাষ্ট্রসমূহের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করেছেন। অবমুক্ত দলিল থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা ও যথার্থতা নিরূপণে লেখককে যথেষ্ট সচেতন মনে হয়েছে। সে ক্ষেত্রে তিনি প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য, বিবরণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে যাঁরা লিখেছেন কিংবা অবগত আছেন তাঁদের শরণাপন্ন হয়েছেন। বইটিকে তথ্যনির্ভর ও বস্তুনিষ্ঠ করতে লেখকের যে প্রচেষ্টা, তার একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো অনেক প্রসঙ্গের অহেতুক পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, যা তাঁর লেখার ধরন ও প্রাঞ্জলতাকে প্রায়শই ব্যাহত করেছে।

আলোচ্য বইটিতে ভূমিকা ও উপসংহারসহ মোট ১৫টি ছোট অধ্যায় রয়েছে। এ ছাড়া এতে ছয়টি তথ্যবহুল পরিশিষ্ট সংযুক্ত করা হয়েছে। মুজিব হত্যাকাণ্ডের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক তৎকালীন পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং দক্ষিণ এশিয়ার দুই আঞ্চলিক শক্তি ভারত ও পাকিস্তানের বাংলাদেশ নীতি আলোচনা করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে আওয়ামী লীগের নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সামরিক কর্মকর্তা সৈয়দ ফারুক রহমান ও খন্দকার আবদুর রশিদ মুজিববিরোধী সামরিক ক্যু-এর নেতৃত্ব দিলেও মিজানুর রহমান খানের অনুসন্ধানের প্রধান লক্ষ্য স্পষ্ট। তিনি জানতে চেষ্টা করেছেন মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্রের পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ বা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সম্পৃক্ততা ছিল কি না। মুজিব হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরই ভারতীয় গণমাধ্যম ও বামপন্থী দলগুলো মার্কিন সংশ্লিষ্টতা নিয়ে সন্দেহের তির ছুড়ে দেয়। তাদের দাবি, ঢাকায় সিআইএ স্টেশন-প্রধান ফিলিপ চেরি বাংলাদেশের উর্ধ্বতন বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাদের নিয়ে মুজিব সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেহেতু রিচার্ড নিক্সনের নেতৃত্বাধীন মার্কিন সরকার শুরু থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করে আসছিল এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার মার্কিন মিত্র রাষ্ট্র (পশ্চিম) পাকিস্তানের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, সেহেতু মুজিব

হত্যায় সিআইএ-এর সংশ্লিষ্টতা নিয়ে অনেকের মধ্যেই প্রশ্নের উদ্রেক ঘটেছে বলে লেখক মনে করেন।

আলোচ্য বইটি আমাদের স্নায়ুযুদ্ধকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতির কথা মনে করিয়ে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ১৯৯০-এ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সময় পর্যন্ত প্রায় পাঁচ দশক স্থায়ী দ্বিমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার নেতৃত্বে একদিকে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন। দুই পরাশক্তি তখন বিশ্বকে দুটো মতাদর্শগত জোটে বিভক্ত করেছিল—যার একটি যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের জোট, আর অন্যটি সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের জোট। বিশ্বব্যাপী তাদের ভূরাজনৈতিক প্রভাববজায় রাখার জন্য উভয় পরাশক্তিই অস্ত্র-বাণিজ্য, কূটনৈতিক চুক্তি, সামরিক জোট এবং বৈদেশিক সাহায্যসহ নানান ধরনের কৌশল অবলম্বন করে। যদিও ভারত, চীন, পাকিস্তানসহ এশিয়া ও আফ্রিকার নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ একটি তৃতীয় জোট বা জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। এরই ফলে ভারত ও পাকিস্তান যথাক্রমে সোভিয়েত ও মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের প্রভাব বলয়ে প্রবেশ করে। প্রসঙ্গত, পাকিস্তানের মার্কিন প্রভাবাধীন সেনটো (সেন্ট্রাল ট্রিয়েটি অর্গানাইজেশন) ও সিয়াটোয় (সাউথ ইস্ট এশিয়া ট্রিয়েটি অর্গানাইজেশন) অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করা যায়। অন্যদিকে, ভারত-সোভিয়েত শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তির কথা বলা যায়। বিশ্বরাজনীতিতে ভারত ও পাকিস্তানের এ বিপরীতমুখী জোটবদ্ধ হওয়ার কোনো প্রভাব কি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর পড়েছিল, এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে—অবশ্যই হ্যাঁ। লেখকের বর্ণনায় বিষয়টি স্পষ্টতই ফুটে উঠেছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচণ্ড বিরোধিতা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা ও সমর্থনের মধ্যেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ চলছিল।

মার্কিন দলিলে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সাংবাদিক মিজানুর রহমান খান বর্ণনা করেন যে হেনরি কিসিঞ্জার এবং নিক্সন প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা পাকিস্তানের ভাঙন রোধের জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং এমনকি ভারত মহাসাগরে মার্কিন সপ্তম নৌবহর ও যুদ্ধজাহাজ মোতায়েনের হুমকি দেন, তার মূল লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত প্রভাব প্রতিহত করা। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পর বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে ২৫ বছরের এক মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং এর সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত-নিয়ন্ত্রিত জোটে এর পরোক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দুর্নীতি ও দারিদ্র্য হ্রাস এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের পাশাপাশি দলের মধ্যকার মার্কিনপন্থী বনাম সোভিয়েতপন্থী নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করতে হয়। অস্বাভাবিক দুর্নীতি, অবনতিশীল আইনশৃঙ্খলা, স্বজনপ্রীতি বন্ধে শেখ মুজিব যখন চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হন এবং সোভিয়েত আদলে বাকশাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে একদলীয় ও কর্তৃত্বপরায়ণ শাসনব্যবস্থার সূচনা করেন, তা দেশকে এক গভীর রাজনৈতিক সংকটে ফেলে দেয়। এছাড়া অভ্যন্তরীণ ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে অন্য যে বিষয়গুলো শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তা হলো দেশি-বিদেশি চক্রান্ত।

মজার বিষয় হলো, যদিও লেখক ঘুরেফিরে মুজিব হত্যায় মার্কিন সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি অনুসন্ধানে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছেন, আলোচ্য বইটিতে তিনি স্বতন্ত্রভাবে এমন কোনো তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছেন, যাতে মার্কিন সরকার কিংবা এর গোয়েন্দা বাহিনী সিআইএ-এর সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হয়। অবমুক্ত করা মার্কিন দলিলে যদিও প্রমাণ মেলে যে মুজিব হত্যার প্রধান পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে ফারুক ও রশিদ ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে একাধিক বৈঠক করেছেন, যার উদ্দেশ্য ছিল সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র ক্রয়, তথাপি অবমুক্ত দলিলে এর বেশি কিছু নেই অথবা লেখক খুঁজে পাননি যাতে মুজিব হত্যায় মার্কিন সরকারের ষড়যন্ত্র কিংবা ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণের পক্ষে কোনো অকাট্য প্রমাণাদি পাওয়া যায়। এ রকম অকাট্য প্রমাণাদির অনুপস্থিতিতে যে বিষয়টি অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে, তা হলো মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলৎজের লেখা ও বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি। লিফশুলৎজ ছাড়া অন্য যেসব লেখক ও গবেষকের বিশ্লেষণকে অবলম্বন করে মিজানুর রহমান খান মুজিব হত্যায় মার্কিন সংশ্লিষ্টতার ইঙ্গিত প্রদান করেন, তাদের মধ্যে অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস, মতিউর রহমান ও ক্রিস্টোফার হিচেন্সের নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া আর যে প্রখ্যাত অনুসন্ধানী সাংবাদিকের নাম উল্লেখযোগ্য, তিনি হচ্ছেন সৈইমুর হার্শ, যাঁর লেখায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে মার্কিন প্রভাব বিস্তারে সিআইএ-এর গোপন কার্যকলাপের প্রমাণ ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।

মুজিব হত্যায় মার্কিন সংশ্লিষ্টতা ও সম্পৃক্ততার বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু মুজিব হত্যাকে কি গোয়েন্দা ব্যর্থতা বলা যাবে? দেশি-বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কি মুজিবের প্রাণনাশের হুমকিসম্পর্কিত কোনো আগাম সতর্কতা জারি করেছিল? কিংবা সেনা অভ্যুত্থানের বিষয়ে কোনো পূর্বাভাস কি ছিল? থাকলে মুজিব আত্মরক্ষায় এবং তাঁর শাসনব্যবস্থা রক্ষায় কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন কি? গোয়েন্দা ব্যর্থতাসম্পর্কিত এই প্রশ্নসমূহের উত্তরে মিজানুর রহমানের বিশ্লেষণ খুবই পরিষ্কার। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতের

প্রধান বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইংয়ের (RAW) প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক রামেশ্বর নাথ কাওয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক উল্লেখ করেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের আগে শেখ মুজিবকে তাঁর ঘনিষ্ঠ মিত্র ভারত অন্তত দুবার—প্রথমে ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে এবং পরে ১৯৭৫ সালের মার্চে—সরকারবিরোধী সামরিক অভ্যুত্থানের বিষয়ে আগাম সতর্ক করে দেয়।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার পূর্ব সতর্কতামূলক (early warning) প্রতিবেদন ছাড়াও শেখ মুজিবের পররাষ্ট্রসচিব ফখরুদ্দিন দাবি করেন যে সুইডেনে প্রকাশিত এক রিপোর্টের আলোকে তিনি শেখ মুজিবকে সেনাবাহিনীর মধ্যকার ব্যাপক অসন্তোষ ও সম্ভাব্য ক্যু-এর বিষয়ে অবহিত করেন। এ ছাড়া সশস্ত্র বাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ব্রিগেডিয়ার রউফ এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেন যে কর্নেল ফারুক রহমানের নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনীর ট্যাংক রেজিমেন্ট যে একটি সম্ভাব্য শোডাউন বা শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করতে পারে, সে ব্যাপারে তিনি মুজিবকে সতর্ক করে দিয়েছেন। এমনকি তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহও রাষ্ট্রপতি মুজিবকে সম্ভাব্য সামরিক অভ্যুত্থানের বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন। মিজানুর রহমানের লেখায় এ বিষয়টি স্পষ্ট যে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী আইনশৃঙ্খলা রক্ষায়, চোরাচালান দমনে ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষায় সেনাবাহিনীর আস্থা অর্জনে মুজিব ব্যর্থ হয়েছেন। তদুপরি রক্ষীবাহিনী নামে ভারতের সহায়তায় একটি নতুন প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠন এবং সেনাবাহিনীর আধুনিকায়ন উপেক্ষা করে রক্ষীবাহিনীর সম্প্রসারণের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ পুঞ্জীভূত ছিল।

সেনাবাহিনীর মধ্যকার চরম অসন্তোষ এবং অভ্যুত্থানচেষ্টার বিষয়টি জানা সত্ত্বেও মুজিব কেন কোনো ব্যবস্থা নেননি? কেন তাঁর জীবননাশের এবং তাঁর সরকারবিরোধী হুমকিসম্পর্কিত আগাম সতর্কতার রিপোর্টগুলোকে মুজিব অগ্রাহ্য করেছিলেন? আলোচ্য গ্রন্থে লেখক এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর প্রদান করেননি। বরং এখানে মুজিবকে একজন উদার মনের মানুষ হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে, যিনি কখনোই চিন্তা করতে পারেননি যে তাঁর দেশের জনগণ তাঁকে হত্যা করতে পারে।

মুজিব হত্যায় সিআইএ-এর সম্পৃক্ততার বিষয়টি আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান অনুসন্ধানী লক্ষ্য হলেও লেখক মুজিব হত্যাপরবর্তী ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াকে সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। অবমুক্ত করা কূটনৈতিক যোগাযোগ থেকে জানা যায় যে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ক্যু-এর পর ভারত তার সীমান্তরক্ষীদের সতর্ক অবস্থানে থাকার নির্দেশ দেয় এবং মুসলিমপ্রধান বাংলাদেশে যেন সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর কোনো অত্যাচার বা নিপীড়ন না হয়, সে বিষয়ে সজাগ ছিল। অন্যদিকে, মুজিব হত্যায় পাকিস্তান তার সন্তুষ্টি গোপন রাখতে

পারেনি এবং শিগগিরই খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং বাংলাদেশ যেন একটি ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় সে আশা পোষণ করে।

আলোচ্য গ্রন্থের যে বিষয়টি ধাঁধার মতো মনে হয় তা হলো, এতে মুজিব হত্যায় বহিঃরাষ্ট্রের ব্যক্তিরা ও সংস্থার সম্পৃক্ততার বিষয়টি যতটা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যক্তির ও সংস্থার সম্ভাব্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি ততটাই উপেক্ষিত হয়েছে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিদের মধ্যে মুজিব হত্যার পরিকল্পনাকারী হিসেবে সেনাবাহিনীর জুনিয়র অফিসারদের মধ্যে মেজর ফারুক রহমান ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী মেজর আবদুর রশিদের কথা উল্লেখ আছে খুব সামান্যই। অবমুক্ত করা মার্কিন দলিলের আলোকে যদিও দেখা যায় যে ফারুক ও রশিদ শেখ মুজিবকে হত্যার আগে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে কমপক্ষে দুবার অনির্ধারিত বৈঠক করেছেন, যে বিষয়টি অস্পষ্ট রয়ে গেছে তা হলো সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। সেনাপ্রধান কিংবা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব কি ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে জুনিয়র সামরিক অফিসারদের এসব অনির্ধারিত বৈঠক সম্পর্কে অবহিত ছিলেন? যদি ফারুক-রশিদের এসব সন্দেহজনক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত থাকতেন মুজিব, তাহলে কী প্রতিক্রিয়া দেখাতেন?

সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণে এটা প্রতীয়মান হয় যে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছিল। মুজিব হত্যায় সেনাসদস্যের অংশগ্রহণ সশস্ত্র বাহিনীর পেশাদারি রক্ষার ক্ষেত্রে একটি হুমকি হিসেবেই বিবেচিত হবে। যদিও মুজিব হত্যা-পরবর্তী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে বেশ কয়েকটি ক্যু এবং পাল্টা ক্যু সংঘটিত হয়, আলোচ্য গ্রন্থের একটি বড় সীমাবদ্ধতা হলো এই বিষয়টিকে গুরুত্ব না দেওয়া। এ ছাড়া মুজিবের নিরাপত্তা রক্ষায় সেনাপ্রধান সফিউল্লাহর এবং অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তার ভূমিকার বিষয়টি ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত এই গ্রন্থে। যদিও তৎকালীন উপসেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে মুজিব হত্যা-পরবর্তী রাজনীতির প্রধান 'সুবিধা গ্রহণকারী' (beneficiary) হিসেবে উল্লেখ করা হয় আলোচনা গ্রন্থে। এ প্রসঙ্গে কোনো ব্যাখ্যা নেই যে জিয়া কি মুজিববিরোধী ক্যুকে প্রত্যক্ষ মদদ দিয়েছেন, না পরোক্ষভাবে সমর্থন করেছেন? মুজিব হত্যায় সশস্ত্র বাহিনীর তৎকালীন হাইকমান্ডের ভূমিকা নিয়ে যে তথ্যশূন্যতা আলোচ্য গ্রন্থে ফুটে উঠেছে, তা কি অবমুক্ত করা দলিলে প্রাপ্ত তথ্যের অভাবে হয়েছে, নাকি লেখক এ বিষয়ে কোনো বিতর্কে জড়াতে চান না বলে তা আলোচনা করেননি?

শেষ কথা

কিছু তথ্যশূন্যতা ও তথ্য পুনরাবৃত্তির মতো ছোটখাটো সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁদের জন্য *মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড* একটি মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে। আলোচ্য গ্রন্থের ছোট অধ্যায়, ঘটনাপ্রবাহের সুলিখিত বিবরণ ও বিশ্লেষণ স্বাধীন বাংলাদেশের এক তুলনামূলকভাবে উপেক্ষিত ঘটনা তথা মুজিব হত্যা ও ১৯৭৫ সালের সামরিক অভ্যুত্থান সম্পর্কে অনেক আগ্রহ উদ্রেক করবে। এ ছাড়া এই বইয়ে যে ছয়টি পরিশিষ্ট আছে, তা গবেষকদের জন্য এক স্বর্ণখনি বলে বিবেচিত হবে। পরিশিষ্ট অংশে মুজিব হত্যার অন্যতম পরিকল্পনাকারী মেজর ফারুক রহমান, সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলৎজ এবং সাবেক মার্কিন কূটনীতিবিদ ইউজিন বোস্টার ও সিডনি সোবারের সঙ্গে যেসব সাক্ষাৎকারে উদ্ধৃতাংশ ছাপা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে মুজিব হত্যাকাণ্ডের পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুধাবন ও বিশ্লেষণে সহায়ক হবে। পরিশেষে বলা যায়, *মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড* ইতিহাসবিদদের অবশ্যই উৎসাহিত করবে, যাতে তাঁরা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সেনা অভ্যুত্থান এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত দেশি-বিদেশি কুশীলবদের ভূমিকা নিয়ে তথ্যানুগ অনুসন্ধানে আগ্রহী হন।

বইআলোচনা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : ভূ-রাজনীতি ও বিস্মৃত গণহত্যা

খলিলউল্লাহ্

দ্য ব্লাড টেলিগ্রাম : নিক্সন, কিসিঞ্জার অ্যান্ড দ্য ফরগটেন জেনোসাইড—গ্যারি জে বাস, নিউ ইয়র্ক : আলফ্রেড এ. নুফ, ২০১৩।

পটভূমি

আলোচিত বইটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্নায়ুযুদ্ধকেন্দ্রিক বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের ধরন এবং অন্যান্য বৃহৎ শক্তির ওপর এর প্রভাব নিয়ে তথ্যবহুল একটি উপস্থাপনা। বর্তমানে ভারতীয় কূটনীতিককে 'অপদস্থ' করার কূটনৈতিক টানাপোড়েন বাদ দিলে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র যেকোনো সময়ের চেয়ে ভালো সম্পর্ক পার করছিল। ২০০৭ সালে তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিষয়ে আন্ডার সেক্রেটারি নিকোলাস বার্নস ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ে আশাবাদী মন্তব্য করেছিলেন :

The rise of a democratic and increasingly powerful India is a positive development for U.S. interests. Rarely has the United States shared so many interests and values with a growing power as we do today with India. By reaching out to India, we have made the bet that the future lies in pluralism, democracy, and market economics.[১]

যদিও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সে সময়েই ব্যাপারটি অনুধাবন করে নিক্সনকে ভারতের প্রতি মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সে পথে হেঁটেছে অনেক পরে। বর্তমান বাস্তবতায় চীনকে 'ঠেকাতে' ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র হয়ে উঠেছে অন্যতম মিত্র। কিন্তু ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় এই মিত্রতাও বেশি দিন টিকে থাকা সম্ভব নয়। ভারত তার অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির

সঙ্গে সঙ্গে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে যখন বহির্মুখী সম্প্রসারণ ঘটাতে চাইবে, তখন এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব বাধতে বাধ্য। ইতিমধ্যে ভারতের বিদেশবিষয়ক (পূর্বাঞ্চলীয়) মন্ত্রণালয়ের সচিব শ্রীঅনিল ভাদভা দক্ষিণ চীন সাগরে আরও মনোযোগী হওয়ার ঘোষণা দিয়ে সেই ইঙ্গিতই দিয়ে রাখছেন।[২] মোদ্দা কথা, পুতুল রাষ্ট্র ছাড়া সব দেশ তাঁদের জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করে এবং শত্রু-মিত্র বাছাই করে, যা স্বার্থ হাসিল না হওয়া পর্যন্ত টিকিয়ে রাখে। যত দিন অন্য কোনো পক্ষের আঘাতের সম্ভাবনা থাকে, তত দিন তা টিকিয়ে রাখাই একমাত্র নীতি।

এই বাস্তবতায় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর গ্যারি জে বাসের *দ্য ব্লাড টেলিগ্রাম: নিক্সন, কিসিঞ্জার অ্যান্ড দ্য ফরগটেন জেনোসাইড* গ্রন্থটি সে সময়ের ঘটনা জানার ক্ষেত্রে এবং যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্ক বিশ্লেষণে অসাধারণ ভূমিকা রাখবে। এর পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের ভূমিকা এবং এদের সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক উঠে এসেছে। হোয়াইট হাউসে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ও তাঁর নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারের মধ্যকার কথোপকথনের অডিও টেপ, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে সাম্প্রতিক প্রকাশিত গোপন দলিলপত্র এবং সে সময়ে যেসব মার্কিন ও ভারতীয় নাগরিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে এই বইটি লেখা হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য বইপত্র ও মাধ্যম ব্যবহৃত হয়েছে।

১৯৭১ সালে স্নায়ুযুদ্ধকালীন দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পাশ্চাত্য তত্ত্বের মোহভঙ্গ ঘটিয়েছিল সাময়িকভাবে হলেও। উদারনীতিবাদের অন্যতম রাজনৈতিক আবিষ্কার হলো গণতান্ত্রিক শান্তি তত্ত্ব (democratic peace theory)। এর মূল কথা হলো, গণতান্ত্রিক দেশগুলো কখনো একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় না। কিন্তু ১৯৭১ সালে বিশ্বের দুই বড় গণতন্ত্র ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক বিচ্যুতি ছিল গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করে সামরিক স্বৈরশাসক ইয়াহিয়ার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার অপচেষ্টাকে প্রাণপণ সমর্থন দেওয়া।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যে স্নায়ুযুদ্ধের আদর্শভিত্তিক প্রচারণার অংশ ছিল না, তা যুক্তরাষ্ট্রের সে সময়ের নীতিতে পরিলক্ষিত হয়। যদিও স্বাধীন হলে বাংলাদেশ সোভিয়েত অক্ষে ঢুকে যাবে বলে ভীতি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের, কিন্তু আদর্শগতভাবে গণতন্ত্রকে সমর্থন তারা করেনি। বিশ্ব যখন পুঁজিবাদী উদার গণতান্ত্রিক অংশ ও সাম্যবাদী অগণতান্ত্রিক অংশে বিভক্ত এবং যাবতীয় নীতি-রাজনীতি ও অন্যায়-

অনাচার এই আদর্শিক লড়াই দিয়ে জায়েজ করা হচ্ছিল, তখন বাঙালিদের গণতান্ত্রিক অধিকার ভূলুণ্ঠিত করে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক নিরস্ত্র মানুষ হত্যা ও ধর্ষণের রাজনীতিকে সমর্থন দেওয়া এবং অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করা যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগত বড় রকমের স্খলন নিঃসন্দেহে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভূ-রাজনীতিই ছিল নীতিনির্ধারণে সবচেয়ে বড় নিয়ামক। আদর্শিক বা মানবিক দিকগুলো কোনো ভূমিকাই রাখেনি। চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের আঁতাত আদর্শিক দিকে ভ্রুক্ষেপ না করার একটি অনন্য উদাহরণ। গণতান্ত্রিক ভারতকে সমর্থন না দিয়ে পাকিস্তানের পৈশাচিক সামরিক সরকারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ সমর্থন এবং তা রক্ষার্থে সব ধরনের নৃশংসতাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া তার সাক্ষ্য বহন করে। বাংলাদেশের জনগণের ওপর মানবেতিহাসের অন্যতম বর্বরোচিত হামলা হোয়াইট হাউসের কর্ণধারদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল।

পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মূল্যবোধ এবং পররাষ্ট্রনীতিরও অংশ। তা সত্ত্বেও গণতন্ত্র ধূলিসাৎ করার অপচেষ্টায় সহায়তা করে যুক্তরাষ্ট্র তার পররাষ্ট্রনীতির দ্বৈত নীতিকে প্রমাণ করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই নিজের সুবিধামতো স্বৈরাচারী শাসককে ক্ষমতায় বসতে সাহায্য করেছে অথবা গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করেছে। আবার যেখানে প্রয়োজন হয়েছে সেখানে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে হস্তক্ষেপ করেছে। সবকিছু তার স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। এই তালিকা বেশ বড়। ঠিক এ জন্যই সাম্প্রতিক সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের গণতন্ত্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের মায়াকান্না দেখলে যে কারও সন্দেহ হওয়াটাই স্বাভাবিক। বর্তমানে সিরিয়ায় একই ধরনের ঘটনায় আসাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে ফিরে এসেছে। মধ্যপ্রাচ্যে বাছাইকৃত দেশগুলোতে গণতন্ত্রের কথা বললেও সৌদি আরবের মতো বড় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কখনো এতটুকুও উচ্চবাচ্য করেনি যুক্তরাষ্ট্র।

ইয়াহিয়াকে অকুণ্ঠ সমর্থন দেওয়ার পেছনে প্রেসিডেন্ট নিক্সন প্রধান কারণ হিসেবে চীনের সঙ্গে আঁতাত করার যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। ইয়াহিয়ার মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার চীনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন, যা কূটনীতিবিদ্যায় 'ব্যাক চ্যানেল ডিপ্লোমেসি' নামে খ্যাত। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঠেকাতে চীনকে পাশে পাওয়া ছিল যুক্তরাষ্ট্রের জন্য পরম বিজয়ী ঘটনা। এখানে দেখা যায়, কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন আর চীনের মধ্যেও আদর্শের কোনো মূল্য দেওয়া হয়নি। জাতীয় স্বার্থ আর সে সময়কার ভূ-রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশই এসব সিদ্ধান্তের নিয়ামক ছিল। যে কারণে চীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা করে। ভারতের সঙ্গে

১৯৬২ সালের সীমান্ত যুদ্ধের রেশ তো ছিলই। ১৯৭১ সালের ৬ জুলাই কিসিঞ্জার দিল্লিতে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করে এসেছিল যে ভারতের বিরুদ্ধে চীনের যেকোনো ধরনের পদক্ষেপে যুক্তরাষ্ট্র সাড়া দেবে না। কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ বাধার পর তিনিই চীনকে ভারত সীমান্তে সেনা মোতায়েনের জন্য চাপ দেন। কিন্তু চীন বাস্তবতা বিবেচনা করেই সেই প্ররোচনায় সাড়া দেয়নি। অবশ্য ভারত চীনের দিক থেকে আক্রমণের ব্যাপারটি মাথায় রেখেই তার সামরিক অভিযান শীতকালে পরিচালনা করে। সুতরাং, তাত্ত্বিকভাবে যুদ্ধের অনিশ্চয়তা বা কুয়াশা (ফগ অব ওয়্যার)[৩] থাকার পাশাপাশি আবহাওয়ার দিক দিয়েও হিমালয়ের তুষারপাতের কারণে চীনের জন্য ব্যাপারটি কঠিন হয়ে পড়ে।

ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করলেও দীর্ঘস্থায়ী নীতি গ্রহণে যুক্তরাষ্ট্র ব্যর্থ হয়েছিল। বিশাল ভূখণ্ডের অধিকারী ভারতকে তারা কাছে টানার চেষ্টা করতে পারত। এমনকি দিল্লিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিং যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে ভারতের প্রতি ঝোঁকা। কিন্তু ইয়াহিয়ার সঙ্গে নিক্সনের ব্যক্তিগত 'বন্ধুত্বের' কারণে তিনি অন্ধভাবে পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়ে গেছেন। চীনের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে পারাটা কিসিঞ্জারের একটি বড় কূটনৈতিক সাফল্য নিঃসন্দেহে, কিন্তু তার মানবিক মূল্য দিতে হয়েছিল বাংলাদেশের জনগণকে।

যুক্তরাষ্ট্র প্রথম দিকে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকলেও শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষার্থেই মনোনিবেশ করে। তাদের ধারণা ছিল, ভারত এই সুযোগে পাকিস্তান দখল করে দক্ষিণ এশিয়ায় একক প্রভাববলয় তৈরি করবে। যা-ই হোক, তাদের সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। অবশ্য ইন্দিরা গান্ধী ভেবেছিলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বেলুচিস্তানসহ অন্য অংশগুলোতেও বিদ্রোহ শুরু হবে এবং এভাবে পাকিস্তান ভেঙে যাবে। তাই পাকিস্তান দখলের চেষ্টা করে 'আগ্রাসী' অপবাদ নিতে চাননি।

বইজুড়ে নিক্সন-কিসিঞ্জার যেসব বীভৎস ভাষায় ভারতীয়, বাঙালি এবং বিশেষ করে ইন্দিরা গান্ধীকে গালিগালাজ করেছেন, তার হুবহু বর্ণনা রয়েছে। উনিশটি অধ্যায়ে মুখবন্ধসহ মোট ৫২৪ পৃষ্ঠা রয়েছে বইয়ে। বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে দেখার চেষ্টা করায় এই বইয়ে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বেশ কয়েকবার। যে জন্য ঘটনার সময়ানুসারে বর্ণনা করা সম্ভব হয়নি। পুরো বইটি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বড় ধরনের ব্যর্থতার স্বাক্ষর বহন করে এবং মার্কিন কূটনীতিকদের দেশের পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর অনবদ্য বর্ণনা বলা যায়। অবশ্য এতে করে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির শিক্ষণীয় দিক কী হতে পারত বা পরবর্তী সময়ে কী ধরনের ভূমিকা রেখেছিল, তার কোনো বিশ্লেষণ এখানে নেই। এখন পর্যন্ত

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণ দলিল-দস্তাবেজ গবেষকেরা দেখতে পারেন না। কিসিঞ্জারের ব্যক্তিগত অনুরোধের কারণে লাইব্রেরি অব কংগ্রেস সেসব গুরুত্বপূর্ণ দলিল কাউকে দেখার অনুমতি দেয় না। গ্যারি বাস অনেকবার চেষ্টা করেও কিসিঞ্জারের সাক্ষাৎকার নিতে পারেননি।

১.

মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র তার পাকিস্তান নীতির ব্যাপারে স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকেই বাধার সম্মুখীন হয়। দিল্লির রাষ্ট্রদূত, ঢাকার কনসাল জেনারেল, ওয়াশিংটন ও পশ্চিম পাকিস্তানেরও মধ্যম সারির কূটনীতিকেরা যুক্তরাষ্ট্রের নীতির বিরোধিতা করে। পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড ও দিল্লিতে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিংকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করে নিক্সন প্রশাসন।

বইটিতে একটি ব্যাপার লক্ষণীয়, বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের এককভাবে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। একটি অধ্যায় রয়েছে মুক্তিবাহিনীর ওপর। কিন্তু সেখানে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনায় কীভাবে ভারতীয় সাহায্য-সহায়তা কাজে দিয়েছিল, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে। মূলত ভারতের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে পাকিস্তান ভেঙে দেওয়ার যে অভিযোগ উঠেছিল এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারত কীভাবে সেসব অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করেছে, তার একটা বিশ্লেষণ এই অধ্যায়। ভারতের সহযোগিতা নিঃসন্দেহে ছিল। কিন্তু এতে করে মুক্তিবাহিনীর নিজস্ব ভূমিকা কোনোভাবেই ম্লান হয় না। সাধারণ বাঙালিরা যুদ্ধে আনাড়ি হওয়া সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানের আধুনিক একটা সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এই ধরনের একটি বইয়ে মুক্তিবাহিনী আরও বিস্তৃত প্রশংসার দাবি রাখে। জিল্লুর রহমান খান তাঁর *দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড ক্যারিশমাট : শেখ মুজিব অ্যান্ড দ্য স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম* গ্রন্থে মুক্তিবাহিনীর সাহসিকতা, নৈপুণ্য ও আক্রমণের তীব্রতার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

> By July 1971, the Bengali liberation forces became more organized and trained, and they could now carry out guerilla operations against the Pakistani army from within as well as without…During the 1971 monsoon, a tremendous increase in guerilla operation in different areas of Bangladesh made the Pakistani forces react negatively…In short, the increased insurgency of the Bangladesh regular forces and the freedom fighters angered the Pakistani army so much so that they took recourse to the scorched-earth policy to wipe out the last strongholds of resistance in Bangladesh and, in the process, they only succeeded in alienating more people.[৪]

এ ছাড়া কুলদীপ নায়ার তাঁর আত্মজীবনী *বিয়ন্ড দ্য লাইনস*-এ বলেন যে ভারতের সহায়তার তুলনায় বাংলাদেশের জনগণ ও মুক্তিবাহিনীর ভূমিকাই ছিল মুখ্য :

> In comparison to India's contribution, the role of the people of Bangladesh and the Mukti Bahini was greater. I have no doubt that they would have won their independence on their own…The Bangladeshis would have found it difficult without India's support and it would have taken them somewhat longer but their determination and capacity to suffer should never be underestimated.[৫]

এসব যুক্তির মানে এই নয় যে মুক্তিবাহিনীর ভূমিকার মূল্যায়নের জন্য কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব নিতে বলা হচ্ছে। মাঝামাঝি একটা অবস্থানে থেকে বা অ্যারিস্টটলের 'গোল্ডেন মিন'[৬] অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা সম্ভব, যেটা বাংলাদেশের বা পাকিস্তানের কোনো লেখকের পক্ষে কঠিন হতে পারে।

যেখানে ভারত নভেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধে জড়াতে রাজি নয়, সেখানে এই পুরো সময়টা পাকিস্তানিদের আধুনিক মারণাস্ত্র মোকাবিলা করাটা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের অসামান্য কৃতিত্ব। সেটি লেখক তেমন তুলে আনেননি। উনি ভারতের সাহায্য-সহযোগিতা কী দেওয়া হয়েছিল, সেটা নিয়ে আবিষ্ট ছিলেন। ধীরে ধীরে মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিরও সৃষ্টি হয়। এর কারণ ছিল ভারত যেসব সামরিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা বাস্তবায়ন করছিল না। এমনকি ভারতের অভ্যন্তরেই 'ধীরে চলা' নীতির তীব্র সমালোচনা হচ্ছিল এবং ইয়াহিয়া হত্যাযজ্ঞ শুরু করার আগেই কেন ভারত ব্যবস্থা নিল না, সে ব্যাপারেও সমালোচনা এসেছিল। এমনকি, হিন্দু ডানপন্থী জনসংঘ পাকিস্তানের মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দু যুদ্ধ শুরু করার দাবি জানায়।

আরেকটি ব্যাপার হলো, লেখক শিশুদের মুক্তিবাহিনীতে যোগদানে আপত্তি করতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। কিন্তু এটা নিয়মিত যুদ্ধ ছিল না। আর অসম যুদ্ধে এমন হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

২.

নিক্সন ভারতকে পছন্দ করতেন না বেশ কিছু কারণে, যার তথ্য-উপাত্ত এখানে পাওয়া যায়। হেনরি কিসিঞ্জার ছিলেন নিক্সনের প্রধান পরামর্শক, নিরাপত্তা উপদেষ্টা। তিনিই নিক্সনের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রভাবশালী ভূমিকা রেখেছিলেন। কিসিঞ্জার বাস্তবভিত্তিক ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির (realpolitik) ব্যাপারে ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নীতি-নৈতিকতা বা মানবিক মূল্যবোধের স্থান তাঁর রাজনৈতিক আদর্শে খুব কমই দেখা গেছে। স্নায়ুযুদ্ধকেন্দ্রিক বিশ্ব রাজনীতিতে

কিসিঞ্জার তাঁর দুই নায়ক মেটারনিখ ও ক্যাস্টলারেঘের মতো ক্ষমতার ভারসাম্য ও বৃহৎ শক্তির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। তিনি মনে করতেন, কোনো নীতি সঠিক কি বেঠিক, তা নির্ধারিত হবে নিজ দেশের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা দ্বারা। *অ্যা ওয়ার্ল্ড রেস্টোরড* গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেন, 'A nation will evaluate a policy in terms of its domestic legitimization, because it has no other standard of judgement.'[৭] অন্যভাবে যার অর্থ দাঁড়ায়, নিজ দেশের স্বার্থই শেষ কথা। স্বাভাবিকভাবেই নিজ দেশের স্বার্থে অন্যায় করলে সেটার বৈধতা পেতে সমস্যা হয় না। সুতরাং, কোনো নীতি বাস্তবায়নে অন্য দেশে মানবতা লঙ্ঘিত হলো কি হলো না, সেটা ভাবনার বিষয় হতে পারে না।

কিসিঞ্জারকে আমলাতন্ত্রের সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম করতে হয়েছে। তিনি মোটেও আমলাতন্ত্রকে পছন্দ করতেন না। পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের পর তিনিই ছিলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি এবং এই সুবাদে আমলাতন্ত্রকে পাশ কাটিয়েই তিনি পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর কাছে ভারত-পাকিস্তান তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এই বইয়ের লেখক মন্তব্য করেছেন, কিসিঞ্জার দক্ষিণ এশিয়ার চেয়ে মেটারনিখের অস্ট্রিয়া সম্পর্কে অনেক বেশি জানতেন। তা ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কিসিঞ্জারের মূল লক্ষ্য ছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধ এবং চীনের সঙ্গে সম্পর্ক শুরু করা।

বাংলাদেশ ইস্যুতে ভারতের প্রতি নিক্সনের ব্যক্তিগত আক্রোশ যেমন বড় ভূমিকা রেখেছে, তেমনি ভারতের জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নামে সোভিয়েতপ্রীতি ঘিয়ে আগুন দিয়েছে। কিসিঞ্জার নিক্সনের তুলনায় কম ভারতবিদ্বেষী হলেও তাঁরা দুজনেই চিরাচরিত লিঙ্গ ভেদাভেদ টেনে এনেছেন। ইয়াহিয়া সম্পর্কে তাঁরা বলেন, 'He was a man's man. He wasn't some women running a country' (পৃষ্ঠা ২)। এর মাধ্যমে ইন্দিরাকে নারী বলে খাটো করার মানসিকতাও ফুটে ওঠে।

পাকিস্তান নীতির পেছনে নিক্সনের বড় প্রণোদনা ছিল চীনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন—কথাটি সত্য নয়। এই বইয়ে দেখা যায়, নিক্সন প্রশাসন ফ্রান্স, রোমানিয়া ও পোল্যান্ডের মাধ্যমেও চীনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছিল। কিসিঞ্জার রোমানিয়ার বর্বর স্বৈরশাসক নিকোল চসেস্কুর কাছেও এ ব্যাপারে সহযোগিতা চান। ইয়াহিয়া অত্যুৎসাহী হয়ে চীনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করে। রোমানিয়াও এই ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়েছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকেই গুরুত্ব দেয়। এ ব্যাপারে উইনস্টন লর্ড, কিসিঞ্জারের বিশেষ সহকারী এবং পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী (ক্লিনটন প্রশাসন) মনে করেন, পাকিস্তানপ্রীতি ছিল সম্পূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক হিসাব। 'It was geopolitical. Indians on the Russian team, so we'll put Pakistan on our

team. To say we tilted toward Pakistan because of the opening to China is an oversimplification. We might have done that anyway' পৃষ্ঠা ১০৯।

কংগ্রেস, স্টেট ডিপার্টমেন্ট, মিডিয়া, জনমত—সবকিছু উপেক্ষা করে নিক্সন-কিসিঞ্জারের স্বৈরাচারী নীতি-কৌশল বিশ্লেষণে ব্যক্তিক পর্যায়ের বিশ্লেষণ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত অহমও অনেকাংশে ভূমিকা রেখেছে। বার্টন মনে করেন, 'Self-esteem is a deep instinctual need that is an integral part of being human and cannot be compromised or denied without a fierce struggle.'[৮] যে জন্য শেষ পর্যন্ত ইয়াহিয়াকে গুরুত্ব দিয়ে যান নিক্সন। তা না হলে তাঁর নিজের নীতি ব্যর্থ হবে বলেই তিনি এমনভাবে ইয়াহিয়াকে আঁকড়ে ছিলেন।

ঘরে-বাইরে পাকিস্তানপ্রীতির ব্যাপারে নিক্সনকে সতর্ক করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাতে পাত্তা দেননি। পাকিস্তান ও ভারতের ওপর অবরোধ থাকা সত্ত্বেও আইন ভঙ্গ করে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে, যা এডওয়ার্ড কেনেডির মতে পাকিস্তানের সর্বমোট অস্ত্রশস্ত্রের ৮০ শতাংশ। এভাবেই পৃথিবীর গর্বিত গণতন্ত্র আইন ভঙ্গ করে পাকিস্তানের বর্বর স্বৈরাচারকে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে মারণাস্ত্র দিয়ে সহায়তা করেছে। হোয়াইট হাউসের জ্যেষ্ঠ সহযোগী হ্যারল্ড সোন্ডার্স বলেছিলেন, ভূ-রাজনৈতিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত পশ্চিম পাকিস্তানের ৬০ মিলিয়নকে ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের ৬০০ মিলিয়নের পাশে থাকা। কিন্তু কিসিঞ্জার আগের অবস্থানে অনড় থাকেন। আবার ইয়াহিয়াকে অযোগ্য জেনেও ভূ-রাজনৈতিক কারণে সমর্থন দিয়ে যান। ইয়াহিয়া সম্পর্কে কিসিঞ্জারের পাকিস্তান ভ্রমণ শেষে মূল্যায়ন দেখলেই বোঝা যায় যে ইয়াহিয়াকে তিনি কোনোভাবেই যোগ্য মনে করতেন না। মূল্যায়নটি ছিল এ রকম :

> 'It is my impression that Yahya and his group would never win any prizes for high IQs or for the subtlety of their political comprehension. They are loyal, blunt soldiers, but I think they have a real intellectual problem in understanding why East Pakistan should not be part of West Pakistan.' পৃষ্ঠা ১৭০।

এটি সত্য যে চীনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম যুদ্ধের দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পায় এবং স্নায়ুযুদ্ধে জয়লাভ করে। কিন্তু সেই আনন্দে কিসিঞ্জার উদ্বেলিত হয়ে ইয়াহিয়ার হিন্দু নিধনের সঙ্গে তাঁর ভ্রমণকে যেভাবে তুলনা করে কৌতুক করেন, তা নিম্ন রুচিবোধের আদর্শ পরিচায়ক : 'Yahya hasn't had such fun since the last Hindu massacre!'

নীতিনির্ধারণে কিসিঞ্জারের ব্যক্তিগত প্রভাব ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিসিঞ্জারের মনোজগতে গণহত্যা, শরণার্থী ও অস্তিত্ব হারানোর মতো সব

অভিজ্ঞতাই ছিল। হিটলারের ইহুদি নিধনের শিকার হয়ে কিসিঞ্জার যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। শালিত (১৯৯৪) মন্তব্য করেন, 'After the Nazi Holocaust, the threat of extermination for many Jews takes on enormous emotional and psychological significance, and they have the threat of annihilation built into their psyche.'[৯] এই বাস্তবতা কিসিঞ্জারের বেলায়ও প্রযোজ্য।

পুরো সংকটকে ঘিরে লেখক মন্তব্য করেছেন যে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ইয়াহিয়ার শরণার্থী ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সমঝোতাই শুধু যুদ্ধ এড়াতে পারে। কিন্তু তত দিনে যে পরিমাণ জল গড়িয়েছিল উপমহাদেশে, তাতে এটি কতটুকু যুক্তিযুক্ত, সে ব্যাপারে তেমন তথ্য-উপাত্ত তিনি উপস্থাপন করেননি। এ ছাড়া লেখক সে সময়কার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির জন্য কেবল নিক্সন ও কিসিঞ্জার এবং তাঁদের কিছু অনুসারীকে দায়ী করতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে তার আগে-পরেও খুব ব্যতিক্রম কিছু চোখে পড়ে না।

বইটিতে লেখক যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তান নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেননি, সেটি হলো পাকিস্তানকে শেষ সময় পর্যন্ত সমর্থন দেওয়া এবং সব বর্বরতাকে না দেখার ভান করার পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক হিসাব। মিত্রদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ছিল জরুরি। পাকিস্তানের ব্যাপারে যদি তারা এগিয়ে না আসত, তাহলে স্নায়ুযুদ্ধকালে মিত্রদের আস্থা ধরে রাখা কঠিন হতো।

৩.

ব্রিটিশদের কলমের কারসাজিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র জন্ম নেয় ১৯৪৭ সালে। ধর্মের নামে দুটি দেশ গঠন শুধু উপমহাদেশের এক অদ্ভুত মানচিত্রই সৃষ্টি করেনি, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করে রাষ্ট্রের এক নতুন মডেল আবিষ্কার করা হয়েছিল। এই বইয়ে লেখক পাকিস্তান রাষ্ট্রকে cartographic oddity নামে আখ্যায়িত করেছেন। পাকিস্তান নিয়ে একটি প্রচলিত কৌতুক ছিল এমন : যে তিনটি জিনিস পাকিস্তানকে একত্র রেখেছে, তা হলো ইসলাম, ইংরেজি ভাষা ও পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনস (PIA); এর মধ্যে শেষটিই সবচেয়ে শক্তিশালী। কিসিঞ্জার দিল্লি ভ্রমণে গেলে হাকসার পাকিস্তান রাষ্ট্রের অসাড়তা সম্পর্কে কিসিঞ্জারকে বলেন, 'If religion could provide a basis for creating Nation-states, Europe would probably still have the holy Roman Empire' পৃষ্ঠা-১৬২।

ধর্মের ভিত্তিতে জাতি-পরিচয় নির্ধারণ করে এই অঞ্চলের মানুষের আরও যেসব পরিচয় রয়েছে, যেমন পেশা, শ্রেণী, ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদি, সেগুলোকে অস্বীকার করা হয়েকছিল। এটিকে অমর্ত্য সেন বলেছেন

unique and choiceless identity[১০], যার মাধ্যমে মানুষকে তার নিজের আত্মপরিচয় বাছাইয়ের সুযোগ দেওয়া হয় না। এরপর অবশ্য হান্টিংটন সভ্যতার দ্বন্দ্ব (Clash of Civilization) তত্ত্ব দিয়ে সেটাকে প্রমাণ করতে চেয়েছিল, যার বাস্তবায়ন বুশ ও আল-কায়েদা মিলে সম্পন্ন করার দীর্ঘ প্রকল্প নিয়েছিল, যা এখনো বিদ্যমান। কিন্তু বাংলাদেশ হান্টিংটনের এই তত্ত্বের বিরুদ্ধ তত্ত্ব হিসেবে প্রমাণিত। মুসলিমপ্রধান দেশ হয়েও তুলনামূলকভাবে অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ রয়েছে এখানে। ডেভিড লিউজ তাঁর ২০১১ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে বলেন, 'Bangladesh continues to serve as an important antidote to Samuel Huntington's (1993) warning of a so-called clash of civilizations between the east and the west.'[১১]

এই ধরনের দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান নামে যে রাষ্ট্রটি জন্ম নেয়, তার দুই অংশের মধ্যে শোষণ ও বৈষম্য থাকারই কথা। কারণ, এখানে ধর্মীয় পরিচয় ছাড়া অন্য কোনো উপাদান দিয়ে নিজেদের একক সত্তা ভাবার উপায় ছিল না। আলোচিত গ্রন্থে লেখক পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যকার বিভাজন এবং পূর্বাংশের ওপর যে ধরনের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শোষণ জারি করা হয়েছিল এবং তার ফলে সমাজে যে অস্থিরতা বিরাজ করছিল, সে বর্ণনা তুলে ধরেছেন। কিন্তু সেসবের সম্পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

বাঙালিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চরমতম আঘাতটা আসে ১৯৭০ সালের ১৩ নভেম্বর, যখন ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। বিভিন্ন মার্কিন মানবিক সহায়তা প্রদানকারী এজেন্সির মতে দুই লাখ ৩০ হাজার মানুষ প্রাণ হারায়, কিন্তু স্টেট ডিপার্টমেন্টের হিসাব অনুযায়ী তা পাঁচ লাখ ছিল। ঘূর্ণিঝড়ের পর পাকিস্তান রাষ্ট্র একধরনের গাঁজাখুরি নির্লিপ্ততা দেখায়। পূর্ব বাংলায় তখন প্রচুর সহায়তা দরকার ছিল, যার বেশির ভাগ বিদেশি রাষ্ট্রগুলো প্রদান করে।

৪.

আর্চার ব্লাড পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর পৈশাচিকতার অন্যতম সাক্ষী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবিস্মরণীয় ভূমিকা মানবতার এক মূর্ত প্রতীক। ব্লাড নিক্সন প্রশাসনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর পৈশাচিক হামলা শুরু হয়। ব্লাড ওয়াশিংটনকে বারবার নৃশংসতার এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার নামে নিরস্ত্র বাঙালি নিধনের বর্ণনা টেলিগ্রাম করে পাঠিয়েছেন। কিন্তু ওয়াশিংটন কর্ণপাত করেনি। ব্লাড পরবর্তীকালে *ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ* গ্রন্থে

লিখেছেন, 'The silence from Washington was deafening, suggesting to us that less credence was being given to our reporting than to the Pakistani claims that little more was involved than a police action to round up some "miscreants" led astray by India.' (পৃষ্ঠা ৬৯)। ব্লাডের তারবার্তা কিসিঞ্জারের সহকারীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ফেলেছিল। কিসিঞ্জারের অসাড়তায় তাঁরাও মর্মাহত হন।

ব্লাডসহ ঢাকা কনস্যুলেটের অন্য সদস্যরা ওয়াশিংটনের নীতির বিরোধিতা করে তারবার্তা পাঠান, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট, ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসের সদস্যরাও সই করেন। সবাই নিজেদের পেশাজীবনে নেতিবাচক প্রভাব আসতে পারে জেনেও এই তারবার্তা পাঠান। ৬ এপ্রিল ব্লাড সবচেয়ে তীব্র তারবার্তা পাঠান, যেটিকে লেখক বলছেন, 'The confidential cable, with the blunt subject line of "Dissent from U.S. Policy toward East Pakistan" was probably the most blistering denunciation of U.S. foreign policy ever sent by its own diplomats.' পৃষ্ঠা ৭৭। লেখক আর্চার ব্লাডের ওপর একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়জুড়ে আলোচনা করেছেন। বইয়ের শিরোনামটিও এই কূটনীতিকের পাঠানো তারবার্তাকে ইঙ্গিত করে ব্লাড টেলিগ্রাম করা হয়েছে। ব্লাড মার্কিন নীতির বিরোধিতা করায় পেশাজীবনে উন্নতি করতে পারেননি। তাঁকে ঢাকা থেকে সরিয়ে ওয়াশিংটনে অধস্তন এক পদে বসানো হয়। কিসিঞ্জার পরবর্তীতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে যাওয়ায় তাঁকে যোগ্যতা অনুযায়ী উচ্চপদ থেকে বঞ্চিত করা হয়।

কিসিঞ্জার নিক্সনকে পীড়াপীড়ি করেন যেন তিনি ইয়াহিয়ার ওপর কোনো চাপ প্রয়োগ না করেন। তিনি ভাবতেন, বাঙালিরা চারিত্রিকভাবেই বামপন্থী। তিনি বলেন, 'Mr. President, if we get in there now, we get West Pakistan turned against us, and ... the Bengalis are going to go left any way. They are by nature left.' পৃষ্ঠা ৮৭।

এদিকে ব্লাডের টেলিগ্রাম বন্ধ করার অনেক চেষ্টা চালায় পাকিস্তানিরা। কিসিঞ্জার নিজেও ব্লাড টেলিগ্রাম গোপন রাখতে চান। ২৫ মার্চ রাতের হত্যাযজ্ঞের ব্যাপারে জেনেও নিক্সন-কিসিঞ্জাররা সেটা থামাতে বা কমাতে কোনো পদক্ষেপ নেননি। ব্লাডের টেলিগ্রামের কোনো প্রত্যুত্তরও আসেনি। বাধ্য হয়ে ব্লাড Selective Genocide শব্দ ব্যবহার করে। তিনি দিল্লিতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিংয়ের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিল এবং কিটিং নিজেও বর্বরতার ঘটনা বর্ণনা করে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল। কিসিঞ্জার ও নিক্সন সবকিছুর পর বাঙালিদের ওপরই দোষ চাপিয়ে দেন। দেশ চালাতে ইয়াহিয়ার যে সমস্যা হচ্ছিল, তার জন্য তাঁরা বাঙালিদের দায়ী করেন। কিসিঞ্জার মনে করতেন, ঐতিহাসিকভাবেই বাঙালিদের শাসন করা কঠিন।

পাকিস্তানি শাসকেরা গণমাধ্যমকে নীরবতা পালন করতে বাধ্য করে। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমানে রূপসী বাংলা) বিদেশি সাংবাদিকদের আটকে রাখা হয়। ভুট্টো করাচি ফিরে গিয়ে গণহত্যাকে সমর্থন করে ঘোষণা দেন : 'By the grace of God Pakistan was at last been saved' (পৃষ্ঠা ৫৩)। এর পর থেকে স্বাধীন বাংলার কথা যে বলত বা আওয়ামী লীগ করত, তাদের জন্য পাকিস্তানিরা একটা কোড নাম ব্যবহার করত, 'Sent to Bangladesh', যার মানে হলো বিচার ছাড়া হত্যা করা।

৫.

এদিকে ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ওপর হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দানা বাঁধতে থাকে। ইন্দিরা গান্ধী শুরু থেকেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। লেখক ভারতীয় সাহায্য-সহযোগিতার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। শুরুতে ভারতীয় জেনারেল মানেকশ যুদ্ধে জড়াতে বাদ সাধেন এবং কৌশলগতভাবে শীতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন। কিন্তু তত দিন অন্যান্য সহযোগিতা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। মে মাসের দিকে এসে জোরালোভাবেই সমর্থন দেওয়া শুরু করে ভারত। ভারতীয় নীতিনির্ধারকেরা মুক্তিবাহিনীর বীরত্বে ও সাহসিকতায় মুগ্ধ ছিলেন এবং সে জন্যই সহযোগিতা করতে বেশি আগ্রহী ছিলেন। কারণ, সহযোগিতা বৃথা যাওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল।

শরণার্থী সমস্যা ভারতের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা নিয়ে আসে। ভারত নিজেই যেখানে তার জনসংখ্যাকে খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি দিতে পারছিল না, সেখানে বাড়তি এই বিশাল জনসংখ্যা একধরনের বিপর্যয় ডেকে আনে। পাকিস্তানের নীতিই ছিল হিন্দুদের এখান থেকে বিতাড়িত করা। তাদের ধারণা ছিল, হিন্দুরাই বঙ্গবন্ধুর পেছনে মূল ইন্ধনদাতা। ভারতে শরণার্থীদের মধ্যেও বেশির ভাগই ছিল হিন্দুধর্মাবলম্বী। ভারত বুঝতে পেরেছিল যে পাকিস্তান পদ্ধতিগতভাবে হিন্দুদের বিতাড়িত করেছে, কিন্তু ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যাওয়ার ভয়ে গান্ধী এই তথ্য প্রকাশ করতে চায়নি। ভারতের নীতিনির্ধারকেরা বাংলাদেশে হত্যাযজ্ঞকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে মানতে নারাজ ছিলেন। শরণার্থী সমস্যাকেই আসল কারণ হিসেবে দেখিয়ে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

গান্ধীর সচিবালয়ে অনেকেই অনেক মতামত তুলে ধরেন। কেউ কেউ বলেন সীমান্ত বন্ধ করে দিতে, কেউ বলেন শুধু হিন্দুদের ঢুকতে দেওয়া হোক, কেউ কেউ হিন্দুদের ভারতে নিয়ে ভারতীয় মুসলমান বিনিময়ের প্রস্তাবও দেন। বাঙালিদের জন্য ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা জোরালোভাবে অবদান রেখেছেন, জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ভারতীয় বাঙালিরা ক্রমবর্ধমানভাবে ভারত সরকারকে চাপ দিতে থাকে বাংলাদেশের সহযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। এদিকে *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর সিডনি শ্যানবার্গ শরণার্থীদের মানবেতর জীবন নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। যে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল শরণার্থী ক্যাম্পগুলোয়, তার চিত্র তুলে আনেন। যেখানে দেখা যায়, দৈনিক গড়ে ৩০ থেকে ৪০ জন মারা যেত শুধু কলেরাসহ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়ে।

৬.

চীনে মাও নেতৃত্বাধীন শাসকেরা বুর্জোয়া শক্তির ঘোর বিরোধী ছিল এবং গণতান্ত্রিক ভারতকে শত্রু জ্ঞান করত। ১৯৬২ সালের যুদ্ধের স্মৃতি তখনো সতেজ। বেইজিংয়ে ভারতীয় কূটনীতিকেরা বলেছিলেন যে চীন ভারত নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কেননা, এত বড় ভূখণ্ড আর জনসংখ্যা নিয়ে ভারত চীনের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। এই বইয়ে লেখক মনে করেন, চীন নিজেও তাইওয়ান ও তিব্বতে (এখন জিনজিয়াংও এই তালিকায়) বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে ক্ষুব্ধ, তাই পূর্ব পাকিস্তানে এই ধরনের 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আন্দোলনের ঘোর বিরোধী ছিল এবং ভারতকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানোর জন্য ভর্ৎসনাও করে (পৃষ্ঠা ১৩৪)। কিন্তু বাস্তবে চীনের যে নীতি, কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, সেটি সামান্যই অবদান রেখেছে। আগেই বলেছি যে নীতিবাক্য কোনোভাবেই কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে প্রভাব ফেলেনি। ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকে শুরু হওয়া ইউক্রেন সংকটে রাশিয়া তার সেনাবাহিনী পাঠিয়েছে সেখানে। স্বাভাবিকভাবেই সেটি অন্য দেশের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ। কিন্তু চীন এ ব্যাপারে রাশিয়াকে দ্ব্যর্থ সমর্থন দিয়েছে। ভূ-রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশে চীনকে তা দিতে হয়েছে।[২২] হস্তক্ষেপ না করার নীতি কিন্তু এখানে টেকেনি।

সব বিবেচনায় চীন পাকিস্তানের পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেই থেমে থাকেনি, অস্ত্রশস্ত্র দিয়েও সহায়তা করেছে এবং যুদ্ধ লাগলে পাকিস্তানের সহায়তায় এগিয়ে আসার কথা বলে। বাংলাদেশ বিষয়ে ভারত একাকী হয়ে পড়ে। চীনা ভীতিই ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করতে উদ্যোগী করে। পাকিস্তানের ওপর বাংলাদেশ বিষয়ে চাপ প্রয়োগ করতে ভারতীয় মন্ত্রী-কর্মকর্তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দ্বারে দ্বারে ঘোরেন, কিন্তু কেউ সাড়া দেয়নি। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্যদেশগুলোর মধ্যে যুগোস্লাভিয়া ছাড়া বাকিরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। মধ্যপ্রাচ্যের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে হতাশাজনক। সৌদি আরব, মিসর ও লিবিয়ার স্বৈরাচারেরা পাকিস্তানি স্বৈরাচারে এতটাই মুগ্ধ ছিল যে বাঙালিদের মৃত্যুযন্ত্রণা আর হাহাকার মধ্যপ্রাচ্যের মরুর তাপকে অতিক্রম করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। ইরানের শাহ সরকারের ভূমিকাও ছিল একই রকম।

যুক্তরাষ্ট্রের চীনা সমঝোতার ফলে ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি করার জন্য তাড়াহুড়ো করে এবং ৯ আগস্ট ১৯৭১ সালে শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি সই করে, যার মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে যে-ই আক্রান্ত হোক না কেন, অন্য দেশ যথাযথ পদক্ষেপ নেবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যা আলোচনায় আসতে পারত, তা হলো সোভিয়েত ইউনিয়নও চীন-যুক্তরাষ্ট্র সমঝোতায় ভীত হয় এবং চীনের বিরুদ্ধে এই ধরনের চুক্তি করার প্রয়োজন বোধ করে। কারণ, কয়েক বছর আগেই চীনের সঙ্গে তার সীমান্ত সংঘর্ষ বাধে। উইলিয়াম বার্নডস বলেন,

> 'The announcement that President Nixon would visit Peking surprised and frightened the hyper suspicious Soviet leadership, for the trip seemed to them to portend the transformation of their previous nightmares of Sino-American collusion into reality. To Soviet leaders quickly journeyed to wide variety of countries to demonstrate their own dynamism and to show that their foreign policy had won friends for the USSR.'[১৩]

সোভিয়েত ইউনিয়ন সে সময় পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে দুর্বল অবস্থানে ছিল এবং চাইলেই বাংলাদেশ বিষয়ে তাৎক্ষণিক অবস্থান নিতে পারত না। তা ছাড়া অপর্যাপ্ত বৃষ্টিতে ১৯৬৬-৬৭ সালে ভারতে প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা ও ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যায়।

৭.

গান্ধী ওয়াশিংটন থেকে ৫ নভেম্বর বৈঠক শেষে ফেরার পর এটা নিশ্চিত হয়ে যায় যে ভারত সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। এমন অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান যা ভেবেছিল যে চীন যুদ্ধে জড়াবে, সেটি হয়নি, যুদ্ধ শুরুর পরেও না। চীন সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা ও জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতি চুক্তির পক্ষে ভোট দেওয়া পর্যন্ত নিজেকে সীমিত রাখে। লেখক যেভাবে বলতে চেয়েছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের চীনা নীতি এখানে ব্যর্থ হয়েছে, তা পুরোপুরি ঠিকও নয়। স্নায়ুযুদ্ধ বিজয় ছিল যুক্তরাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য এবং সে জায়গায় চীনের সঙ্গে সমঝোতা যথার্থ অবদান রেখেছে।

২১-২২ নভেম্বর ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম বিমানযুদ্ধ সংঘটিত হয় পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে। একে অপরকে দোষারোপ করে যুদ্ধ শুরু করার জন্য। কিন্তু কৌশলগতভাবে এই শুরুটা ভারতের জন্য সুবিধা করে দেয়। এত দিনে শীতকাল পড়ে গেছে, হিমালয়ের তুষারপাতের কারণে ভারতীয় সীমান্তে চীন তার সেনাসমাবেশ করতে পারবে না এবং মৌসুমি বৃষ্টিপাত তত দিনে বন্ধ হয়ে গেছে, যা ভারতীয় সেনাদের অভিযানে সুবিধা করে দেবে। কিসিঞ্জার এই যুদ্ধকে ভারতের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রকে অপমান করার সোভিয়েত পরিকল্পনা বলে আখ্যায়িত

করেন এবং জাতিসংঘের সনদ ও আমেরিকার নীতির প্রতি আঘাত হিসেবে বিবেচনা করেন। তবে যুক্তরাষ্ট্র যে এসব নীতি অনেকবার লঙ্ঘন করেছে এবং এখনো করে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে তিনি চুপ ছিলেন।

৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান পশ্চিম সীমান্তে বিমান হামলা চালায়। ইয়াহিয়া ২৯ নভেম্বর ভারতের যুদ্ধের প্রস্তুতি না জেনেই হামলার পরিকল্পনা করে। এতে করে ভারত তার সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাতে আর দেরি করেনি। এদিকে কিসিঞ্জার ও নিক্সন ঘটনা না জেনেই নিশ্চিত হয় যে ভারতই যুদ্ধ শুরু করেছে, যদিও পাকিস্তানই ওই দিন বিমান হামলা চালায়। কিন্তু বইয়ে লেখক ব্যাখ্যা করেননি, কেন নিক্সন প্রশাসন ভারতের যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং 'যুদ্ধ বাধানো'র পরিকল্পনা জানার পরও ইয়াহিয়াকে জানায়নি এবং হামলা করার মতো অদূরদর্শী পরিকল্পনা করতে নিষেধ করেনি। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ বন্ধ করতে শত চেষ্টার পরও পারেনি, যে জন্য কিসিঞ্জার মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং নিক্সন তাঁকে মনোরোগ চিকিৎসক দেখানোর কথাও ভাবেন। এটি তাহলে কার কৌশলগত ব্যর্থতা?

ভারত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ হস্তক্ষেপ করার আগেই পূর্ব সীমান্তে যুদ্ধ শেষ করতে চায় এবং এ জন্য তারা আট দিনের মধ্যে ঢাকা দখল নেওয়ার পরিকল্পনা করে। যদিও আট দিনে সম্ভব হয়নি, তবু এত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়েছিল পাকিস্তানি সেনাদের অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি মোকাবিলা না করে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মুক্তিবাহিনীই সেসব ক্ষেত্রে পাকিস্তানি সেনাদের যুদ্ধে নিমজ্জিত রেখেছিল। ভারতীয় সেনা এবং মুক্তিবাহিনী যখন ঢাকা দখল করে ফেলে এবং দেশ প্রায় স্বাধীন করে ফেলে, তখন নিক্সন-কিসিঞ্জাররা উর্দুভাষী বিহারি, যারা পাকিস্তানিদের সহায়তার মাধ্যমে বাঙালিদের হত্যা ও নির্যাতনে সরাসরি ভূমিকা রেখেছিল, তাদের মানবিক দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ করে। নিক্সন প্রশাসনের মানবতাবোধ বাঙালিদের বেলায় অদৃশ্য থাকলেও শেষ সময়ে তাদের এ মহানুভবতা প্রশংসার দাবি রাখে! যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বিজয় ও ভারতের সাফল্য ঠেকাতে তখন নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারস্থ হয়। নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে তিনবার ভেটো দিয়ে আটকে দেয়।

নিক্সন-কিসিঞ্জার শেষ দিকে এসে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁরা মনে করেন, ভারত শুধু বাংলাদেশ স্বাধীন করেই ক্ষান্ত হবে না, সে তার চিরশত্রু পাকিস্তানকেই ধ্বংস করে দেবে। তখন পশ্চিম পাকিস্তানকে বাঁচানোই তাদের মূল লক্ষ্য হয়ে পড়ে বলে লেখক দাবি করেন। সিআইএ নিশ্চিত করে যে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে হলে চীনের দুই মাসের মতো সময় লেগে যাবে। আসলে চীন যুদ্ধে জড়ালে আরও বড় আকারের যুদ্ধ বেধে যেত, যেখানে নিশ্চিতভাবেই সোভিয়েত ইউনিয়নকে আসতে হতো এবং তখন যুক্তরাষ্ট্রকেও সরাসরি যুদ্ধে নামতে হতো।

পাকিস্তান যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক অস্ত্র অবরোধের আওতায় ছিল,

তাই ইরান ও জর্ডানের মাধ্যমে পাকিস্তানকে অস্ত্র সহযোগিতা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। পাকিস্তানকে সহযোগিতা করতে তারা অনায়াসে যুক্তরাষ্ট্রের আইন ভঙ্গ করে চলে। ভারত আশ্বস্ত করতে চেয়েছে যে তাদের বাংলাদেশের বা পশ্চিম পাকিস্তানের জায়গা দখল করার কোনো পরিকল্পনা নেই এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিশ্লেষকেরাও তা আশ্বস্ত করেছেন, কিন্তু তার পরও যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তানকে যেন ধ্বংস করতে না পারে, সেই অজুহাতে সপ্তম নৌবহর পাঠায় বঙ্গোপসাগরে। লেখক বলতে চেয়েছেন যে যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষার্থে শেষ পর্যন্ত সপ্তম নৌবহর পাঠায়। কিন্তু স্টেট ডিপার্টমেন্টের আশ্বাস না শোনা ও চীনকে যুদ্ধে প্ররোচিত করার চেষ্টা যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার কৌশল হিসেবেই প্রতীয়মান হয়, যার যথেষ্ট প্রমাণ এই বইয়ে পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র সর্বশেষ অস্ত্র ব্যবহারে মনোযোগী হয়। যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতকে না থামায়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করবে বলে হুমকি দেয় (পৃষ্ঠা ৩০৫)। কিসিঞ্জার ভয় পেতে থাকে যে এই যুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন এলে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা চিরকালের জন্য নষ্ট হবে :

> 'If the outcome of this is that Pakistan is swallowed by India, China is destroyed, defeated, humiliated by Soviet Union, it will be a change in the world balance of power of such magnitude, that the United States security would be damaged for decades and may be forever.' (পৃষ্ঠা ৩০৭)।

সোভিয়েত ইউনিয়নও আশ্বস্ত করে যে পশ্চিম পাকিস্তান ধ্বংস করার ইচ্ছা ভারতের নেই। চীন জানত যে ভারতের বিরুদ্ধে সেনাসমাবেশ করা মানে চীনের সীমান্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের ১০ লাখ সেনা জড়ো করতে প্ররোচনা দেওয়া। চাপের মুখে ভারত কাশ্মীরে তাদের দাবি করা অংশের দখল নেওয়া থেকেও বিরত থাকে। যখন পূর্ব সীমান্তে জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণে রাজি হন, তখন ভারত পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তান দখলের সুযোগ থাকার পরও এককভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। এতেই কিসিঞ্জার 'বিজয়ী' হাসি হাসেন। তিনি বলেন, 'We have turned disaster into defeat.' (পৃষ্ঠা ৩২৪)।

শেষ কথা

বইয়ের শেষে লেখক বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী অবস্থা নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিয়ে শেষ করেছেন। তিনি ১৯৭১ সালের নির্মম ও বর্বরোচিত কর্মের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষমা চাওয়ার কথা বলেন।

তবে ভারত যে শুধু মানবিক কারণেই বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করে, ব্যাপারটি এমন নয়; ভূ-রাজনৈতিক কৌশলই মূল নিয়ামক ছিল। ইন্দিরার নিজের দেশে মানবাধিকারের অবস্থা দেখলে সেটি পরিষ্কার হবে। মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, কাশ্মীর, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৮৪ সালে পাঞ্জাবে এবং জরুরি অবস্থা চলাকালে দেশব্যাপী তার মানবাধিকার রেকর্ড নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছিল। বাংলাদেশে এই গণহত্যা বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া ও গণতন্ত্র রক্ষায় পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জণগণের কাছ থেকে যেমন চাপ ছিল, তেমনি ভূ-রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশে তাঁর প্রধান শত্রু পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করে দক্ষিণ এশিয়ায় একক আধিপত্য বিস্তারের এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতেও চাননি গান্ধী। তাই ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে পাকিস্তান ভেঙে যাওয়া জরুরি ছিল।

শরণার্থী সমস্যা নিঃসন্দেহে বড় ভূমিকা রেখেছে। তা ছাড়া ভারতীয় জনগণের বাংলাদেশের মানুষের জন্য মানবতাবোধ ও সংহতি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। ভারত চাইলেই বাংলাদেশের এই সংকটকে এড়িয়ে যেতে পারত না। পশ্চিমবঙ্গে এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে আরেকটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ঘটুক, সেটাও চাননি ইন্দিরা গান্ধী। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, ভারতের রাজনীতির সব পক্ষ থেকেই বাংলাদেশের জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য জোর দাবি ওঠে। ডানপন্থী ও বামপন্থী থেকে শুরু করে সব অংশই একই দাবি তোলে।

জাতীয় স্বার্থ ছাড়া কোনো দেশ তার নীতি ঠিক করতে পারে না। ভারতও পারেনি। সেই স্বার্থের মাধ্যমে কোনো দেশের স্বার্থহানি হবে, আবার কোনো দেশের স্বার্থ রক্ষা পাবে। যে দেশের স্বার্থ রক্ষা পাবে, তার সঙ্গেই বন্ধুত্ব হবে। ভারতীয় সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার পথ অনেক সহজ হয়ে যায় এবং পাকিস্তানি শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটে। ভারতের এই বন্ধুসুলভ সহযোগিতায় বাংলাদেশের মানুষ চিরকাল কৃতজ্ঞ। পাশাপাশি এটাও সত্য যে বন্ধুত্ব এমন একটি সম্পর্ক, যার পরীক্ষা আজীবন দিতে হয়। বিপদে বন্ধুর উপকারে এসে পরে আবার ক্রমাগত নির্দয় আচরণ করতে থাকলে বন্ধুত্ব টিকে থাকার কথা নয়। পারস্পরিক মর্যাদা ও সম্মানের ভিত্তিতেই বন্ধুত্ব হয়। এই বাস্তবতা বুঝে মেনে নেওয়ার সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করবে ভারত-বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের গতি প্রকৃতি।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. Nicholas Burns, 'America's Strategic Opportunity With India: The New U.S.-India Partnership,' *Foreign Affairs*, November/December 2007, accessed at http://www.foreignaffairs.com/ articles/63016/r-nicholas-burns/americas-strategic-opportunity-with-india

২. Zachary Keck, 'India Wades into South China Sea Dispute,' *The Diplomat,* accessed at http://thediplomat.com/2014/03/india-wades-

into-south-china-sea-dispute/

৩. সামরিক কৌশলবিদ কার্ল ভন ক্লজভিটজ (Carl Von Clausewitz) তাঁর গ্রন্থ *অন ওয়্যার*-এ যুদ্ধকালীন অনিশ্চয়তা বোঝাতে 'ফগ অব ওয়্যার' ধারণা আবিষ্কার করেন। গ্রন্থটি জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয় ১৮৩৭ সালে, যা ইংরেজিতে ১৮৭৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

৪. Zillur R Khan, *The Third World Charismat: Sheikh Mujibur Rahman and the Struggle for Freedom*, Dhaka: University Press Limited, 1996, pp. 121-123.

৫. Kuldip Nayar, *Beyond the Lines: An Autobiography*, New Delhi: Roli Books Pvt. Ltd, 2012 (Daily Star Books published in Bangladesh), p. 216.

৬. অ্যারিস্টটলের মতে, মানুষের মধ্যে কোনো গুণের চরম আধিক্য এবং প্রকট দুষ্প্রাপ্যতার মাঝামাঝি অবস্থানকে 'গোল্ডেন মীন' বোঝায়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণার জন্য দেখুন, Aristotle, *Nicomachean Ethics*, (350 B.C.E) translated by W.D. Ross, South Australia: University of Adelaide, accessed at http://ebooks.adelaide.edu.au/a/aristotle/nicomachean/

৭. Henry A. Kissinger, *A World Restored: Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace, 1812-1822*, Massachusetts: Houghton Miffin, 1973.

৮. J. W. Burton, *Conflict : Resolution and Provention*, in David Lacey, 'The Role of Humiliation in the Palestinian / Israeli Conflict in Gaza,' *Psychology & Society*, 2011, Vol. 4 (1), 76 - 92 accessed at http://www.psychologyandsociety.org/__assets/__original/2011/04/Lacey_2011_.9.pdf

৯. Erel Shalit, 'The Relationship Between Aggression and Fear of Annihilation in Israel,' *Political Psychology* 15 (3), 1994, accessed at http://www.jstor.org/discover/10.2307/3791564?uid=3737584&uid=2&uid=4&sid=21103598747267

১০. Amarty Sen, *Identity and Violence: Illusion of Destiny*, London: Penguin Books, 2006.

১১. David Lewis, *Bangladesh: Politics, Economy and Civil Society*, New Delhi: Cambridge University Press, 2011, p.5.

১২. Shannon Tiezzi, 'China Backs Russia on Ukraine,' *The Diplomat* March 4, 2014, accessed at http://thediplomat.com/2014/03/china-backs-russia-on-ukraine/

১৩. William J. Barnds, 'Moscow and South Asia,' *Problems of Communism*, March-April, 1972, pp.24-25.

লেখক পরিচিতি

হায়দার আলী খান

যুক্তরাষ্ট্রের ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এবং আঙ্কটাডের সাবেক জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা। তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা ২০ এবং আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা শতাধিক। হায়দার আলী খান বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক। তাঁর প্রকাশিত রাজনৈতিক-অর্থনীতিবিষয়ক বইয়ের মধ্যে রয়েছে *China's Market Socialism and National Innovation System at the Cross-roads* (2010), *Reducing Poverty: Patterns of Potential Human Progress* (2008), *Poverty Strategies in Asia: Growth Plus* (2006), *Global Markets and Financial Crisis* (2004).

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগে (সিপিডি) অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তিনি জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। এর আগে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয়ের মধ্যে উৎপাদন নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক গবেষণা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোন্নয়ন অন্যতম।

ফারজানা সেহরীন

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগে (সিপিডি) গবেষণা সহযোগী কাজে কর্মরত রয়েছেন। এর আগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

বদরুল আলম খান

বদরুল আলম খান দীর্ঘকাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগে শিক্ষকতার পর বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন সিডনিতে অধ্যাপনা করছেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বাংলাদেশ সমাজ, শ্রেণী, ধর্ম ও বিশ্বায়ন। তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার মধ্যে *পুঁজিবাদের সমাজতত্ত্ব*, *সমাজতত্ত্ব : সংকট ও সম্ভাবনার দেড় শ বছর*, *দর্শনের সংকট* এবং *তৃতীয় বিশ্ব, ধর্ম ও সমাজ বিপ্লব* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *সংঘাতময় বাংলাদেশ : অতীত থেকে বর্তমান* নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

মহিউদ্দিন আহমদ

অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। সুংকোংহে বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিউল) এমএ ইন এনজিও স্টাডি কোর্সের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যাপক। গবেষক, মাঝেমধ্যে পত্রিকায় কলাম লেখেন। লেখা ও সম্পাদনায় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এ যাবৎ ৩৮টি। এর মধ্যে কবিতার বই সাতটি। উল্লেখযোগ্য বই : *কার্ল মার্ক্সের কবিতা*, *লাল সালাম কমরেড*, *পিতা হি পরমন্তপ*, *উঠোনভরা কষ্ট*, *গভীর পবিত্র অন্ধকার*, *ফ্রম যমুনা টু নাইল*, *এই দেশে একদিন যুদ্ধ হয়েছিল*, *সিউল ডায়রি*, *আমাদের একাত্তর*, *নারীজীবনের গল্প*, *আমরা করব জয়*, *ভয়েসেস থ্রু ব্যালট*।

নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস

সহকারী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে তিনি ব্রিটেনের সিটি ইউনিভার্সিটি লন্ডন-এ আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়ে পিএইচডি গবেষণা করছেন। বাংলাদেশের বেসামরিক নিরাপত্তা শাসনব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় এক্টরদের ভূমিকা কী ধরনের প্রভাব রাখে, সেটিই তাঁর গবেষণার মূল বিষয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ অধ্যায় *Providing Peacekeepers: The Politics, Challenges and, Future of United Nations Peacekeeping Contributions* (Oxford: Oxford University Press, 2013). এ ছাড়া তিনি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা জার্নালে লিখেছেন। তাঁর গবেষণার বিষয়: সিভিল সোসাইটি, নিরাপত্তা শাসনব্যবস্থা এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দক্ষিণ এশিয়ার প্রদায়ক দেশগুলোর ভূমিকা।

রাশেদ উজ জামান

অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি ঢাকা, হাল এবং রিডিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেছেন। তিনি জার্মানির এরফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আলেক্সান্ডার ভন হামবল্ট পোস্ট-ডক্টোরাল গবেষণা ফেলো ছিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ফুলব্রাইট অতিথি অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে দুটি বইয়ে দুটি অধ্যায়: Paul Williams and Alex J. Bellamy (eds.), *Providing Peacekeepers: The Politics, Challenges and, Future of United Nations Peacekeeping Contributions* (Oxford: Oxford University Press, 2013), Jussi M. Hanhimaki and Bernhard Blumenau (eds.), *An International History of Terrorism: Western and non-Western experiences* (London and New York: Routledge, 2013).

এ এস এম আলী আশরাফ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পেনসেলভেনিয়া অঙ্গরাজ্যের পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষকতা ও গবেষণার বিষয়বস্তুর মধ্যে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, মানবাধিকার, ইউরোপীয় রাজনীতি ও তুলনামূলক উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য।

খলিলউল্লাহ্

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বর্তমানে *প্রতিচিন্তা*র সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ নিয়ে লেখালেখি ও গবেষণা করছেন। আগ্রহের বিষয় আন্তর্জাতিক রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, কূটনীতি, ভূ-রাজনীতি, সামাজিক উন্নয়নসহ সমসাময়িক বিষয়।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে *প্রতিচিন্তা*র গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। অফিসে সরাসরি উপস্থিত হলেই শুধু নগদ টাকা গ্রহণ করা হবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ২০০ (দুই শত) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪০০ (চার শত) টাকা ও ৬০ (ষাট) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/ বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/ দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/ পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি গ্রাহক কার্ড দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ (সিএ ভবন), কারওয়ান বাজার
ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৮১